ভারতের মুক্তিসন্ধানী

শ্রী যোগেশচন্দ্র বাগল

ভারতের মুক্তি-সন্ধানী

ভারতের মুক্তি-সন্ধানী

পপুলার লাইব্রেরী
১৯৫।১ বি, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

পরিবর্ধিত নূতন সংস্করণ
ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৮ ইং

॥ প্রচ্ছদশিল্পী ॥

পূর্ণেন্দু পত্রী

দাম পাঁচ টাকা

প্রকাশক : শ্রীঅখিলচন্দ্র নন্দী, পপুলার লাইব্রেরী, ১৯৫।১ বি, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬
মুদ্রাকর : শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানসী প্রেস, ৭৩, মানিকতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

শ্রীযুক্ত রামপদ মুখোপাধ্যায়

বন্ধুবরেষু

সূচী

নিবেদন

"মুক্তির সন্ধানে ভারত" রচনা কালে একটি বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করি। ভারতবর্ষের মুক্তি-প্রচেষ্টা নিছক রাষ্ট্রীয় মুক্তি বা স্বাধীনতা-প্রয়াস নয়; শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজধর্ম, নানা বিষয়ক উন্নতি ও সংস্কার-প্রচেষ্টাও ইহার অঙ্গীভূত। আর এই সমুদয় প্রচেষ্টার মূলে যাঁহারা ছিলেন তাঁহারাই সত্যকার মুক্তি-সন্ধানী আখ্যা পাইবার যোগ্য। এই মুক্তি-সন্ধানী নেতৃগণ সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়িয়া রহিয়াছেন। ইঁহাদের কাহাকে কাহাকেও আমরা অতিমাত্রায় স্মরণ করি, আবার কাহাকে কাহাকেও একেবারে ভুলিতে বসিয়াছি। বহু-স্তুত মুক্তি-সন্ধানীদের মর্মগাথা আলোচনা করা বর্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়। তথাপি পারম্পর্য রক্ষাকল্পে এরূপ দু' একজনের কথাও আলোচনার বিষয়ীভূত করা হইয়াছে।

আমরা আজ বিদেশীর শাসনপাশ হইতে মুক্ত, এদিক দিয়া আমরা সত্যই স্বাধীন। যাঁহারা শিবরূপে সারাজীবন হলাহল পান করিয়া অমৃত-ভাণ্ডার ভবিষ্যৎ বংশীয়দের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহারা ধন্য, তাঁহাদের জীবনকথা জাতির প্রাণের রস ও রসদ। আমরা তাঁহাদের কথা জানিয়া শ্রদ্ধানত চিত্তে স্ব স্ব কার্যে অগ্রসর হইব। ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত এই কার্য সমাধা করিতে পারিলে তবে আমাদের 'পিতৃঋণ' খানিকটা পরিশোধ হইবে। এ কথাটি সর্বদা আমাদের স্মরণ-মনন করা কর্তব্য।

কয়েক বৎসর পূর্বে পুস্তকখানির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বর্তমান সংস্করণে দুইটি অধ্যায় বর্ধিত এবং পাঁচটি অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে। কাজেই এখানি নূতন পরিবর্ধিত সংস্করণ। নূতন অধ্যায়গুলি এতদিন পত্রিকার পৃষ্ঠায় পড়িয়াছিল। বর্তমান সংস্করণে সেই সকল

গ্রথিত করিতে পারার জন্য আজ কতকটা সোয়াস্তি বোধ করিতেছি। এ সময়ে যাহার কথা বার বার মনে হইতেছে তিনি আমার অনুজপ্রতিম শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী দেবরায়। পুস্তক প্রকাশে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অখিল চন্দ্র নন্দীর আগ্রহ কখনও ভুলিতে পারি না। পুস্তকখানি এত শীঘ্র যে প্রকাশিত হইতে পারিয়াছে তাহা তাঁহারই অকৃত্রিম ঐকান্তিকতার ফল।

এ প্রসঙ্গে আরও কয়েকজন বন্ধুর কথা স্মরণ করি। শ্রীযুক্ত অমূল্যকাঞ্চন দত্তরায় পুস্তকখানির প্রকাশে সবিশেষ তৎপর হন। প্রুফ দেখায় যাঁহারা আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত কানাইলাল দত্ত এবং গৌতম সেনের নাম কৃতজ্ঞ চিত্তে উল্লেখ করি। পুস্তকখানির ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন প্রবীণ ঐতিহাসিক আচার্য শ্রীযদুনাথ সরকার। তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবার ভাষা খুঁজিয়া পাই না। পুস্তকখানি স্বাধীন ভারতের নবভাবোদ্দীপ্ত যুবসমাজের স্বদেশের উন্নতিমূলক কাজে পথিকৃৎ হউক ইহাই প্রার্থনা।

দোলপূর্ণিমা
২১শে ফাল্গুন ১৩৬৪

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

ভূমিকা

প্রায়ই দেখা যায় যে, আমাদের দেশের কোন মহৎ লোকের বাৎসরিক শোকসভায় তাঁহার কীর্তি আলোচনা করিয়া বক্তৃতা হয়, পত্রিকায় প্রবন্ধ ছাপা হয়। কিন্তু এগুলি একদিনের ফুল, পরদিনই শুকাইয়া পড়িয়া যায়, লোকে তাহা ভুলিয়া যায়। আমাদের হালের তরুণ সমাজের কথাবার্তায় বেশ বুঝিতে পারি যে তাহারা এই সব অতীত দেশনেতা সম্বন্ধে কিছুই জানে না।

অথচ ইহাদেরই গড়া স্বাধীন ভারত আমরা লাভ করিয়াছি, ভোগ করিতেছি। আজকাল মুক্তি-সংগ্রাম বলিয়া যে চিৎকার অহরহ শোনা যাইতেছে তাহাতে শুধু রাজনৈতিক আন্দোলন, বক্তৃতা প্রসেশন্ এবং সৌখীন শান্তিভঙ্গ করিয়া কারাবরণ **এই** "ভঙ্গিমা" (রবীন্দ্রনাথের ভাষায়) জিনিসটিকে পূজা করা হয়।

কিন্তু ভারত যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে তাহার প্রাণের বীজ ছিল নব্য জ্ঞান ও চরিত্রগঠন, জাতীয় ঐক্য (বর্ণভেদের বিরোধী) এবং ব্যবসায়ে আত্মনির্ভরতা (economic self-sufficiency of the nation)। এই চিরসত্য আমাদের প্রথম যুগের দেশ-নেতারা প্রচার করেন, তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল এইরূপ বারো জন পূর্ব-সূরীদের চরিত্র ও কীর্তি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে শিক্ষা ও সাধনার ক্ষেত্রে ইঁহারা কী প্রচণ্ড চেষ্টা করেন, কী পথ দেখাইয়া যান। এই বইখান রীতিমত জীবনচরিতের কাঠামোতে রচিত নয়। ইহাতে ঘটনা বড় কম ; কিন্তু ঐ ঐ মনীষীরা কোন্ কোন্ দিকে, কী কী প্রণালীতে আমাদের সমাজকে প্রভাবিত করেন, জাতীয় দেহে নবরক্ত চালিয়া দেন, তাহাই বুঝান হইয়াছে। ইহা ভুলিবার নয়।

শ্রীযদুনাথ সরকার

মহা বিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা,
মৃত্যুরে না করি শঙ্কা।

—রবীন্দ্রনাথ

রামগোপাল ঘোষ

১

স্বদেশের বাধাবন্ধহীন উন্নতি উনবিংশ শতাব্দীর মুক্তিসন্ধানীদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। আর সেযুগে উন্নতি বলিতে যাহা কিছু কল্পনাসাধ্য ছিল, প্রায় সবদিকেই রামগোপাল ঘোষের শক্তি নিয়োজিত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের দেশবাৎসল্যের কথা আলোচনাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া রামগোপাল ঘোষ ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গালাদেশে দেশবাৎসল্যের প্রথম নেতা বলা যাইতে পারে।" বস্তুতঃ রামগোপালের মধ্যে দেশবাৎসল্য বা দেশপ্রেম যেন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। তাঁহার জীবন, কর্ম ও চিন্তাধারা পর্যালোচনা করিলে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তির যাথার্থ্য আমাদের সম্যক উপলব্ধি হয়।

রামগোপাল দীর্ঘায়ু হন নাই। চুয়ান্ন বৎসরে পদার্পণ না করিতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। কিন্তু এইসময়ের মধ্যে তিনি বাঙালী জাতির জীবনে সর্ববিষয়ে একটি চেতনা আনিয়া দিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল 'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখায়'। পরান্নজীবী বাঙালীকে ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা স্বাবলম্বী হইতে এবং স্বদেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধিকল্পে সাক্ষাৎভাবে সাহায্য করিতে তিনি জীবনব্যাপী কর্ম দ্বারা শিক্ষা দিয়াছিলেন। শিক্ষাবিস্তারে, সমাজ-সংসারে জাতীয় স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ ও পোষণে, স্বদেশের কৃষি শিল্প বাণিজ্য প্রসারে এবং সর্বোপরি স্বদেশবাসীর মনে রাষ্ট্রীয় বুদ্ধির উন্মেষে রামগোপালের কৃতিত্ব অনন্যতুল্য। এইসকল বিষয়েই তিনি যেরূপ দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাঁহার

সময়ে এমনটি আর কেহ বড় একটা দিতে পারেন নাই। একারণ তৎকালীন ভারতবর্ষের সর্বপ্রকার উন্নতিপ্রচেষ্টায়ই তাঁহার ঐকান্তিক সহযোগিতা লক্ষ্য করি। তবে তখন কেহই চাহিতেন না যে, ইংরেজ এদেশ হইতে চলিয়া যাউক; শক্তিশালী ইংরেজ জাতির সহায়ে আমরা শক্তিমান হইব এই বিশ্বাসই সকলের মনে বলবৎ ছিল। রামগোপালও ইহার ব্যতিক্রম ছিলেন না।

২

রামগোপাল ১২২১ বঙ্গাব্দে আশ্বিন মাসে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ কলিকাতায় সামান্য ব্যবসা-কর্মে লিপ্ত ছিলেন। তাঁহার এমন সঙ্গতি ছিল না যে, নিজ পুত্রকে অধিক দিন স্কুলে পড়ান বা তাঁহার সাহায্য ব্যতিরেকে নিজ সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে পারেন। বাল্যে শেরবোর্নের পাঠশালায় রামগোপাল অধ্যয়ন করেন। এই পাঠশালাটির তখন খুব খ্যাতি ছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুর এখানে পড়িয়াছিলেন। ইহার পর ডেভিড হেয়ারের আনুকূল্যে রামগোপাল হিন্দু কলেজে 'ফ্রী স্টুডেন্ট' হিসাবে ভর্তি হন। এখানে দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতে করিতে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে হেয়ারের সহায়তায় তিনি জোসেফ কোম্পানীতে চল্লিশ টাকা বেতনে একটি চাকুরি লাভ করেন।

হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালে রামগোপাল ডিরোজিওর শিক্ষার দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হন। তাঁহার সতীর্থ ও বন্ধুগণ অনেকেই এইরূপ প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামতনু লাহিড়ী, গোবিন্দচন্দ্র বসাক প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রামগোপাল

পরবর্তী জীবনেও বিভিন্ন বিষয়ে এইসকল বন্ধুর সাহায্য পাইয়াছিলেন। কলেজের এইসকল ছাত্র পাঠ্য বই ব্যতীত অন্যান্য বহু জ্ঞানগর্ভ পুস্তকও পাঠ করিতেন এবং ডিরোজিওর নেতৃত্বে তত্তৎ বিষয়ে আলোচনায় রত থাকিতেন। একাডেমিক এসোসিয়েশন নামক একটি বিতর্ক-সভা তাঁহারা স্থাপন করেন, ডিরোজিও ছিলেন ইহার সভাপতি। ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, দর্শন, স্বদেশপ্রীতি প্রভৃতি বহু বিষয়েই এখানে আলোচনা হইত। ছাত্রগণ সকল বিষয়েই স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে এবং সকলের সমক্ষে তাহা অকপটে ব্যক্ত করিতে অভ্যস্ত হইতে লাগিলেন। এই সময়ে ছাত্রদের কেহ কেহ প্রচলিত ধর্ম ও সমাজব্যবস্থায় বীতশ্রদ্ধ হইয়া কতকটা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িলেন বটে, কিন্তু পরে ইহার দোষ বর্জন এবং গুণ গ্রহণ করিয়া প্রায় প্রত্যেকেই দেশ ও জাতির সেবায় নিজ শক্তি নিয়োজিত করেন। রামগোপাল এসোসিয়েশনের সভায় অকপটে নিজ মত ব্যক্ত করিতেন। পরবর্তীকালে তিনি যে অত বড় বাগ্মী হইতে পারিয়াছিলেন, এখানে বক্তৃতাদানের মধ্যেই তাহার গোড়াপত্তন হয়।

৩

সতর বৎসর বয়সেই রামগোপালের কর্মজীবন শুরু হইল। তিনি কিন্তু সাধারণ কেরানীর মত টেবিল-চেয়ার কাগজ-কলমই সার করিলেন না, মনিবের ব্যবসার কৌশল পর্যবেক্ষণ এবং খুঁটিনাটি আয়ত্ত করার দিকে তাঁহার বরাবর ঝোঁক ছিল। জোসেফের ছিল আমদানি-রপ্তানির কারবার। জোসেফের নির্দেশে রামগোপাল বহুদিন পরিশ্রম করিয়া কাগজপত্র ও রিপোর্টাদি ঘাঁটিয়া এদেশে উৎপন্ন ও শিল্পজাত দ্রব্যের একটি বিবরণ প্রস্তুত করিলেন। জোসেফ এই বিবরণ পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। রামগোপালেরও ক্রমান্বয়ে উন্নতি হইতে লাগিল।

কিছুকাল পরে টি. এস. কেলসাল নামক জনৈক ব্যবসায়ী জোসেফের সঙ্গে আসিয়া যোগ দেন। তখন রামগোপাল বেনিয়ান হন। কিন্তু জোসেফের সঙ্গে কেলসালের বেশী দিন বনিবনাও হইল না। কেলসাল স্বতন্ত্র হইয়া রামগোপালের সঙ্গে একযোগে কেলসাল ঘোষ এণ্ড কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৪৬ সালে রামগোপাল কোম্পানী হইতে দুই লক্ষ টাকা লইয়া সাময়িকভাবে নিজ ব্যবসা তুলিয়া লইলেন। কিন্তু ১৮৪৮ সালের মাঝামাঝিই উভয়ের মধ্যে সকল সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যায়। ১৮৪৬ সালে ব্যবসা বন্ধ করায়, পর বৎসর কলিকাতায় যে বাণিজ্যিক দুর্যোগ উপস্থিত হয় তাহা রামগোপালকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি ইহার পর স্বাধীনভাবে ব্যবসা আরম্ভ করিবার আয়োজন করেন। তাঁহার এই আয়োজনের কথা জানিয়া 'সংবাদ প্রভাকর' (১৮ এপ্রিল, ১৮৪৯) লিখিলেন,—

"আমরা অতিশয় আহ্লাদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি যে এতদ্দেশের পরম হিতকারী বন্ধু শ্রীযুত বাবু রামগোপাল ঘোষ মহাশয় স্বাধীনরূপে বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত আর. জি. ঘোষ এণ্ড কোম্পানী নামে এক হৌস করিবেন, আগামি, মে মাস অবধি তাহার কার্য্যারম্ভ হইবেক, ঐ হৌসে রামগোপাল বাবু এবং তাঁহার ভাগিনেয় অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত থাকিবেন, এবং বাণিজ্য সম্বন্ধীয় কাগজ-পত্রাদি তাঁহারা উভয়েই স্বাক্ষর করিবেন।"

রামগোপাল আর. জি. ঘোষ এণ্ড কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করিয়া যথাবিধি কার্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। লণ্ডনেও তাঁহার একটি হৌস প্রতিষ্ঠিত হইল। আকিয়াব এবং রেঙ্গুনে শাখা স্থাপন করা হইল। ব্যবসার দিন দিনই শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল।

স্বাধীন ব্যবসায়ে বাঙালীরা পরাঙ্মুখ, এই অপবাদ ঘুচাইতে রামগোপাল সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। যখনই কোন বাঙালী যুবক কোনও ব্যবসা করিতে বা তাঁহার নিকট কাজকর্ম শিখিতে আগ্রহ প্রকাশ করিত

তখনই তাহাকে নানাভাবে সাহায্য করিতে তিনি অগ্রসর হইতেন। তাঁহার বন্ধুদের মধ্যেও কেহ কেহ তাঁহার আগ্রহাতিশয্যে ব্যবসাকর্মে লিপ্ত হইয়াছিলেন।

স্বয়ং ব্যবসাকর্মে লিপ্ত থাকায়, আনুষঙ্গিক বহু ব্যবসায়ের সঙ্গেও তিনি যুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ব্যাঙ্ক ও জীবনবীমা লোকের হিতকারক এবং স্বদেশের অর্থসংবর্ধক, একারণ এ দুইটি বিষয়ে যখনই দেশবাসীর পক্ষে প্রচেষ্টা হয় তখনই তাহাতে তিনি যোগ দিতেন। রামগোপাল ভিক্টোরিয়া ব্যাঙ্কের অন্যতর অধ্যক্ষ ছিলেন। 'সোমপ্রকাশ' (২৩শে নভেম্বর, ১৮৬৩) লেখেন,—

"কলিকাতা ভিক্টোরিয়া ব্যাঙ্কের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। বাবু রামগোপাল ঘোষ ও আপকার সাহেব ইহার অধ্যক্ষ। মূলধন ৫০,০০০০০ টাকা। প্রতি অংশে ৫০০ টাকা করিয়া ইহার দশ হাজার অংশী হইয়াছেন।..."

এইসময়ে জীবনবীমা স্থাপন সম্পর্কেও নূতন করিয়া আলোচনা হইতে থাকে। ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার প্রায় দুই বৎসর পরে ১৮৬৫ সালে সম্পূর্ণ বাঙালীদের কর্তৃত্বে একটি বীমা কোম্পানি গঠিত হইল। রামগোপাল ইহার সঙ্গেও যুক্ত হইলেন। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' (৭ ডিসেম্বর, ১৮৬৫) লেখেন ঃ

"সঞ্চয় ভাণ্ডার। এতদ্দেশে...সম্প্রতি মনুষ্য জীবনের উপর বীমা করিতে...এক সভা সংস্থাপিত হইয়াছে।

"ঐসভার কর্ম্মাধ্যক্ষ পদে শ্রীযুক্ত রাজা সত্যশরণ ঘোষাল, শ্রীযুক্ত বাবু রামগোপাল ঘোষ, শ্রীযুক্ত বাবু হীরালাল শীল, শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি মান্য ব্যক্তিরা নিযুক্ত হইয়াছেন, ইঁহাদিগের প্রতি প্রায় সমুদায় সাধু ব্যক্তির বিশ্বাস ও আস্থা আছে।..."

রামগোপালের বহুমুখী প্রতিভা শুধু ব্যবসাকর্মের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না, অন্য বহু ব্যাপারেও তাহা আত্মপ্রকাশ করে। স্বদেশ-সেবার একটি প্রধান উপায় সংবাদপত্র। রামগোপাল সংবাদপত্র পরিচালনেও মনোনিবেশ করিলেন। তিনি প্রথমে 'Civis' এই ছদ্মনামে বন্ধু রসিককৃষ্ণ মল্লিক সম্পাদিত ইংরেজী-বাংলা সাপ্তাহিক 'জ্ঞানান্বেষণে' 'Town Transit Duties' শীর্ষক একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেখেন। পূর্বে নগর হইতে নগরান্তরে জিনিসপত্র প্রেরণ করিতে হইলে প্রতিটি নগরের প্রবেশ-মুখে কর দিতে হইত। ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে ইহা কতখানি অপকারী তাহা প্রতিপাদন করাই ছিল রামগোপালের এই প্রবন্ধ লেখার উদ্দেশ্য। বলাবাহুল্য, পরে এইরূপ কর উঠিয়া যায়। রসিককৃষ্ণ মল্লিক সরকারী চাকুরি গ্রহণ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিলে 'জ্ঞানান্বেষণ' পরিচালন ও সম্পাদন ভার রামগোপাল স্বয়ং গ্রহণ করেন। রামগোপাল কাগজখানি সাধারণের মুখপত্র করিয়া তুলিবার জন্য কিরূপ সচেষ্ট হইয়াছিলেন, বন্ধুদের নিকট লিখিত পত্রাদি হইতে তাহা জানা যায়।

রামগোপাল ১৮৪২ সালের আরম্ভেই তারাচাঁদ চক্রবর্তী, প্যারীচাঁদ মিত্র ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া একখানি জ্ঞানগর্ভ জনহিতকর মাসিক পত্রিকা প্রকাশের মনঃস্থ করেন। এইসময় 'সমাচার দর্পণ' উঠিয়া যাওয়ায় ইহা আবার পুনঃপ্রকাশের কল্পনাও রামগোপালের ছিল। কিন্তু ইহা কার্যে পরিণত হয় নাই। যাহা হউক, প্রারম্ভিক আয়োজনাদি পরিসমাপ্ত করিয়া রামগোপাল ১৮৪২, এপ্রিল মাস হইতে 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' নামে একখানা ইংরেজী-বাংলা মাসিকপত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি হইলেন সাধারণ সম্পাদক, তারাচাঁদ

চক্রবর্তী, প্যারীচাঁদ মিত্র এবং কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর লেখার ভার পড়িল। তারাচাঁদ সকল রচনা দেখিয়া দিবেন স্থির হইল। 'জনগণের জ্ঞান ও সুখের বৃদ্ধি যাহাতে হয়' তদ্বিষয়ে আলোচনা ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হইল। 'রীতি ব্যবহারাদির উত্তমতা এবং বিদ্যা, কৃষিকর্ম্ম, ও বাণিজ্যাদির বৃদ্ধি আর রাজ্যশাসন কার্য্যের সুনিয়ম হইয়া প্রজাদিগের সর্ব্বপ্রকারে উন্নতি হয়'—এ সমুদয় আলোচনার বিষয়ীভূত হইল। পাঠক লক্ষ্য করিবেন, রাজ্যশাসনের নিয়ম তথা রাজনীতির আলোচনাও ইহার উদ্দেশ্য ছিল। জর্জ টমসন এদেশে আসিয়া ১৮৪২ সালের শেষ ভাগে এবং ১৮৪৩ সালে যখন রাজনৈতিক আলোচনা আরম্ভ করেন তখন এই 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' ইহার মুখপত্র হইয়াছিল। আর ইহার পরিচালকগণই টমসনের কার্যের বিশেষ সহায় হইয়াছিলেন। একথা পরে বলিতেছি।

'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর' ১৮৪২ সনের সেপ্টেম্বর হইতে পাক্ষিক এবং পর বৎসর মার্চ মাস হইতে সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। কিন্তু কাগজখানি বেশী দিন স্থায়ী হইল না। ১৮৪৩, ২০শে নবেম্বর শেষ সংখ্যা বাহির হইয়া বন্ধ হইয়া যায়। রামগোপাল এই পত্রিকাখানির প্রকাশ ও পরিচালনের জন্য সমস্ত আর্থিক ক্ষতি স্বয়ং স্বীকার করিলেন।

৫

স্বদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাধারণ জ্ঞান, রাজনীতি, কৃষি, শিল্প প্রভৃতির উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা প্রয়োজন—রামগোপাল একথা মর্মে মর্মে অনুভব করিতেন। এজন্য বিভিন্ন বিভাগে সভা-সমিতির প্রতিষ্ঠায় তিনি যেমন অগ্রণী হইয়াছিলেন তেমনি স্বদেশের হিতকারক বহু প্রতিষ্ঠানেও তিনি যোগ দিতে দ্বিধা করেন

নাই। একাডেমিক এসোসিয়েশনের কথা পূর্বে বলিয়াছি। যতদিন এই সভাটি জীবিত ছিল ততদিন তিনি ইহার সঙ্গে যোগরক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। ১৮৩৯, ৩০শে মার্চ বন্ধু গোবিন্দচন্দ্র বসাককে তিনি দুঃখ করিয়া লেখেন যে, এই সভাটি মৃতপ্রায়, ইহার আগেকার সেই সুদিন আর ফিরিয়া আসিবে না।

'এপিস্টল্যারি এসোসিয়েশন' (Epistolary Association) প্রতিষ্ঠার মূলেও ছিলেন রামগোপাল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল পত্রদ্বারা পরস্পরের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে ভাবের আদান-প্রদান। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক কোনও বিষয়ই এই আলোচনা হইতে বাদ যাইত না। কিছুকাল এইরূপ পত্রালাপ চলিয়াছিল।

'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' (Society for the Acquisition of General Knowledge) রামগোপাল ও তাঁহার বন্ধুগণের আর একটি বিশেষ কীর্তি। জ্ঞানোপার্জিকা সভায় দেশের অবস্থা ও সমস্যা এবং শিক্ষা ও সমাজসম্বন্ধীয় যেসব প্রবন্ধ পঠিত হইত আর তাহা লইয়া যেরূপ আলোচনা চলিত তাহাতে সভ্যদের অজ্ঞাতসারেই এরূপ একটি ক্ষেত্র ধীরে ধীরে প্রস্তুত হইতেছিল যেখানে রাজনীতি তথা ভারতের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কীয় আলোচনাই মুখ্য হইয়া উঠিবে। বস্তুতঃ তাহাই হইয়া উঠিল। ১৮৪২ সালের শেষভাগে দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন বিখ্যাত বক্তা ও রাজনীতিবেত্তা জর্জ টমসনকে এদেশে লইয়া আসেন তখন রামগোপাল প্রমুখ সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার কর্মকর্তৃগণই প্রথমে একটি অধিবেশনে তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। তাঁহারা অগ্রণী হইয়া টমসনের বক্তৃতার জন্য সভানুষ্ঠানের ভার গ্রহণ করেন। তাঁহাদেরই উদ্যোগে প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ সিংহের মাণিকতলাস্থ বাগানবাটীতে এবং পরে শহরের মধ্যস্থলে ফৌজদারি বালাখানায় বৃহত্তর সভার অনুষ্ঠান হয় এবং জর্জ টমসন তাহাতে বক্তৃতা করেন।

এখানে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। কেননা তাহার সঙ্গে রামগোপালের বিশেষ যোগ ছিল। ভারতবাসীর হিতকল্পে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। রামমোহন রায়ের বন্ধু এবং ভারতের সত্যকার শুভার্থী উইলিয়াম এডাম ঐ বৎসর আমেরিকা হইয়া বিলাতে ফিরিয়া যান এবং উক্ত সভা প্রতিষ্ঠা করিতে অগ্রসর হন। এদেশে অবস্থানকালেই এডামের সঙ্গে এবিষয়ে রামগোপালের বার বার আলোচনা হয়। বিলাতের কর্মপদ্ধতি কিরূপ হইবে তৎসম্বন্ধে উভয়ে পরামর্শ করিয়াছিলেন। রামগোপাল ১৮৩৮ সালের ১২ই আগস্ট একখানি পত্রে বন্ধু গোবিন্দচন্দ্র বসাককে এই সম্বন্ধে সবিস্তারে লেখেন। তিনি ও তাঁহার দেশবাসিগণ এদেশের শাসন-ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি, জনসাধারণের অবস্থা, আর্থিক ও অন্যবিধ উন্নতির উপায় প্রভৃতি সম্বন্ধে যথাযথ তথ্য সংগ্রহ করিয়া কিভাবে এডামকে সাহায্য করিতে পারেন এই পত্রে তাহারও উল্লেখ ছিল। রামগোপাল উক্ত সোসাইটির সঙ্গে যোগ রাখিয়া চলিতেন। জর্জ টমসন বিলাতস্থ সোসাইটির সভ্য হইয়া ভারতবাসীর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাহাদের রাষ্ট্রীয় বুদ্ধি যাহাতে অধিকতর জাগ্রত হয় তাহার চেষ্টা করিবার জন্য এদেশে আগমন করেন।

এখানেও ক্ষেত্র আগে হইতেই প্রস্তুত হইতেছিল। টমসনের বক্তৃতায় রামগোপাল প্রমুখ নেতৃবর্গ আরও উৎসাহিত হইয়া এদেশেই একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা টমসনকে সভাপতি করিয়া ১৮৪৩ সালের ২০শে এপ্রিল ইংলণ্ডীয় সভার আদর্শে বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি নামে একটি রাজনৈতিক সভা স্থাপন করিলেন। ব্রিটিশ-রাজের আনুগত্য স্বীকারপূর্বক স্বদেশের সকল প্রকার উন্নতি-সাধন ইহার মূল উদ্দেশ্য বলিয়া গণ্য হইল। রামগোপাল সোসাইটির কার্যে সবিশেষ তৎপর ছিলেন। তিনি প্রথম হইতেই ইহার

সহকারী সভাপতি হন। ১৮৪৫ সনে সুপ্রিম কোর্টের উকীল ডব্লিউ. থিওবোল্ড সভাপতির পদ ত্যাগ করিলে তাঁহার স্থলে রামগোপালই সোসাইটির সভাপতি হইলেন।

বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি একদিকে যেমন রাজনৈতিক প্রচেষ্টার ভার লইলেন, সেইরকম অন্যদিকে তত্ত্ববোধিনী সভা স্বদেশের ধর্ম ও সংস্কৃতির সংশোধন-পরিপোষণে তৎপর হইয়াছিলেন। রামগোপাল এই সভার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন। ১৮৪৪-৪৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পর পর তিন বৎসর তিনি এই সভার একজন অধ্যক্ষ ছিলেন। সভার অন্তর্ভুক্ত তত্ত্ববোধিনী পাঠশালারও তিনি ছিলেন একজন পৃষ্ঠপোষক। তিনি উৎকৃষ্ট ছাত্রদের পুস্তক ও অর্থ পুরস্কারস্বরূপ দিয়া উৎসাহিত করিতেন। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা এক হিসাবে আমাদের দেশে সর্বপ্রথম জাতীয় বিদ্যালয়। মাতৃভাষার মাধ্যমে সকল বিষয়ই এখানে শিক্ষা দেওয়া হইত। যাহা হউক, বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি এবং তত্ত্ববোধিনী সভা এই সময় পরস্পরের পরিপূরক হইয়া কার্য করিতে থাকে এবং রামগোপাল উভয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই যুক্ত হইয়া পড়েন।

রামগোপাল ১৮৪৯-৫০ সালে আর একটি আন্দোলনের পুরোভাগে আসিয়া পড়িলেন। মফস্বলের ফৌজদারি আদালতে ইউরোপীয়দের বিচার হইতে পারিত না। এইহেতু ভীষণ অনর্থ উপস্থিত হইত। মফস্বলবাসী নীলকর প্রভৃতি ইউরোপীয়েরা নির্বিঘ্নে নীলচাষী ও জনসাধারণের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন করিত। এই অনর্থ নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে সরকারের পক্ষে আইন-সচিব জন 'এলিয়া' ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন চারিটি আইনের খসড়া প্রস্তুত করিয়া ১৮৪৯ সালের শেষ-ভাগে প্রচার করেন। এরূপ আইন প্রণয়নের প্রস্তাবে ইউরোপীয়দের মধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। সরকার ইউরোপীয়দের বিরোধিতা উপেক্ষা করিতে না পারিয়া এ প্রস্তাব পরিত্যাগ করিলেন। বস্তুতঃ

১৮৩৩ সনের সনন্দ-প্রাপ্তি এবং অন্যান্য ব্যবস্থার ফলে দ্বারকানাথের সময় হইতে এইসময়ের মধ্যে ইউরোপীয় সমাজের মনোভাব অনেকখানি বদলাইয়া যায়। তাহারা ভারতীয়দের স্বার্থ অপেক্ষা নিজেদের স্বার্থ বড় করিয়া দেখিতে লাগিল। রামগোপাল ঘোষ ঐরূপ আইন প্রণয়নের যুক্তিযুক্ততা প্রতিপাদন করিয়া 'Black Acts' নামে একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। তাঁহার উপর ইউরোপীয়দের ক্রোধ বৃদ্ধি হইল। তাহারা অন্য কোনভাবে শোধ তুলিতে না পারিয়া ভোটের জোরে এগ্রিকালচারাল এণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি হইতে ১৮৫০ সনে তাঁহার নাম কাটিয়া দিলেন। তখন রামগোপাল ইহার সহকারী সভাপতি ছিলেন। ১৮৪৪ সালে তিনি এই সোসাইটির সদস্য হন এবং তদবধি অর্থ ও পরামর্শ দিয়া ইহার সেবা করিয়া আসিতেছিলেন। এদেশে কৃষির উন্নতিসাধন, উদ্যান-রচনা প্রভৃতি এই সোসাইটির প্রধান কার্য ছিল।

এইসময়ে বাঙালীদের মধ্যে নিজ হীনাবস্থা সম্বন্ধে যে নূতন করিয়া চেতনার উদ্রেক হয় তাহারই সাক্ষাৎ ফল হইল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারতবর্ষীয় সভা। এই সভা ১৮৫১, ২৯শে অক্টোবর স্থাপিত হয় এবং প্রগতিপন্থী প্রাচীনপন্থী সকলেই একই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এখানে সম্মিলিত হন। বলাবাহুল্য, প্রগতিপন্থী রামগোপাল ইহার সহিত যুক্ত হইলেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি ইহার সঙ্গে যোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন। ইহার বিভিন্ন অধিবেশনে যোগদান করিয়া নানাভাবে তিনি সহায়তা করিতেন।

সরকারী বেসরকারী বহু সভায় ও কমিটিতে সদস্য থাকিয়া রামগোপাল নিজের জ্ঞানবুদ্ধিমতে সাধারণের সেবা করিয়া গিয়াছেন। ১৮৪৫ সালের পুলিস কমিটি, ১৮৫০ সালের স্মল পক্স কমিটি ও ১৮৬৪ সালের কৃষি-প্রদর্শনী কমিটিতে সভ্য হিসাবে তাঁহার কার্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি দীর্ঘকাল কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির সদস্য ছিলেন

এবং শহরের উন্নতিকল্পে তৎপর হন। বঙ্গের প্রথম আইন পরিষদে তিনি সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন। তিনি ১৮৬২-৬৪ এই দুই বৎসর এ-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ডিস্ট্রীক্ট চেরিটেবল সোসাইটির নেটিভ কমিটিতে ১৮৫০ সাল হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত রামগোপাল সভাপতি-পদে বৃত থাকিয়া বিবিধ সেবা-কার্য করিয়াছিলেন।

৬

রাজনৈতিক কার্য এবং অন্যবিধ জনসেবার কথাই এখন পর্যন্ত বলা হইল। দেশবাসীর মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারকল্পে তিনি যে ঐকান্তিকতা দেখাইয়াছিলেন তাহাও অতুলনীয়। এখানে কয়েকটি বিষয়ের মাত্র উল্লেখ করা যাইতে পারে। এদেশে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে ১৮৩৫ সালে কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, রুস্তমজী কাওয়াসজী প্রমুখ দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ ছাত্রদের চিকিৎসা বিদ্যা আয়ত্ত করিতে অহরহ উৎসাহ দিতেন। রামগোপালও তাহাদিগকে নানা-ভাবে উৎসাহিত করিতেন। ১৮৪২ সালে তিনি অস্ত্রোপচারের উপযোগী পাঁচ শত টাকা মূল্যের এক প্রস্থ যন্ত্রপাতি কলেজের সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্রকে উপহার দেন। সরকারী শিক্ষা-সমাজের (Council of Education) সেক্রেটারি এইচ্. ভি. বেলী ২২শে ফেব্রুয়ারী বড়লাটের ধন্যবাদসহ তাঁহাকে প্রশংসাসূচক একখানি পত্র লেখেন। রামগোপাল ইহার যে উত্তর দেন শিক্ষা-সমাজের রিপোর্ট (১৮৪২-৪৩) হইতে এখানে তাহা হুবহু উদ্ধৃত করা হইল ঃ

"Sir,

I am honoured with your Communication of the 26th ultimo, and in reply beg to express my

utmost acknowledgements for the kind and most unexpected notice of my very humble efforts in the cause of native amelioration, on the part of the Council of Education.

Permit me also to express my very grateful sense of the encouraging notice taken by the Supreme Government of my conduct in reference to the education of my countrymen. When I think of the isolated and poor exertions I have sometimes made in that good cause, and consider on the other hand the distinction that has been conferred upon me by the approbation conveyed in your letter, I feel humiliated knowing that it results less from any merits in mine than the kindly and fostering disposition thus generally evinced by the Government and the Council of Education.

In conclusion I venture to express a hope that in the letter to which I am thus inadequately replying, I may find an additional motive to do all the little I can to further the great objects of your Council, and that, if my life be spared, a day may come when I may claim such communications as a deserved reward.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient Servant,
Ram Gopal Ghose.

Calcutta, 3rd March,
1842.

এই পত্রখানির মধ্যে স্বদেশবাসীদের ভিতর শিক্ষার প্রসারে রামগোপালের ঐকান্তিক আগ্রহের কথাই প্রকাশ পাইতেছে। স্বদেশ-সেবা

তথা স্বদেশবাসীদের শিক্ষাদানে যথাসাধ্য চেষ্টা করা যে তাঁহার একটি বিশেষ কর্তব্য তাহা তিনি ইহাতে সবিনয়ে জ্ঞাপন করিলেন।

মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ডাঃ গুডিভের তত্ত্বাবধানে চারি জন বাঙালী ছাত্র চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য ১৮৪৫ সালের প্রথম ভাগে বিলাতে গমন করেন। তাঁহাদের মধ্যেকার দুই জনের ব্যয় দ্বারকানাথ ঠাকুর সম্পূর্ণ বহন করিয়াছিলেন। রামগোপাল তাঁহাদের বিলাতযাত্রায় বিশেষ উৎফুল্ল হন এবং জাহাজে তাঁহাদের সঙ্গে কিয়দ্দূর গমন করিয়া তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করেন।

স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে রামগোপালের কার্য আরও স্মরণীয়। ১৮৪২ সালে তিনি ঘোষণা করেন যে, হিন্দু কলেজের প্রথম দুই শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে যে দুই জন স্ত্রীশিক্ষার উপর উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিবেন তাঁহাদিগকে দুইটি পদক পুরস্কার দিবেন। যাঁহার রচনা সর্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হইবে তাঁহাকে দেওয়া হইবে স্বর্ণপদক, তাহার পরবর্তী রচনার জন্য দেওয়া হইবে রৌপ্যপদক। কলেজের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রগণ প্রতিযোগিতায় যোগ দেন নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রগণ প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় যোগ দেন। তাঁহাদের মধ্যে কবিবর মধুসূদন দত্ত স্বর্ণপদক এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায় রৌপ্যপদক পুরস্কার পাইয়াছিলেন।

রামগোপাল ইহার পর বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি দ্বারা স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের একটি পরিকল্পনা করাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা কার্যে পরিণত করা সম্ভবপর হয় নাই। ইতিমধ্যে বেথুন সাহেব ১৮৪৮ সালের এপ্রিল মাসে সরকারের আইনসদস্য পদে নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় আসিলেন। তিনি শিক্ষা-সমাজের সভাপতি হইলেন। রামগোপাল এই সনেই উহার একজন সদস্য মনোনীত হন। কমিটির কর্মোপলক্ষে রাম-গোপাল বেথুন সাহেবের সংস্পর্শে আসেন ঘনিষ্ঠভাবে। রামগোপাল বেথুনের বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে যে প্রধান উপদেষ্টা (princi-

pal adviser) ছিলেন—বড়লাট লর্ড ডালহৌসীকে লিখিত একখানি পত্রে বেথুন তাহার উল্লেখ করেন। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারও বেথুন সাহেবকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

রামগোপাল ১৮৪৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড কমিটির একজন অধ্যক্ষ হন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল উৎকৃষ্ট বাংলা রচনার জন্য লেখকদের পুরস্কার প্রদান। ১৮৬৪ সালে শুধু স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক প্রকাশের জন্যই অর্থব্যয় করা সাব্যস্ত হয়। রামগোপাল ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই কমিটির একজন অধ্যক্ষ ও ফণ্ডের ন্যায়রক্ষক ছিলেন।

শিক্ষা-সমাজের সদস্য হিসাবেও (১৮৪৮-৫৫, জানুয়ারী) রামগোপাল শিক্ষাপ্রসার উদ্দেশ্যে অনেক কার্য করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনার মূলে তিনিও ছিলেন একজন। হিন্দু কলেজ ভাঙিয়া যখন হিন্দু স্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজ করা হইল (১৫ই মে ১৮৫৪) তখন তাঁহার পরামর্শ বিশেষ কার্যকরী হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরিচালক-সভায় (সেনেট) তিনি একজন সদস্য মনোনীত হন। নিজ গ্রাম হুগলী জেলার বাঘাটিতে তিনি একটি ইংরেজী-বাংলা স্কুল স্থাপন করেন।

বেথুন সাহেবের মৃত্যুর পরে তাঁহার নামের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেশী-বিদেশী বিদগ্ধ জনেরা সম্মিলিত হইয়া ১৮৫১ সালের ১১ই ডিসেম্বর বেথুন সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাতে ধর্ম ও রাজনীতি ব্যতীত শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, সমাজ-বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিষয়ই আলোচনা হইত। রামগোপাল প্রতিষ্ঠা অবধি ইহার সহকারী সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

রামগোপালের বক্তৃতা-শক্তি ছিল অসাধারণ। রাজনীতিক আলোচনায় বাগ্মিতার কতখানি প্রয়োজন ও সার্থকতা, ভারতবাসীদের মধ্যে রামগোপাল ঘোষই মনে হয়, সর্বপ্রথম তাহা দেখাইয়াছেন। বক্তৃতা দ্বারা তিনি লোককে মাতাইয়া তুলিতেন এবং যাহা একসময়ে অসম্ভব মনে হইত, বক্তৃতার পরে তাহা সম্পূর্ণরূপে সম্ভব হইয়া যাইত। বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের ভারত-ত্যাগের প্রাক্কালে তাঁহাকে বিদায় অভিনন্দন দানের উদ্দেশ্যে ১৮৪৭, ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতা টাউন-হলে এক জনসভা হয়। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হার্ডিঞ্জের শিক্ষাবিষয়ক কার্যাবলীর কথা অভিনন্দন-পত্রে জুড়িয়া দিবার জন্য মূল প্রস্তাবের একটি সংশোধনী আনয়ন করেন। ইউরোপীয়েরা ইহাতে আপত্তি করিলে রামগোপাল এই সংশোধনীর সমর্থনে সভাস্থলে এরূপ বক্তৃতা করিয়াছিলেন যে, মূল প্রস্তাবের পরিবর্তে তাঁহার সমর্থিত প্রস্তাবই গৃহীত হইয়া যায়। পর দিবস তাঁহার সার্থক বাগ্মিতার প্রশংসা করিয়া ইংরেজী সংবাদপত্রে তাঁহাকে 'ইণ্ডিয়ান ডিমস্থিনিস' বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইল।

ইহার পর উল্লেখযোগ্য কোম্পানীর সনন্দ পুনঃপ্রাপ্তি উপলক্ষে ১৮৫৩ সালের ২৯শে জুলাই অনুষ্ঠিত সভায় বক্তৃতা। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের সনন্দের স্পষ্ট নির্দেশ সত্ত্বেও কিরূপ অপকৌশলে সরকারী শাসনবিভাগ, বিশেষতঃ সিবিল সার্বিস হইতে ভারতবাসীদিগকে দূরে সরাইয়া রাখিবার চেষ্টা হয় বক্তৃতায় তিনি তাহা বিশদভাবে বর্ণনা করেন। প্রস্তাবিত (বড়লাটের) আইন-সভায় একজনও ভারতীয় সদস্য গ্রহণ না করায় যে ভীষণ অনর্থের সৃষ্টি হইবে বক্তৃতায় তাহারও তিনি আভাস দিলেন।

সিপাহী বিদ্রোহের মধ্যে ১৮৫৮ সনের অক্টোবর মাসে কোম্পানীর হস্ত হইতে রানী ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন। এই

সময় ভারতবর্ষের শাসন-নীতি সম্বন্ধে তিনি এক ঘোষণাপত্র (Queen's Proclamation) প্রচার করেন। ইহাকে অভিনন্দিত করিয়া রামগোপাল যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতেও সকলে চমৎকৃত হইয়াছিল। তিনি বক্তৃতায় এই আশাই প্রকাশ করেন যে, রানীর ঘোষণাপত্রানুযায়ী শাসনপ্রণালী পরিচালিত হইলে দেশে পুনরায় সুবিচার ও সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হইবে।

রামগোপালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বক্তৃতা ১৮৬৪ সালের ৭ই মার্চ প্রদত্ত নিমতলা-শ্মশানঘাট সম্পর্কে। তৎকালীন ছোটলাট সার সিসিল বীডন কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটিকে এই মর্মে নির্দেশ দেন যে, নিমতলা হইতে শ্মশান-ঘাট তুলিয়া দিয়া নগরীর উপকণ্ঠে কোনও স্থলে নূতন শ্মশান-ঘাট স্থাপন করা হউক। উক্ত দিবসে মিউনিসিপ্যালিটির অধিবেশনে এই বিষয়ে ইতিকর্তব্য স্থির করার কথা ছিল। রামগোপাল বীডনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এরূপ অকাট্য যুক্তি উত্থাপন করিয়া বক্তৃতা করিলেন যে, তাহা আর গৃহীত হইল না। বীডন সাহেবও বেগতিক দেখিয়া আদেশ প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইলেন।

৮

প্রায় দুই বৎসর রোগভোগের পর ১৮৬৮, ২০শে জানুয়ারী রামগোপাল ইহধাম ত্যাগ করেন। তিনি অতিশয় বন্ধুবৎসল ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে বন্ধুদের নিকট প্রাপ্য প্রায় চল্লিশ হাজার টাকার দাবী তিনি ছাড়িয়া দেন। তিনি উইল দ্বারা ডিস্ট্রিক্ট চেরিটেবল সোসাইটিকে দশ হাজার টাকা এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে পঁচিশ হাজার টাকা দান করিয়া যান। বিভিন্ন সভাসমিতিতে তাঁহার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করা হয়। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ২২শে ফেব্রুয়ারী শোকপ্রকাশের

জন্য একটি জনসভার অনুষ্ঠান করেন। সভার অন্যতম উদ্যোক্তা প্যারীচাঁদ মিত্রকে রামগোপাল সম্পর্কে ডাঃ মৌএট যে পত্রখানি লেখেন তাহা এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে,—

Ranchee—Chota Nagpur,
12th February, 1868.

My dear friend,

Your note of the 8th reachcd me on my arrival here this morning, and I lose no time in replying to it, in the hope that it may reach you in time to make known to your meeting my estimate of late Ramgopal Ghosh with whom I was associated for so many years, from my intercourse with whom I always derived pleasure and advantage, and whose loss I mourn sincerely as that of one of my earliest and most esteemed native friends. My acquaintance with him began more than a quarter of a century ago. I scarcely remember how in all the great questions of that time I used to consult him freely and frequently—and always with benefit. His judgement was sound, his views were large, and his sympathies were always enlisted in every matter tending to the advancement of education.

As a speaker and writer he had a singular command of pure and idiomatic English, and so thoroughly he identified himself with the subject he was discussing or advocating as to render it difficult to believe that English thought and expression were foreign to him and that he had not been brought up in our English household.

When I first thought that education in India had advanced far enough to need and warrant the establishment of universities, he was one of the first whom I consulted and to him, and to some other honored native friends—one at least of whom is still alive -I submitted my plan sometime before it was seen by the Council of Education.

When I established the Bethune Society he was one of those who met in my house and assisted me heart and soul in its early working. In fact I can look back upon no part of my early career in connection with education which is not associated with him.

As a citizen his worth and intelligence are as well known to you as they are to me. As a public man he was upright, disinterested and singularly free from prejudice, in private life he was charitable, hospitable to a fault, and ever ready to contribute to any good effects whether for the benefit of his own countrymen or of mine. He was in the highest sense of the word a just and upright man, and I know of few whose example I would more strongly recommend for imitation by his younger countrymen in the bright side of his character.

He was not without faults—which of us are—but his virtues so far outweigh his foibles that I can remember naught but good of him.

This is but a feeble expression of my estimate of Ramgopal Ghose. So long as Bengal produces such

sons she need have no misgivings to her future place among nations.

Believe me, my dear friend, ever yours most truly.

F. J. Mouat.

ডাঃ মৌএট বহু বৎসর কাউন্সিল অফ এডুকেশনের সেক্রেটারী ছিলেন। শিক্ষা ব্যাপারে তিনি প্রথমে রামগোপালের সংস্পর্শে আসেন। উভয়ের পরিচয় ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হয়। ১৮৪৪ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত পরিকল্পনা রচনায় এবং বেথুন সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় রামগোপাল তাঁহাকে সবিশেষ সহায়তা করেন, পত্রে তাহা জানা যাইতেছে। রামগোপালের ঐকান্তিক ন্যায়পরায়ণতা, সততা, সহৃদয়তা এবং স্বদেশপ্রেম ডাঃ মৌএটকে যেমন মুগ্ধ করিয়াছিল, এতদিন পরে আমরাও তাহা স্মরণ করিয়া নিজেদের ধন্য বোধ করিতেছি।

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

১

"নীল বানরে সোনার বাঙ্গলা করলে এবার ছারেখার
অসময়ে হরিশ ম'ল, লঙের হ'ল কারাগার,
প্রজার আর প্রাণ বাঁচানো ভার।"

নীলদর্পণ নাটক-প্রণেতা দীনবন্ধু মিত্র 'ধীরাজে'র মুখ দিয়া এই গান করাইয়াছেন। মনীষী এমার্সন বলিয়াছেন, "Names of Great Men are the verbs of the language"; মহাপুরুষদের নাম ভাষার ক্রিয়াপদস্বরূপ, অর্থাৎ তাঁহাদের জীবন ও কর্ম সকল বিষয়ে সমাজে অনুপ্রেরণা জাগায়। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'তন্ মন ধন' সকলই দেশের ও সমাজের সেবায় অর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর প্রায় এক শতাব্দী অতিক্রান্ত হইতে চলিল তথাপি হরিশ্চন্দ্র আমাদের মধ্যে যেন সশরীরে বিদ্যমান রহিয়াছেন। জাতির জীবনে যে নবারুণ দেখা দিয়াছে তাহার আবির্ভাব এক দিনে হয় নাই। শতাব্দীর চেষ্টায় ভারতীয় মহাজাতি স্বাধীনতার দ্বারে সমুপস্থিত হয়। যেসব মনীষী ও আত্মত্যাগী মহাপুরুষ এই ব্রত উদ্‌যাপনে প্রথম হইতে সবিশেষ ব্যগ্র ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে হরিশ্চন্দ্রের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করিতে হয়। ইংরেজ জাতির শাসন ও শোষণের ফলে গত শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙালী সমাজের অশেষ দুর্গতি ঘটে। এইসময় প্রবল শক্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া সার্থকভাবে হরিশ্চন্দ্র স্বজাতির সপক্ষতা করিয়াছিলেন। তিনি বাঙালীর প্রাণে রাষ্ট্রীয় চেতনার উদ্রেক করিতে বিশেষভাবে চেষ্টিত হন। তাঁহার

অকালমৃত্যু বাঙালীর নিকট বিশেষ দুঃখের কারণ হয়। উপরের কয়েক পঙ্‌ক্তি ইহারই দ্যোতক।

হরিশ্চন্দ্র ১৮২৪ সনের এপ্রিল মাসে কলিকাতাস্থ ভবানীপুরে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রামধনের তিন বিবাহ, হরিশ্চন্দ্র তাঁহার তৃতীয়া পত্নীর দ্বিতীয় সন্তান। হরিশ্চন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কথা পরে আমরা আরও পাইব। হরিশ্চন্দ্র শৈশবে পাঠশালায় পাঠাভ্যাস করিবার পর তত্রত্য ইউনিয়ন স্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু অবস্থাবৈগুণ্যে এখানে তাঁহার বিদ্যাভ্যাসের সুবিধা হয় নাই। চতুর্দশ বর্ষ বয়সেই তাঁহাকে আয়ের পথ অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে হয়। তাঁহার এ-সময়কার দুরবস্থা ও অভাব-অভিযোগের কথা শুনিলে অনেকেই এই ভাবিয়া আশ্চর্য হইবেন যে, কিরূপে এত দৈন্যদশার মধ্যেও তিনি অত বড় হইতে পারিয়াছিলেন। কত প্রতিভা দুরবস্থার চাপে পড়িয়া অকালে নিষ্প্রভ হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। গ্রে তাঁহার 'এলিজি' কবিতায় এই কথাগুলি কি সুন্দরভাবেই না ব্যক্ত করিয়াছেন! কিন্তু হরিশ্চন্দ্র ছিলেন ইহার ব্যতিক্রম। তিনি অনশনে অর্ধাশনে দিন কাটাইয়াও কখনও দমিয়া যান নাই। পরিবারের ভরণপোষণের উপায় করিবার জন্য চতুর্দশ বর্ষ বয়স হইতেই তিনি যত্নপর হইলেন। আরজি, দরখাস্ত, দলিলের নকল, চিঠিপত্র প্রভৃতি লিখিয়া দিনান্তে যাহা কিছু পাইতেন তাহা দ্বারাই পরিবার প্রতিপালনের চেষ্টা করিতেন। এইরূপ করিতে করিতে তিনি টালা নীলাম কোম্পানীতে দশ টাকা বেতনে একটি কর্ম যোগাড় করেন।

স্বল্প আয়ে নিতান্ত দুঃখ-দৈন্যের মধ্যে কাল কাটাইতে হইলেও হরিশ্চন্দ্রের অধ্যয়নস্পৃহা বরাবরই বলবতী ছিল। তিনি অল্প বয়সে বিদ্যালয় ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি এখন হইতে জগতের বৃহত্তর বিদ্যালয়ে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা লাভ করিতে লাগিলেন।

হরিশ্চন্দ্র পুস্তক অধ্যয়ন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। জীবনের তীব্র অভিজ্ঞতার মধ্যেও, স্বল্প আয় হইতে কিছু কিছু বাঁচাইয়া তাহা দিয়া তিনি বই কিনিতেন এবং প্রত্যেকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া নানারূপ জ্ঞান অর্জন করিতেন। সামান্য কথান্তর হওয়ায় হরিশ্চন্দ্র নীলাম কোম্পানীর চাকুরীও ছাড়িয়া দিলেন। তখন তিনি কি দুরবস্থায় পড়িয়াছিলেন তাহা সহজেই অনুমেয়। ইংরেজী ১৮৪৮ সালে মিলিটারি একাউণ্টস বিভাগে পঁচিশ টাকা বেতনের একটি পদ খালি হয়। প্রতিযোগিতা পরীক্ষা দ্বারা কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা হইলে হরিশ্চন্দ্র এই পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হন এবং উক্ত কর্ম লাভ করেন। এই সময় হইতেই তাঁহার দুঃখময় জীবনের কথঞ্চিৎ অবসান হইল এবং জীবনের গতিও ফিরিয়া গেল। মিলিটারি একাউণ্টস বিভাগের উপরিতন কর্মচারীরা শীঘ্রই হরিশ্চন্দ্রের বিদ্যাবুদ্ধি ও অদম্য কর্মশক্তির পরিচয় পাইলেন। তাঁহার দ্রুত পদবৃদ্ধি হইতে লাগিল। কয়েক বৎসরের মধ্যেই পঁচিশ টাকা হইতে তাঁহার বেতন চারি শত টাকা হইল।

হরিশ্চন্দ্রের অধ্যয়ন-স্পৃহার কথা বলিয়াছি। সরকারী কর্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহার পুস্তক পাঠে বিশেষ সুবিধা হইল। তাঁহার গুণমুগ্ধ উপরিতন কর্মচারীরা পুস্তকাদি দিয়া তাঁহার এই স্পৃহা মিটাইতে সাহায্য করিতেন। কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর (যাহা এক্ষণে ন্যাশনাল লাইব্রেরী নামে পরিচিত) সভ্য হইয়া তিনি আপিসের পর নিয়মিতভাবে সেখানে গিয়া অধ্যয়নে রত থাকিতেন। তিনি খুব দ্রুত অধ্যয়ন করিতে পারিতেন। কথিত আছে, চারি পাঁচ মাসের মধ্যে পঁচাত্তর খণ্ড 'এডিনবরা রিভিয়ু' কয়েক বার আগাগোড়া পড়িয়াছিলেন। এবম্বিধ নিয়মিত অধ্যয়নের ফলে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে তিনি গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁহার আহৃত জ্ঞানের পরিচয় লেখার মধ্যেও শীঘ্রই প্রকাশ পাইতে শুরু হয়। হিন্দু কলেজের প্রথমদিককার

অন্যতম বিখ্যাত ছাত্র সুকবি কাশীপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত *Hindu Intelligencer* সাপ্তাহিকে হরিশ্চন্দ্র রীতিমত প্রবন্ধাদি লিখিতেন। তখনকার *Englishman*-সম্পাদক ভারতহিতৈষী ছিলেন। তিনিও হরিশ্চন্দ্রের রচনা নিজ পত্রিকায় প্রকাশ করিতে থাকেন। জ্ঞান অর্জন এবং অর্জিত জ্ঞান সাধারণে পরিবেশন তখন সমভাবেই চলিতে লাগিল। হরিশ্চন্দ্রের মধ্যে ভাবী সম্পাদক-মনুষ্যটি এইরূপে পরিবর্ধিত হইবার সুযোগ লাভ করে।

হরিশ্চন্দ্র কিরূপে সংবাদপত্রের সম্পাদনা কার্যে রত হন তাহা বলিবার পূর্বে তাঁহার সামাজিক ও পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা আবশ্যক। হরিশ্চন্দ্রের অল্প বয়সে বিবাহ হয়। এই পত্নীর গর্ভে তাঁহার একটি পুত্রসন্তান জন্মে, কিন্তু দুই তিন বৎসর বয়সেই মারা যায়। অল্পদিন পরে পত্নীরও দেহান্ত ঘটে। হরিশ্চন্দ্র দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন। কিন্তু এই পত্নীর গর্ভে তাঁহার কোনও সন্তানাদি হয় নাই। হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর তিনি বহু বৎসর জীবিত ছিলেন।

দর্শনশাস্ত্রের প্রতি হরিশ্চন্দ্রের গভীর অনুরাগ ছিল। তিনি ভবানীপুর হইতে কলিকাতায় হেদুয়া পর্যন্ত দীর্ঘ পথ হাঁটিয়া ডাফের দর্শন বিষয়ক বক্তৃতা শুনিতে যাইতেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন। ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত বক্তৃতাবলী মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে ১৮৮৮ সনে *Lectures on Religious Subjects* নামে ব্রজলাল চক্রবর্তী প্রকাশ করেন। ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ পরে আদি ব্রাহ্মসমাজে পরিণত হয়। হরিশ্চন্দ্র মদ্যপায়ী ছিলেন। ব্রাহ্মগণ তখন মদ্যপানের বিরোধী ছিলেন না। রাজনারায়ণ বসু ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইয়াও প্রথমদিকে কিরূপ মদ্যপানে আসক্ত ছিলেন তাহা তাঁহার আত্মচরিত পাঠে জানা যায়।

রাজনীতির চর্চা হরিশ্চন্দ্রের জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। সমাজ-সেবা এবং সমাজোন্নতিমূলক আন্দোলনকে তিনি ইহার অঙ্গ করিয়া লইয়াছিলেন। কিশোরীচাঁদ মিত্র কলিকাতার উপকণ্ঠে কাশীপুরে ১৮৫৪ সনের ১৫ই ডিসেম্বর সমাজোন্নতিমূলক নানা বিষয়ের আলোচনার উদ্দেশ্যে একটি সভা আহ্বান করেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এখানেই সমাজোন্নতিবিধায়িনী সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সভার একজন উদ্যোগী সভ্য হইলেন হরিশ্চন্দ্র। সভায় বিধবা-বিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ বন্ধ করান, স্ত্রীশিক্ষার প্রচার এবং সমাজোন্নতিমূলক পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ—এ-সকলেই হরিশ্চন্দ্রের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। এসব সম্পর্কে নিজ পত্রিকা 'পেট্রিয়টে' তিনি রীতিমত লেখনী পরিচালনা করিতেন। বহুবিবাহ নিষেধক এবং পুস্তিকা প্রকাশ সাবকমিটির বিশিষ্ট সদস্য হিসাবে হরিশ্চন্দ্র অনেক কার্য করেন। গত শতাব্দীর মধ্যভাগে এই সভা বিবিধ সামাজিক সমস্যার সমাধানে সহায়তা করিয়াছিল। এদিকেও হরিশ্চন্দ্রের কৃতিত্ব যথেষ্ট ছিল।

হরিশ্চন্দ্র প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে যোগদান করেন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারতবর্ষীয় সভার সভ্য রূপে। এই সভা ১৮৫১ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং পর বৎসরই তিনি ইহার সঙ্গে যুক্ত হন। রামগোপাল ঘোষ বলিয়াছেন যে, ১৮৫৩ সনে ভারতবর্ষীয় সভার পক্ষে সনন্দের প্রতিবাদ করিয়া পার্লামেণ্টে যে আবেদন প্রেরণ করা হয় তাহা হরিশ্চন্দ্রেরই রচনা। এ-সম্পর্কে সুপ্রসিদ্ধ কালীপ্রসন্ন সিংহও লেখেন, "ইংরাজি ১৮৫৩ সালে যখন পার্লিয়ামেণ্ট কর্তৃক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চার্টার প্রদত্ত হয়, সে সময় ভারতবর্ষীয়েরা কোম্পানির রাজ্যশাসন বিপক্ষে পার্লিয়ামেণ্টে আবেদন করেন, ঐ আবেদন পত্র তৎকর্ত্তৃক প্রস্তুত হয় উহা তাঁহার স্বহস্তলিখিত এবং ঐ প্রস্তাবে তাঁহার এত দূর গুণগরিমার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল যে, ইংলণ্ডীয় কর্তৃপক্ষেরা

মুক্তকণ্ঠে ঐ আবেদনের শত শত বার প্রশংসা করিয়াছিলেন,—তাহাতে ভারতবর্ষীয়েরা প্রার্থনাধিক ফল লাভ করেন; সেবারে এই নিয়মে পুনর্ব্বার চার্টার প্রদত্ত হইল যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কিঞ্চিৎ মাত্র দোষ দেখিলেই কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহাদের হস্ত হইতে ভারতবর্ষের শাসন-ভার গ্রহণ করিবেন।"

হরিশ্চন্দ্রের আইন-জ্ঞানও ছিল অসাধারণ। তাঁহার বন্ধু পরবর্তী-কালের হাইকোর্টের জজ শম্ভুনাথ পণ্ডিত এবিষয়ে তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করেন। যখন প্রসন্নকুমার ঠাকুর ভারতবর্ষীয় সভার সভ্যপদ ত্যাগ করেন তখন হরিশ্চন্দ্রই আইন-কানুন বিষয়ে উহার প্রধান পরামর্শদাতা হন। ভারতবর্ষীয় সভা তখন সমগ্র বাংলার, শুধু বাংলার কেন, সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনৈতিক কার্যাদি পরিচালনা করিতেছিলেন। এইসময়ে তিনি ইহার প্রায় প্রত্যেকটি কার্যে যুক্ত হইয়া পড়েন এবং নানা বিষয়ে পরামর্শাদি দিয়া স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে সভাকে সহায়তা করেন।

কিন্তু 'হিন্দু পেট্রিয়ট'কেই হরিশ্চন্দ্র স্বদেশসেবার প্রধানতম বাহন করিয়া লইয়াছিলেন। এই পত্রিকার জন্মকথা এবং তিনি কিরূপে ইহার সংস্রবে আসেন সেসম্বন্ধে এখানে কিছু বলা আবশ্যক। বড়বাজারে কালাকর স্ট্রীটে মধুসূদন রায়ের একটি ছাপাখানা ছিল। মধুসূদনের একখানি সংবাদপত্র বাহির করিবার বাসনা জন্মে। সিমলা চোরবাগানস্থ ঘোষ পরিবারের তিন ভ্রাতা—শ্রীনাথ ঘোষ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও ক্ষেত্রচন্দ্র ঘোষ—ইহার সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করিলে ১৮৫৩ সনের ৬ই জানুয়ারী প্রারম্ভিক আয়োজনাদির পর 'হিন্দু পেট্রিয়ট' প্রথম বাহির হইল। ঘোষ-ভ্রাতৃগণ হরিশ্চন্দ্রের গুণপনার কথা অবগত ছিলেন। তাঁহাদের অনুরোধে হরিশ্চন্দ্র 'পেট্রিয়টে' মধ্যে মধ্যে লিখিতেন এবং ইহার পরিচালনা বিষয়েও পরামর্শ দিতেন। পত্রিকাখানি প্রকাশের

তিন-চারি মাস পরে ঘোষ-ভ্রাতৃগণ ইহার সংস্রব ত্যাগ করিলেন। তখন ইহার সম্পাদনা-ভার হরিশ্চন্দ্রের উপর গিয়া বর্তে। মধুসূদন রায় ১৮৫৪ সনে নিজ ছাপাখানা বিক্রয় করিলে হরিশ্চন্দ্র 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ভবানীপুরে লইয়া আসেন, এবং প্রথম কিছুদিন অন্য প্রেসে ছাপাইয়া পরে নিজেই 'হিন্দু পেট্রিয়ট প্রেস' স্থাপন করেন। হরিশ্চন্দ্র সরকারী কর্মচারী, এইজন্য তাঁহার ভ্রাতা হারাণচন্দ্রকে স্বত্বাধিকারী করিয়া লইলেন।

হরিশ্চন্দ্র 'হিন্দু পেট্রিয়টের' একমাত্র কর্ণধার। তখন ইংরেজী শিক্ষা এদেশে তেমন প্রচলিত হয় নাই। ইহার গ্রাহকসংখ্যা সামান্যই ছিল। হরিশ্চন্দ্রকে প্রতি মাসে নিজ বেতনের একটি মোটা অংশ ইহার জন্য ব্যয় করিতে হইত। কিন্তু ইহার মারফত দেশসেবাই ছিল তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য। নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি, শক্তি-সামর্থ্য সমুদয়ই তিনি পত্রিকার উন্নতিকল্পে নিয়োজিত করিলেন। তাঁহার লেখনী তৎকালীন সমুদয় প্রগতিশীল আন্দোলনের সমর্থনে পরিচালিত হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের তিনি সমর্থক ছিলেন এবং তাঁহার কাগজে ইহার অনুকূলে প্রয়োজনীয় প্রচারকার্যও চালাইয়াছিলেন। শাসক-গোষ্ঠীর দুষ্কার্যেরও তিনি কঠোর সমালোচনা করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। লর্ড ডালহৌসী কর্তৃক রাজ্যের পর রাজ্য ইংরেজের খাসদখলে আনয়নের পরিণাম যে কি ভীষণ হইতে পারে সেসম্বন্ধে হরিশ্চন্দ্র 'পেট্রিয়টে' স্বীয় মত ব্যক্ত করিতেছিলেন। এই নীতির তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। পরে যখন এই সব দুর্নীতির ফলে সিপাহী বিদ্রোহ উপস্থিত হইল তখনও হরিশ্চন্দ্রের সতেজ লেখনী ইহা নিরাকরণের পন্থা বাতলাইতে লাগিল।

কলিকাতার ইংরেজেরা বিদ্রোহীদের অনাচারের কথা শুনিয়া একেবারে ক্ষেপিয়া গেল এবং কঠোর হস্তে ভারতবাসী তথা বাঙালীদের

দমন করিতে পরামর্শ দিতে আরম্ভ করিল। হিন্দুগণ, বিশেষতঃ বাঙালী হিন্দুরা অধিকতর শিক্ষালাভ করিয়া কি ব্যবসা-বাণিজ্যে, কি সরকারী কর্মে ইংরেজের সঙ্গে ভাগ বসাইতেছিল, আবার মফস্বলের ইংরেজেরা দরিদ্র প্রজাদের উপর যে-সব অত্যাচার উৎপীড়ন করিত তাহাও ইহারা প্রকাশ করিয়া দিতেছিল। এইসকল কারণে ইংরেজের বাঙালী-বিদ্বেষ পুরাপুরিই ছিল। বিদ্রোহের সুযোগে তাহারা উহা চরিতার্থ করিতে অগ্রসর হইল। নানারূপ দমনমূলক আইন-কানুন করিয়া বাঙালীদের জব্দ করিতেও সরকারকে তাহারা পরামর্শ দিতে লাগিল। সিপাহী বিদ্রোহ একজন সিপাহীর মাত্র বিদ্রোহ নয়, ইহা সমগ্র ভারতবাসীর বিদ্রোহ এই কথা বলিয়া কোনরূপ বাছ-বিচার না করিয়া ভারতবাসী মাত্রকেই কঠোর হস্তে দণ্ডিত করিতে সরকারী কর্মচারীদের উস্কাইতে আরম্ভ করিল। এইসময় হরিশ্চন্দ্র 'হিন্দু পেট্রিয়টে' ব্রিটিশ চক্রান্তকারীদের মতলব ফাঁস করিয়া দিতে অগ্রসর হইলেন। সেসময় বাঙালী সম্পাদিত ইংরেজী পত্রিকা খুব অল্পই ছিল। ইহাদের মধ্যে হরিশ্চন্দ্রই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এইকার্যে হস্তক্ষেপ করায় তৎক্ষণাৎ তিনি স্বজাতীয়দের প্রীতি-শ্রদ্ধা অর্জন করিলেন।

এখানে বলা আবশ্যক যে, হরিশ্চন্দ্র সিপাহী বিদ্রোহের সমর্থক ছিলেন না, এবং 'হিন্দু পেট্রিয়টে' বিদ্রোহীদের হঠকারিতার এবং অত্যাচার-অনাচারের যথোচিত নিন্দা করিয়াছিলেন। আর এ-কথাও ঠিক যে, মুসলমান কুশাসনের কথা ঐতিহ্যের মত তখনও সমাজে প্রচলিত থাকায় সিপাহী বিদ্রোহে অনেকেই তখন যোগ দিতে ভরসা পায় নাই। হরিশ্চন্দ্র এই বাস্তব ব্যাপারকে ভিত্তি করিয়া ব্রিটিশ চক্রান্তকারীদের শিক্ষিত ভারতবাসী তথা বাঙালী দমনের কল্পনাকে যুক্তি-প্রমাণ প্রয়োগে একেবারে ধূলিসাৎ করিয়া দিলেন। নিরপেক্ষ, নির্ভীক আলোচনার জন্য 'হিন্দু পেট্রিয়ট' তখন সরকারের নিকটও বিশেষ মান্য হইয়াছিল।

বড়লাট লর্ড ক্যানিং প্রতি সপ্তাহে কাগজখানি বাহির হইবামাত্র পাঠ করিতেন এইরূপ জনশ্রুতি। এইসময়কার সরকারী নীতি 'হিন্দু পেট্রিয়টের' মতামত দ্বারা বিশেষ প্রভাবান্বিত হইয়াছিল, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। বিদ্রোহীদের দমনে সরকারী সেনাদল যে অহেতুকী অত্যাচার শুরু করিয়া দিয়াছিল, 'পেট্রিয়টের' বিরুদ্ধ সমালোচনার ফলে তাহাও কতকাংশে ব্যাহত হইয়াছিল। স্থানীয় ইংরেজ সমাজ নিজেদের উদ্দেশ্য বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে দেখিয়া বড়লাটকে নানারূপে শাসাইতে লাগিল, তাহারা ব্যঙ্গ করিয়া তাঁহার নাম দিল 'Clemency Canning' বা 'দয়াময় ক্যানিং'। সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে সত্যকার আলোচনার সময় আসিয়াছে। ইদানীং কিছু কিছু হইতেছেও। এইসময় ইহার সত্যকার উদ্দেশ্য, ব্যর্থতার কারণ প্রভৃতির সঙ্গে হরিশ্চন্দ্রের কৃতিত্বের কথাও সকলের গোচরে আসিয়া থাকিবে নিশ্চয়।

হরিশ্চন্দ্রের এই সময়কার আর একটি স্মরণীয় কার্য নীলকরদের বিরুদ্ধে নীলচাষীদের পক্ষ সমর্থন। নীলচাষীরা হরিশ্চন্দ্রের উপর কতখানি নির্ভর করিত আরম্ভেই তাহা আমরা জানিতে পারিয়াছি। মধ্যবঙ্গের —যশোহর, নদীয়া, ফরিদপুর, পাবনা, রাজশাহী প্রভৃতি অঞ্চলে নিরীহ নীলচাষীদের উপর নীলকরদের অত্যাচার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হইয়া আছে। মফস্বলের ফৌজদারী বিচারালয় তাহাদের বিচারের অধিকারী ছিল না। কোনও কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে যদি বা তাহাদের বিচার হইত তাহা হইলেও গুরুতর জঘন্য অপরাধ করিয়াও অপরাধীর কয়েক শত টাকা মাত্র জরিমানা হইত, কিন্তু সেই অপরাধে অপরাধী বাঙালীদের হয়তো প্রাণদণ্ড বা যাবজ্জীবন বা দীর্ঘকাল কারাবাস হইয়া যাইত। বিচারে এতাদৃশ অনাচার অহরহ ঘটিত। মফস্বলে ইংরেজ পুঙ্গবেরা একেবারে নিরঙ্কুশ হইয়া চলাফেরা করিত। একেই তো ব্যবসায়ের স্বার্থ, তাহার উপর আইনের ব্যবহার-বৈষম্য উহাদিগকে একেবারে 'নবাব' করিয়া তুলে।

ইংরেজদের মেমেরা নিজেদের 'রানী ভিক্টোরিয়া' বলিয়া পরিচয় দিত বলিয়াও প্রসিদ্ধি আছে! ইহাদের অত্যাচারের কথা বিভিন্ন সময়ে সংবাদপত্রে বাহির হইলেও ১৮৪৯ সনে অক্ষয়কুমার দত্তই পরিষ্কারভাবে এসকল বিষয় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিলেন। ইহার পর হইতে সংবাদপত্রে নীলকরদের অত্যাচারের কথা মাঝে মাঝে প্রকাশিত হইতে থাকে। হরিশ্চন্দ্র 'হিন্দু পেট্রিয়টে' এ-বিষয়ক বিবরণ সযত্নে মুদ্রিত করিতেন।

ইংরজের স্বৈরাচারের কথা 'হিন্দু পেট্রিয়টে' যেরূপ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতে লাগিল এমনটি তখনকার কোনও পত্রিকায়ই বাহির হইত কিনা সন্দেহ। যশোহরে শিশিরকুমার ঘোষ, কৃষ্ণনগরে মনোমোহন ঘোষ, কুমারখালিতে হরিনাথ মজুমদার ও মথুরানাথ মৈত্রেয়, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি প্রেরিত নীলকরদের অত্যাচারের কথা হরিশ্চন্দ্র যথারীতি 'পেট্রিয়টে' প্রকাশ করিতেন এবং তাহার উপর টিপ্পনী ও মন্তব্যাদি লিখিতেন। এ-কারণে কলিকাতার ইংরেজ ব্যবসায়ী মহল এবং ইংরেজ পরিচালিত পত্রিকাসমূহ তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইল। কিন্তু ১৮৬০ সনে নিরীহ নীলচাষীরা যখন নীলকরদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল যে, জীবন যায় তাও স্বীকার তবু তাহারা নীল বুনিবে না এবং কলিকাতার 'হিন্দু পেট্রিয়ট' তাহা প্রকাশ করিয়া দিয়া ইহার ন্যায্যতার সপক্ষে মত প্রকাশ করিলেন তখন তাহাদের ক্রোধের সীমা রহিল না। ইহার ফল হরিশ্চন্দ্রের নিজের পক্ষে কি বিষময় হইয়াছিল একটু পরেই তাহা বলিতেছি। ইতিমধ্যে যখন নীলের হাঙ্গামা মধ্যবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ছড়াইয়া পড়িবার উপক্রম হইল তখন সরকার এই মর্মে এক সাময়িক আইন জারী করিলেন যে, চুক্তিবদ্ধ নীলচাষীরা নীল না বুনিলে ফৌজদারিতে দণ্ডনীয় হইবে। নীলকর-বন্ধু শ্বেতাঙ্গ হাকিমেরা বহু নীল-চাষীকে এই আইনের দোহাই দিয়া জেলে পুরিল, তাহাদের উপর

নানারূপ অত্যাচারও শুরু হইল। তখন নিরীহ নীলচাষীদের প্রতিনিধিরা কলিকাতায় অসিয়া চাষী-বন্ধু হরিশ্চন্দ্রের নিকট সাহায্য ও পরামর্শ চাহিতে লাগিল। হরিশ্চন্দ্র নীল-হাঙ্গামার সময় নীলচাষীদের কতপ্রকারে সাহায্য করিয়াছিলেন তাহার আভাস আমরা নীল কমিশনে প্রদত্ত তাঁহার সাক্ষ্য হইতেই জানিতে পারি। হরিশ্চন্দ্র কমিশনের প্রশ্নের উত্তরে যেসব কথা বলেন তাহার মর্ম এখানে প্রদত্ত হইল,—

হরিশ্চন্দ্র নীলচাষীদের কিরূপে সহায়তা করিতেন নীল কমিশনের সম্মুখে সাক্ষ্যপ্রদান কালে তাহা ব্যক্ত হয়। হরিশ্চন্দ্র বলেন যে, জমিদার প্রজা এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা তাঁহার নিকট হইতে কর্তব্য নির্ণয়ের জন্য উপদেশ লইতে আসিতেন। ১৮৬০ সালের ১১ আইন জারী হইবার পূর্বে প্রজারা কিসে নীল বপন না করিতে হয় তাহার উপদেশ চাহিত। ইহার পরে নীলকর ও কর্তৃপক্ষের জবরদস্তি ও অত্যাচার এড়াইবার পন্থা সম্বন্ধেও তাহার পরামর্শ গ্রহণ করে। এসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়া এবং দরখাস্ত প্রভৃতি লিখিয়া দিয়া তিনি প্রজাদের সাহায্য করিতেন। তাঁহার অনুরোধে মফস্বলের অনেকে 'হিন্দু পেট্রিয়টের' সংবাদদাতা হন। উক্ত আইনের অছিলা করিয়া রাজকর্মচারী ও নীলকরগণ ঘোর অত্যাচার-উৎপীড়ন করিতে থাকে। স্যাঁতসেতে, ছোট ও সঙ্কীর্ণ গুদামে অনেক লোক কয়েদ রাখা, বলপূর্বক সম্পত্তি লুণ্ঠন ও নীলকরের প্ররোচনায় পুলিস কর্তৃক প্রজাদিগের স্ত্রীলোকের উপর অনেক রকমের অত্যাচার উৎপীড়ন হইত। হরিশ্চন্দ্র শেষে এই মর্মে বলেন, "আমি নীল-হাঙ্গামার বিষয় বিশেষ যত্নসহকারে পর্যালোচনা করিয়াছি। ইহার ফলে আমার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, বর্তমান নীলচাষ রায়তদের পক্ষে সর্বপ্রকারেই অহিতকারী। আমি এ-সম্বন্ধে আমার অভিমত প্রকাশের সুযোগ পাইবামাত্রই ব্যক্ত করিয়াছি। একটি বিষয়ে আমার এখনও সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে নাই;

তাহা হইল এই যে, ভবিষ্যতে নীলকর ও নীলচাষীদের মধ্যে সম্পর্ক কিরূপ দাঁড়াইবে।”

শ্বেতাঙ্গ বণিক ও হাকিমের দৌরাত্ম্যে মফস্বলের উকীল মোক্তারগণ প্রজার পক্ষ অবলম্বন করিতে স্বভাবতঃই দ্বিধাবোধ করিত। যে-সব স্থলে মোটেই উকীল মোক্তার পাওয়া যাইত না সে-সব স্থলে হরিশ্চন্দ্র কলিকাতা হইতে ব্যবহারজীবী প্রেরণ করিতেন। নীলচাষীদের উপর যখন সরকারী পক্ষপাতমূলক আইন প্রযুক্ত হইতে লাগিল তখনও হরিশ্চন্দ্রকে ইহার প্রতিরোধকল্পে নানারূপ পরামর্শ দিতে হইত—আমরা জানিয়াছি। হরিশ্চন্দ্র বিশ্বাস করিতেন, নীলচাষ বর্তমানে যেভাবে চলিতেছে তাহাতে নীলকর ও নীলচাষীর মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার আশা নাই। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ইংরেজ পাদ্রীগণ এবং উচ্চপদস্থ কয়েকজন ইংরেজ নীলচাষীদের আনুকূল্য করিয়াছিলেন। পাদ্রী লঙ্ নীল-দর্পণের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করায় আদালতে অভিযুক্ত হইয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। নীল-কমিশনে প্রজা-বন্ধু হরিশ্চন্দ্রের ও অন্যান্য দায়িত্বসম্পন্ন লোকের সাক্ষ্য হইতে ইংরেজ নীলকরের জঘন্য অনাচার অত্যাচারের কথা প্রকাশ হইয়া পড়ায় জগৎসমক্ষে উহাদের মর্যাদার একেবারে অবলুপ্তি ঘটিল। অনেকে নীলচাষ ত্যাগ করিয়া অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করে। নীল-হাঙ্গামার সময় হরিশ্চন্দ্রের গৃহ অতিথিশালায় পরিণত হইয়াছিল। এই সময়ে ‘পেট্রিয়টের’ নিয়মিত খরচ চালাইয়া তাঁহার বেতনের যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিত তৎসমুদয়ই নীলচাষীদের সেবায় ব্যয়িত হইত।

হরিশ্চন্দ্র এইরূপ কঠোর কর্মতৎপরতার মধ্যে, কর্মজীবনের মধ্যাহ্ন-কালেই ১৮৬১ সনের ১৪ই জুন ইহধাম ত্যাগ করিলেন। অমানুষিক পরিশ্রম তাঁহার মৃত্যু ঘনাইয়া আনিয়াছিল। হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুতে বঙ্গবাসীর প্রাণে কে যেন বজ্র হানিল। তিনি জনসাধারণের চিত্ত কতখানি

অধিকার করিয়াছিলেন তাহা ঐ সময়ে অনুষ্ঠিত সভা-সমিতি এবং সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত মন্তব্যাদি হইতে সম্যক্ বুঝা যায়। হরিশ্চন্দ্রের এককালে সহকর্মী এবং 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ১৮৬১, জুন সংখ্যা 'মুখার্জিস ম্যাগাজিনে' তাঁহার সম্পর্কে একটী দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। মুখবন্ধে তিনি হরিশ্চন্দ্রের গুণপনার কথা এইরূপ উল্লেখ করেন,—

"A thunder-bolt has fallen upon native society. Hushed is every voice and fixed is every eye. The friend of the poor and the mentor of the rich, the spokesman, the patriot, the brave heart that defied danger and battled foremost in the strife of politics has been swept away like a vision from our aching eyes. In the prime of his youth and the full splendour of his intellect, while yet the Indigo ryot was bending before the sun and invoking blessings upon the head of his deliverer, and the country from one end to the other was ringing with jubilee, the stroke of death fell heavily upon the land and its pride and its ornament disappeared in a cloud of glory. Our loss is great. We were only just putting forth the buds and blossoms of a healthy existence. From the darkness of ages we were only faintly emerging into light, groping our way through a choking mass of prejudices and struggling fully though earnestly through obstruction and difficulty. We had only recently learnt the value of political liberty. The heads of our people had banded together for the noble work of representation—calm sustained and

irresistible representation. Hurish Chander Mookerjee was the soul of this movement. He supplied the spirit, the energy, the breadth of view and the raciness of logic which raised the British Indian Association to the position of a power in the state. He had established a dictatorship in the realm of thought to which the richest and the best did homage."

হরিশচন্দ্র সম্পর্কে 'সোমপ্রকাশে'র (১৭ই জুন, ১৮৬১) উক্তিও এখানে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি,—

"বঙ্গভূমি অনেক বুদ্ধিমান সন্তান প্রসব করেন। কিন্তু তাঁহার গর্ব্ব-সহজাত একটি আলস্য দোষ আছে। অনেকে সেই আলস্য দোষে আক্রান্ত হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, মাতৃকার্য্য করিয়া উঠিতে পারে না। হরিশবাবু বঙ্গভূমির সেই অকর্ম্মণ্য সন্তান দলের অন্তর্নিবিষ্ট ছিলেন না। তিনি বঙ্গভূমির অনেক কার্য্য করিয়াছেন। যে যে পথ অবলম্বন করিয়া শ্রীবৃদ্ধি বঙ্গভূমি প্রবেশ করিয়াছে, তাঁহার প্রণীত হিন্দু পেট্রিয়ট তাহার অন্যতম। তিনি হিন্দু পেট্রিয়ট প্রচার করিয়া হিন্দু জাতির বহুতর শ্রেয়ঃ সাধন করিয়া স্বপত্রের অন্বর্থতা সম্পাদন করিয়াছেন। হিন্দু জাতির অকারণ বৈরিগণ তাঁহার লেখনীর ভয়ে কম্পান্বিত হইত।...

"তিনি একাকী নীলপ্রধান প্রদেশের প্রজাগণকে রাক্ষস সদৃশ নৃশংস নীলকরদিগের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ করিয়াছেন, একথা বলিলে অত্যুক্তি বোধ হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এতদ্বিষয়ে তাঁহার এত উদ্যোগ, এত চেষ্টা ও এত পরিশ্রম ছিল যে, আমরা সেই অত্যুক্তিদোষ স্বীকারেও অসম্মত নহি। তিনি নীলকরদিগের গর্ব্ব চূর্ণ করিবার আদি কারণ সন্দেহ নাই।..."

কালীপ্রসন্ন সিংহের উক্তিও এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন,— "ভারতভূমি তাঁহার অকাল মৃত্যুতে যত অপার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন,

ত্রিংশৎ সালের ভয়ানক জলপ্লাবনে, বিগত বিদ্রোহে ও বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষে তত ক্ষতি স্বীকার করেন নাই। তিনি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহার যত উন্নতিসাধন করিয়াছেন, সতীদাহ নিবারণে রাজা রামমোহন রায়, বিধবাবিবাহ প্রচলনে বিদ্যাসাগরও তত উপকার সাধন করিতে পারেন নাই।"

একটু আগে বলিয়াছি, নীলকর-সমাজ তাঁহার উপর অতিশয় ক্রোধান্বিত ছিল। হরিশ্চন্দ্রের জীবিতকালেই এক নীলকর-সাহেব তাঁহার পত্রিকার বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্দমা আনয়ন করে। ইতিমধ্যে হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যু হইল। কিন্তু নীলকর-পুঙ্গব ছাড়িবার পাত্র নয়; সে মামলা চালাইবেই স্থির করিল। তখন হরিশ্চন্দ্রের বিধবা পত্নী অনন্যোপায় হইয়া কিছু অর্থের দ্বারা তাহার সঙ্গে রফা করিতে বাধ্য হন। হরিশ্চন্দ্র দরিদ্রের সন্তান ছিলেন, মৃত্যুকালে তিনি বিশেষ কিছুই রাখিয়া যান নাই। কিন্তু তাঁহার হৃদয় ছিল মহৎ। তাঁহার মহত্ত্বে আজ সমগ্র বাঙালী জাতি মহীয়ান হইয়া উঠিয়াছে।

রাজনারায়ণ বসু

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতস্থ ইউরোপীয় ও ভারতীয় সমাজের মধ্যে অন্ততঃ রাজনীতি এবং অর্থনীতি-ক্ষেত্রে বিচ্ছেদ দেখা দিতে থাকে। বেথুন সোসাইটি, ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি, ফেমিলি লিটারারি ক্লাব প্রভৃতি সভা-সমিতিতে উভয় সমাজের পণ্ডিতেরা মিলিত হইতেন বটে, কিন্তু উভয়ের মধ্যেকার স্বার্থগত বিরোধ ইহাতে কিছুমাত্র লাঘব হয় নাই। সিপাহী বিদ্রোহ এবং নীল-হাঙ্গামা-কালে ইহা পরিষ্কার হইয়া উঠে। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে ব্রিটিশ-রাজ ভারতবর্ষের শাসন-দণ্ড গ্রহণের পর হইতে সরকারী বেসরকারী নির্বিশেষে স্থানীয় শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় ক্রমশঃ একাত্ম হইয়া উঠিতে লাগিল। নীল-হাঙ্গামার সময় কোনও কোনও শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী এবং মিশনরী সম্প্রদায় নীলচাষীর কতকটা সহায়তা করিলেও ক্রমে তাহারাও উভয় সমাজের সংঘাতের ফলে স্বজাতির স্বার্থকেই বড় করিয়া দেখিতে আরম্ভ করিল।

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা তথা ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ভারতবাসীরা যতই আয়ত্ত করিতে থাকে তাহাদের মন ততই জড়তা ত্যাগ করিয়া সক্রিয় হইয়া উঠে। আমাদের মধ্যে তখন যে নবজাগরণ আসে বা আত্মচৈতন্য জাগ্রত হয় তাহা অনেকটা এই প্রতীচীর সংস্রবে আসার ফল, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই ইহা স্বীকার করিবেন। কিন্তু বৈদেশিক শিক্ষা ও শাসন-পদ্ধতির দরুন এই নবজাগরণ বস্তুগত হইয়া জাতিকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে পারে নাই। যে ইংরেজ তাচ্ছিল্যভরে শাসিতদের শাসনযন্ত্র হইতে প্রতিনিয়ত দূরে ঠেলিয়া রাখিতে সচেষ্ট, তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিরা তাহার আচার-আচরণ অনুকরণ করিয়া নিজেদেরই দৈন্য প্রকাশ করিতেছিল। ব্যর্থ অনুকরণের ফলে স্বাবলম্বন-শক্তি এবং আত্মপ্রত্যয়

দুই-ই লোপ পাইতে বসে। জাতির এই দুর্দিনে একজন মনস্বী বাঙালী স্বজাতীয়দের আত্মস্থ হইবার বাণী শুনাইলেন। তিনি শুধু আত্মস্থ হইবার কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন না, কি উপায়ে বা কোন পদ্ধতি অনুসরণ করিলে আমরা অবিলম্বে সুস্থ, সবল এবং স্বাবলম্বী হইতে পারিব তাহাও সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দিলেন। মনস্বী রাজনারায়ণ বসু হিন্দু কলেজের উৎকৃষ্ট ছাত্র, উচ্চশিক্ষিত, ইংরেজী সাহিত্যের ভিতর দিয়া পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাধুর্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন কিন্তু তিনি স্বভাবতঃই ছিলেন স্বদেশ ও স্বজাতিগত প্রাণ। তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন, "আমার ধাতু বরাবর বাঙ্গালীতর; আমার কলেজের শিক্ষা উহার উপর পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা জোর করিয়া আরোপ করিয়াছিল মাত্র, কলমের ন্যায় উহা আমার প্রকৃতির উপর গাঢ়রূপে বসে নাই।"* রাজনারায়ণ স্বজাতিদেরও নিজ প্রকৃতির অনুসরণ করিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

২

রাজনারায়ণ ১৮২৬ সনের ৭ই সেপ্টেম্বর চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত বোড়াল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতৃপুরুষের নিবাস ছিল কলিকাতার গড়গোবিন্দপুরে। এখানে ফোর্ট উইলিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইলে বসু-পরিবার বাহির-সিমলায় বাস করিতে থাকেন। সেখান হইতে রাজনারায়ণের প্রপিতামহ বোড়াল গ্রামে চলিয়া যান।

রাজনারায়ণের পিতা নন্দকিশোর বসু রামমোহন রায়ের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। নন্দকিশোর সেযুগের একজন ইংরেজীনবিস বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। তিনি বিভিন্ন স্থানে কর্ম করিয়া শেষে দেবোত্তর-

* রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিত, পৃঃ ৬৯।

ব্রহ্মোত্তর জমি বাজেয়াপ্ত করার জন্য স্থাপিত স্পেশাল কমিশন আপিসের হেড ক্লার্কের পদে নিযুক্ত হন। তিনি অতিশয় খাঁটি ও সৎলোক ছিলেন। দেবোত্তর-ব্রহ্মোত্তর জমি বাজেয়াপ্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্ত বহু লোকে তাঁহাকে উৎকোচ দিতে চাহিতেন, কিন্তু তিনি কখনও উৎকোচ গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার সঞ্চিত অর্থ কিছুই ছিল না। তাঁহার মৃত্যুকালে (১৮৪৫) উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু পাওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার কতকগুলি ঋণ পরিশোধের ভার রাজনারায়ণ প্রাপ্ত হন।

বোড়ালের পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর রাজনারায়ণকে তাঁহার পিতা কলিকাতায় লইয়া আসেন এবং বৌবাজারের একটি স্কুলে ইংরেজী শিখিবার জন্য ভর্তি করিয়া দেন। সেখান হইতে রাজনারায়ণ পটলডাঙ্গায় হেয়ার সাহেবের স্কুলে আসিয়া ভর্তি হইলেন। হেয়ার সাহেবের স্কুল প্রকৃতপক্ষে স্কুল-সোসাইটির স্কুল ছিল। হেয়ার ইহার পরিচালনে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন বলিয়া সাধারণে ইহাকে হেয়ার সাহেবের স্কুল বলিত। রাজনারায়ণ তের-চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত এখানে অধ্যয়ন করেন। দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা (পরবর্তীকালে ডাঃ) দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সময় হেয়ার স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দুর্গাচরণের শিক্ষাদান সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বলেন, "দুর্গাচরণের নিকট আমরা কত উপকৃত, তাহা বলিতে পারি না। তিনিই আমাদিগের মনে জ্ঞানের ইচ্ছা ও অনুসন্ধানের ইচ্ছার উদ্রেক করাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি আমাদিগের মনোমুকুলকে প্রথম প্রস্ফুটিত করেন।"*

পাঠে দ্রুত উন্নতিতে রাজনারায়ণের প্রতি হেয়ার সাহেব অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। হেয়ার তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং

* ঐ, পৃঃ ১৪।

বলিতেন, 'how fast you are growing' অর্থাৎ, কত শীঘ্র তুমি বাড়িতেছ! হেয়ার স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে রাজনারায়ণ *Club Magazine* নামে একখানি সংবাদপত্র প্রতি সোমবারে হাতে লিখিয়া বাহির করিতেন, ইহাতে সংবাদ, সম্পাদকীয় উক্তি, প্রেরিত পত্র প্রভৃতি সকলই থাকিত।

রাজনারায়ণ ১৮৪০ সনে হেয়ার সাহেবের স্কুল হইতে হিন্দু কলেজে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হইলেন। তিনি উৎকৃষ্ট ছাত্রদের অন্যতম ছিলেন। পরবর্তীকালের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি তাঁহার সহাধ্যায়ী হইলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, আনন্দকৃষ্ণ বসু, জগদীশনাথ রায়, গিরিশচন্দ্র দেব, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি ইঁহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিয়া রাজনারায়ণ ত্রিশ টাকা সিনিয়র বৃত্তি লাভ করেন। দুই বৎসর দ্বিতীয় ও প্রথম এই দুই শ্রেণীতে তিনি এই বৃত্তি ভোগ করেন। ইহার পর চল্লিশ টাকা মাসিক বৃত্তি লাভ করিয়া রাজনারায়ণ আরও দুই বৎসরকাল হিন্দু কলেজে অধ্যয়নে রত থাকেন। তখন কলেজের অধ্যয়ন শেষ করিয়া যাহাতে ছাত্রগণ আরও কিছুকাল কলেজে উচ্চতর বিদ্যা অর্জ্জন করিতে ব্যাপৃত থাকে তাহার জন্য এইরূপ বৃত্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। তখনকার দিনে কলেজের সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্রদিগের প্রদত্ত পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর সংবাদপত্রে প্রকাশিত করা হইত। দুই-একবার সাহিত্য, পুরাবৃত্ত ও ধর্মনীতিতে রাজনারায়ণ প্রদত্ত উত্তর সংবাদপত্রে ছাপা হয়। তিনি ধর্মনীতিতে একটি রৌপ্যপদক লাভ করেন।

হেয়ার সাহেবের স্কুলে দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিক্ষা রাজনারায়ণের মনে জ্ঞানার্জন-স্পৃহা জাগ্রত করিয়াছিল। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসনের শিক্ষাদান প্রণালীও তাঁহার হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করে। রিচার্ডসন সম্বন্ধে রাজনারায়ণ আত্ম-চরিতে (পৃ. ২১-২৩) লিখিয়াছেন,—

"আমাদিগের সময়ে কাপ্তেন রিচার্ডসন (Captain David Lester Richardson) কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। তাঁহার নিকটে আমি তিন বৎসর পড়ি। তাহার পর তিনি বিলাত যান।··· কাপ্তেন সাহেব ইংরাজি সাহিত্যশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। সেক্ষপিয়র তিনি যেমন পাঠ করিতেন ও বুঝাইতেন এমন আর কাহাকেও দেখি নাই। মেকলে সাহেব তাহার সেক্ষপিয়র আবৃত্তি শুনিয়া বলিয়াছিলেন, 'I can forget everything of India but your reading of Shakespeare.' তিনি আশ্চর্য্যরূপে সেক্ষপিয়র বুঝাইয়া দিতেন।···কাপ্তেন সাহেব ইয়ারগোছ লোক ছিলেন। যদি কেহ 'Amiss' শব্দকে 'এমিস' উচ্চারণ করিতেন তাহা হইলে তখনই বলিতেন 'you are a miss'। তিনি আমাদিগকে নাট্যালয়ে সর্ব্বদা যাইতে বলিতেন। তাঁহার বাটীতে দেখা করিতে গেলে তিনি বলিতেন, 'are you going to the theatre today?' তাঁহার এই বিশ্বাস ছিল যে কবিতা আবৃত্তি বিদ্যা শিখিবার প্রধান স্থল নাট্যালয়। তিনি নিজে তথায় গিয়া অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগকে আবৃত্তি শিক্ষা দিতেন, তাহারা সম্মানের সহিত তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিত।···তাঁহাকে স্মরণ হইলে কি পর্য্যন্ত ভক্তি ও প্রেম উচ্ছ্বসিত হয় তাহা বলিতে পারি না—তাঁহার স্বভাব বিশুদ্ধ ছিল না তথাপি হয়। তিনি যখন প্রথম বিলাত যান, তখন তাঁহাকে আমরা যে অভিনন্দনপত্র দিই, তাহা তাঁহার সম্মুখে পড়িতে তিনি আমাকেই মনোনীত করেন। আমি কলেজের সর্ব্বোত্তম আবৃত্তিকারী বলিয়া খ্যাতি লাভ করি।"

রাজনারায়ণ ১৮৪৫ সনের প্রথমে কলেজ পরিত্যাগ করেন। রাজনারায়ণ কলেজে অধ্যয়নকালেই ১৮৪৪ সনে কিশোরীচাঁদ মিত্রকে রামমোহন রায়ের জীবনী রচনায় সাহায্য করেন। এইসময় সুবিখ্যাত রামগোপাল ঘোষের সঙ্গে তদীয় 'লোটাস' নামক স্টীমারে রাজমহল ও

গৌড় ভ্রমণে যান। কলেজে অধ্যয়নকালে তাঁহার প্রথম বিবাহ হয়। প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হইলে রাজনারায়ণ ১৮৪৭ সনে দ্বিতীয় বার হাট-খোলায় দত্তবাটীতে দারপরিগ্রহ করেন।

৩

হিন্দু কলেজ পরিত্যাগের কিছুকাল পরে ১৮৪৬ সনের প্রারম্ভে রাজনারায়ণ প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বিলাতী ভাবাপন্ন সতীর্থগণ ইহাতে আশ্চর্য বোধ করিয়াছিলেন। রাজনারায়ণ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে ইহার পরে পরিচিত হন। ইহার পূর্বে তিনি দেবেন্দ্রনাথকে একপত্রে এইরূপ একখানি গ্রন্থসংকলনের কথা লিখিলেন, 'যাহার প্রথম ভাগে বেদের, দ্বিতীয় ভাগে ইতিহাস, পুরাণ ও তন্ত্রের বাছা বাছা শ্লোক সকল থাকিবে।' ইহার প্রায় চারি বৎসর পরে দেবেন্দ্রনাথ দুই খণ্ডে ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

রাজনারায়ণ ১৮৪৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' কর্তৃক উপনিষদের অনুবাদকের কার্যে মাসিক যাট টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'তত্ত্ববোধিনী সভার' প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন। ১৮৪৮ সনের প্রথমে কার ঠাকুর কোম্পানির পতনের ফলে দেবেন্দ্রনাথের আয় একেবারে কমিয়া যায়। সুতরাং তিনি আর আগের মত অর্থসাহায্য করিতে পারিলেন না। তখন রাজনারায়ণ উক্ত অনুবাদ-কার্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ইহার পর দেড় বৎসর তিনি বেকার ছিলেন। রাজনারায়ণ ইংরাজীনবিস বলিয়াই প্রত্যেকের ধারণা ছিল। ব্রাহ্মসমাজে প্রীতিভাবপূর্ণ বক্তৃতাদি দেওয়ার ফলে তিনি বাংলা ভাষায় ব্যুৎপন্ন—এ-বিশ্বাসও সকলের মনে বদ্ধমূল হইল। এই ধরনের বক্তৃতা তিনিই প্রথম ব্রাহ্মসমাজে প্রবর্তন করেন।

ভারতহিতৈষী ডেভিড হেয়ার ১৮৪২ সনের ১লা জুন দেহত্যাগ করেন। তদবধি প্রতিবৎসর ঐ-দিবসে হেয়ার-স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান হইত এবং বঙ্গের কোনও কোনও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ইহার সভাপতি হইতেন এবং কোনও কোনও সুবক্তা ইহাতে শিক্ষা, সাহিত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন। ১৮৪৮ সনের ১লা জুন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে যে সভানুষ্ঠান হয় তাহাতে প্রধান বক্তা ছিলেন রাজনারায়ণ। স্বদেশপ্রেমে রাজনারায়ণের হৃদয় ছিল ভরপূর। এইদিনকার বক্তৃতা ছিল বাংলা ভাষার অনুশীলন সম্পর্কে। রাজনারায়ণ বক্তৃতাদানকালে স্বদেশবাসীদের উদ্দেশ করিয়া প্রসঙ্গতঃ বলেন,—

"জন্মভূমির নাম উচ্চারণ করিলে কি অনির্ব্বচনীয় স্নেহ পাত্রসকল মনেতে উদিত হয়—প্রেমামৃত রসসাগরে চিত্ত প্লাবিত হয়। যে স্থানে আমরা শৈশবকালে স্নেহ মিশ্রিত যত্ন দ্বারা লালিত হইয়াছি, যে স্থানে বাল্য ক্রীড়া দ্বারা আহ্লাদের সহিত বাল্যকাল যাপন করিয়াছি, যে স্থানে যৌবনের প্রারম্ভাবধি সহযোগি মিত্রদিগের প্রীতি দ্বারা সতত আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছি, যে স্থানে আমাদিগের বয়োবৃদ্ধির সহিত সুহৃদ মণ্ডলীর সীমা বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং যে স্থানের প্রসাদে ধন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি, সম্পদ, যাহাকিছু সকলই আমাদিগের লব্ধ হইয়াছে, সে স্থানের প্রতি বিশেষ স্নেহ হওয়া কি স্বভাবসিদ্ধ নহে! স্বদেশ এ প্রকার প্রিয় পদার্থ যে তাহার নদী, পর্ব্বত, মৃত্তিকা পর্য্যন্ত আমাদিগের প্রণয় আকর্ষণ ও আহ্লাদ সঞ্চার করে। জন্মভূমির নাম দ্বারা সেই বস্তুর নাম উচ্চারণ করা হয় যাহার অপেক্ষা প্রিয়তর পদার্থ পৃথিবীতে আর নাই—যে নাম চিন্তা মাত্রে পিতা মাতা, ভ্রাতা, ভার্য্যা, পুত্র, কন্যা, সুহৃদ, বান্ধবের প্রেমার্দ্র আনন সকল মনেতে জাগ্রৎ হইয়া উঠে! যিনি প্রবাসী হইয়া দূর হইতে আপনার দেশ স্মরণ করিয়াছেন, তিনিই স্বদেশের মর্ম্ম জ্ঞাত হইয়াছেন, তিনিই জানেন যে জন্মভূমি মনুষ্যের দৃষ্টিতে কি রমণীয় বেশ ধারণ করে!

'কাশ্মীরের নির্ম্মল হ্রদ ও মনোহর উদ্যান, কিম্বা সিরাজের সুচারু গুলাব পুষ্পের উদ্যান' কিছুতেই তাঁহার চিত্তকে আকৃষ্ট রাখিতে সমর্থ হয় না। তিনি বালুময় মরুভূমিবাসী হইলেও সেই স্বদেশ সন্দর্শন পিপাসায় ব্যাকুল থাকেন। এমত সুখের আকর যে জন্মভূমি তাহার প্রতি যাহার প্রীতি না থাকে সে কি মনুষ্য? পূর্ব্বে আমারদিগের স্বজাতীয় লোকের এরূপ ব্যবহার কখনই ছিল না। অদ্যাবধি কাহার মুখে এই রমণীয় শ্লোকার্দ্ধ শ্রুত হয় না যে 'জননী-জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'? বীর্য্যবান গ্রীকজাতি ও জয় পিপাসু রোমান জাতির চরিত্র পাঠে আহ্লাদ সঞ্চার হয়, কিন্তু অমর কীর্ত্তি পাণ্ডুপুত্র ও যুদ্ধদুর্ম্মদ রাজপুতদিগের নামোচ্চারণ মাত্রে চিত্ত হর্ষোন্মত্ত হইয়া কি উৎসাহে উল্লম্ফন করিতে থাকে। সেক্ষপিয়ার স্তুতিযোগ্য এবং নিউটন অতি বরণীয় বটে, কিন্তু আমার-দিগের কালিদাস ও আমারদিগের আর্য্যভট্টের স্মরণে অন্তঃকরণ কি অপার প্রেমার্ণবে সন্তরণ করে! হোমর ও বর্জ্জিল অতি প্রসিদ্ধ মহাকবি, কিন্তু বিশাল মহাভারত ও হৃদয়রঞ্জন রামায়ণ এ সকল আমাদের! প্রাচীন গ্রীক ও লাটিন, এবং আধুনিক আরবী ও পারসীক ও ইংরাজী ও জার্ম্মাণ, অবনীর সকল ভাষা এক দিকে, আর অন্য দিকে সুচারু সুমধুর শব্দ রত্নাকর মহাভাষা সংস্কৃতকে পরিমাণ করিলে আমারদিগের সংস্কৃতই সকল অপেক্ষা গুরুতর হইবে। হিন্দু নাম অতি মনোরম শব্দ! হিন্দু হইয়া হিন্দু নাম লোপ করিবার বাসনা, ইহার পর যাতনার বিষয় আর কি আছে? জন্মভূমির হীন অবস্থা মোচনে যত্ন না করিয়া তাহার প্রতি অনাদর করা—জননীর জীর্ণ শরীর সুস্থ না করিয়া তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা করা, ইহার উপর হৃদয় বিদীর্ণকারী ব্যাপার আর কি আছে?" *

গত শতাব্দীর চতুর্থ দশকে খ্রীষ্টান মিশনরীগণ হিন্দুদের খ্রীষ্টান

* লেখক-প্রণীত রাজনারায়ণ বসু, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ। পৃঃ ২৪-৬।

করিতে লাগিয়া যায়। তাহাদের প্রতিষ্ঠিত অবৈতনিক বিত্যালয়গুলিই খ্রীষ্টানী শিক্ষার কেন্দ্র। ইহার প্রতিরোধকল্পে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অন্যান্য হিন্দু প্রধানগণের চেষ্টা-যত্নে 'হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়' ১৮৪৬ সনের ১লা মার্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজনারায়ণ যে ইহার বিশেষ সহায়ক ছিলেন তাহা বলাই বাহুল্য। তিনি কিছুকাল এই বিদ্যালয়ের ইন্‌সপেক্টর বা পরিদর্শক ছিলেন।

৪

ইহার পর রাজনারায়ণকে আমরা প্রকৃত শিক্ষাব্রতীরূপে দেখিতে পাই। তিনি ১৮৪৯ সনের ১২ই মে সত্তর টাকা বেতনে কলিকাতা গবর্নমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী বিভাগের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন। এখানে মাত্র দুই বৎসরকাল তিনি নিযুক্ত ছিলেন। এইসময়ের মধ্যে কলেজে ছাত্রদের ইংরেজী অধ্যাপনা ব্যতীত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সোমপ্রকাশ'-সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রমুখ সুধীবৃন্দকেও তিনি অল্পবিস্তর ইংরেজী পড়াইয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজ হইতে রাজনারায়ণ ১৮৫১ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে মেদিনীপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়া তথায় চলিয়া যান। এখানে তিনি একাদিক্রমে আঠার বৎসর শিক্ষকতা করিয়া ১৮৬৮ সনের ৩১শে ডিসেম্বর অবসর গ্রহণ করেন। শেষের দুই বৎসর শিরঃপীড়ার জন্য তিনি ছুটিতে কাটাইতে বাধ্য হন।

শুধু শিক্ষাব্রতী-জীবন নহে, রাজনারায়ণের স্বদেশের উন্নয়ন চিন্তাও তখন পূর্ণোদ্যমে শুরু হয়। শিক্ষাব্রতীরূপে তিনি অল্পকালের মধ্যেই স্কুলের ছাত্র, অধ্যক্ষ এবং ছাত্রদের অভিভাবক মহলে সুখ্যাতি অর্জন

করেন। তাঁহার অভিনব শিক্ষাপদ্ধতিতে ছাত্রবৃন্দ অতি শীঘ্র পাঠ্য বিষয় আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইত। প্রতি বৎসর উৎকৃষ্ট ছাত্রেরা সরকারী বৃত্তি লাভ করিত। ক্রমে শিক্ষাদান ব্যাপারে তাঁহার এত সুনাম হইতে লাগিল যে, নিকটবর্তী মিশনরীদের অবৈতনিক বিদ্যালয়ে ছাত্রগণ না গিয়া রাজনারায়ণের স্কুলেই আসিয়া ভিড় জমাইত। স্কুলের ছাত্রসংখ্যা এবং অর্থাগম দিন দিন বাড়িয়া চলিল। পাঠ্য পুস্তক ব্যতীত অন্যান্য জ্ঞানগর্ভ পুস্তক পাঠেও ছাত্রদের তিনি উৎসাহ দিতেন। স্কুলে তিনটি বিষয়ের তিনি সূচনা করেন, যথা—(১) বিতর্ক-সভা ; এখানে ছাত্র ও শিক্ষকগণ একযোগে সাহিত্যাদি আলোচনায় লিপ্ত হইতেন ; (২) পাঠ্য পুস্তক ব্যতীত অন্যান্য পুস্তক অধ্যয়ন ঃ প্রতি ছাত্রকে কোনও নির্দিষ্ট পুস্তক পাঠ করিতে দেওয়া হইত, এবং পুস্তকের বিষয়বস্তুর উপর পরীক্ষা লইয়া তাহাতে নম্বর দেওয়া হইত ; (৩) দরিদ্র ভাণ্ডার ঃ ছাত্র ও শিক্ষকগণের মিলিত চেষ্টায় একটি দরিদ্র ভাণ্ডার খোলা হয় এবং বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্ত লোকদের ইহা হইতে সাহায্য দেওয়া হইতে থাকে।

বিদ্যালয়-ভবনের সীমানার মধ্যেই রাজনারায়ণের শিক্ষাদান কার্য আবদ্ধ ছিল না। তিনি ছিলেন লোকশিক্ষক। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে তিনি নিয়ত যত্নবান ছিলেন। মেদিনীপুর পাবলিক লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান উদ্যোগী। প্রতিষ্ঠাবধি (১৮৫১) তিনি ইহার সম্পাদক ছিলেন। শ্রমজীবীদিগের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত একটি নাইট স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজনারায়ণ সম্পাদকরূপে ইহার সঙ্গেও যুক্ত হইলেন। তাঁহার যত্নে মেদিনীপুরে একটি ব্রাহ্মসমাজ এবং একটি ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়।

মেদিনীপুরে অবস্থানকালে রাজনারায়ণ বিবিধ জনহিতকর সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠায়ও অগ্রণী হইলেন। মিউচুয়াল ইমপ্রুভমেণ্ট সোসাইটি, জ্ঞানদায়িনী সভা, সুরাপান-নিবারণী সভা, জাতীয় গৌরব সম্পাদনী

বা গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা প্রভৃতি তাঁহারই আগ্রহাতিশয্যে স্থাপিত হইয়াছিল। মেদিনীপুরে স্থাপিত হইলেও ক্রমে এ-সকলের খবর দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং দেশের ও জাতির পক্ষে উহা সুফলপ্রসূ হয়। সুপ্রসিদ্ধ প্যারীচরণ সরকার শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের মধ্যে সুরাপানের প্রসার দেখিয়া ইহার স্রোত নিবারণকল্পে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় সুরাপান-নিবারণী সভা প্রতিষ্ঠা করেন। ইহারও তিন বৎসর পূর্বে রাজনারায়ণ কর্তৃক এইরূপ একটি সভা মেদিনীপুরে সংস্থাপিত হয়। রাজনারায়ণ এই সভা সম্পর্কে বলেন, "ঐ সভার অনুষ্ঠানপত্রে লেখা ছিল যে, পরিমিত মদ্যপান করা যেমন না বাঁধে একটী ছিদ্র রাখা। ঐ ছিদ্র ক্রমে ক্রমে বড় হইয়া সর্বনাশ সাধন করে। মেদিনীপুরে এই সুরাপান-নিবারণী সভার জন্য আমার যত পীড়ন হয় ব্রাহ্মধর্ম প্রচার জন্য তত হয় নাই।"*

রাজনারায়ণের জাতীয় গৌরব সম্পাদনী বা গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা ভারতবর্ষের জাতীয়তা আন্দোলন তথা স্বাধীনতা প্রচেষ্টার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই সভাতেই সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাজাত্যবোধের শিক্ষা ও প্রসার হইতে থাকে। রাজনারায়ণ বলেন, "জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভার সভ্যেরা 'good-night' না বলিয়া 'সুরজনী' বলিতেন। ১লা জানুয়ারী দিবসে পরস্পর অভিনন্দন না করিয়া ১লা বৈশাখে করিতেন; আর ইংরাজী বাঙ্গলা না মিশাইয়া কেবল বিশুদ্ধ বাঙ্গলাতে কথা কহিতে চেষ্টা করিতেন। যে একটী ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিত, তাহার এক পয়সা করিয়া জরিমানা হইত।" † এখানে সভার কার্যক্রম সম্পর্কে রাজনারায়ণ কয়েকটি

---

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, শ্রাবণ ১৮০৫ শক—"দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি।"

† আত্ম-চরিত, পৃঃ ৮৩।

দৃষ্টান্ত মাত্র দিয়াছেন। এই সভার কার্যবিবরণকে ভিত্তি করিয়া তিনি "Prospectus of a Society for the Promotion of National Feeling among the Educated Natives of Bengal" রচনা করেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে নবগোপাল মিত্র সম্পাদিত *National Paper*-এ ইহা মুদ্রিত হয়।* অনুষ্ঠানপত্রে তিনি 'National Promotion Society' নামে একটি সংঘ বা সভা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। স্বদেশী ব্যায়াম, সঙ্গীত, চিকিৎসাবিদ্যা, ইংরেজী শিক্ষারম্ভের পূর্বেই বালকবালিকাদের যথোপযুক্তরূপে মাতৃভাষা শিক্ষাদান, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার অনুশীলন, বাংলা শব্দ ব্যবহার দ্বারা কথোপকথনে ভাষার বিশুদ্ধতা সম্পাদন, বাংলা ভাষায় পরস্পরকে পত্র লেখা, বাঙালীর সভায় বাংলা ভাষায় বক্তৃতা প্রদান, সুরাপানাদি বিদেশীয় অনিষ্টকর প্রথা এদেশে যাহাতে প্রচলিত না হয় তাহার উপায় অবলম্বন, হিন্দুশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া সমাজ-সংস্কার কার্য সম্পাদন, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রমুখ স্বদেশীয় সুপ্রথাসকল রক্ষা, নমস্কার প্রণামাদি স্বদেশীয় শিষ্টাচার পালন, বিদেশীয় রীতিতে পরিচ্ছদ পরিধান ও আহার সম্পূর্ণ বর্জন, দেশীয় ভাষায় নাটকাদি অভিনয় প্রভৃতি এই সভার কার্য হইবে। বর্তমানে হয়তো ইহার কোনও কোনটি আমাদের নিকট অতিরিক্ত বা সামান্য বিষয় বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু ঐসময়ে ইংরেজের নিকট অবজ্ঞাত ও লাঞ্ছিত হইয়াও বিলাতীর মোহে আমরা যেমন আত্ম-মর্যাদাজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতেছিলাম তখন এসব বিষয়ের আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছিল। রাজনারায়ণের অনুষ্ঠানপত্রে দেশোন্নতি বা সমাজোন্নতিমূলক কোনও কিছুই বাদ পড়ে নাই। নবগোপাল

---

* এই অনুষ্ঠানপত্রখানি বর্তমান লেখক প্রণীত "জাতীয়তার নবমন্ত্র বা হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত" পুস্তকে (পৃঃ ১০২-১১৩) পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

মিত্র এই অনুষ্ঠানপত্রখানি পাঠ করিয়া সত্বর এইরূপ একটি ব্যাপক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে উদ্যোগী হন। অনুষ্ঠানপত্রখানি প্রকাশের এক বৎসরের মধ্যেই তিনি ইহার আদর্শে কলিকাতায় হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠা করিলেন। রাজনারায়ণ লিখিয়াছেন,—

"শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র মহোদয় আমার প্রণীত 'জাতীয় গোরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা'র অনুষ্ঠানপত্র পাঠ করাতে হিন্দু মেলার ভাব তাঁহার মনে প্রথম উদিত হয়। ইহা তিনি আমার নিকট স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। ঐ হিন্দু মেলা সংস্থাপনের পর উহার অধ্যক্ষতা করিবার জন্য মিত্র মহাশয় জাতীয় সভা সংস্থাপন করেন। উহা আমার প্রস্তাবিত জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভার আদর্শে গঠিত হয়।"*

অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমহেতু রাজনারায়ণের শিরঃপীড়া দেখা দেয়। তখন স্কুল হইতে দীর্ঘকাল ছুটি লইয়া উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণে বাহির হন। এইসময় ব্রাহ্মসমাজে নরপূজার আবির্ভাব হইলে রাজনারায়ণ তাহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। রাজনারায়ণ স্বাস্থ্যলাভের উদ্দেশ্যে কানপুরে অবস্থান করিতেছিলেন। আর মেদিনীপুরে ফিরিবেন না জানিয়া মেদিনীপুরবাসীরা কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ ১৮৬৯ সনের ২৯শে মার্চ সেখানে তাঁহার নিকট একখানি অভিনন্দনপত্র প্রেরণ করেন। বলাবাহুল্য, ইহাতে রাজনারায়ণের কৃতকর্মের ও গুণপনার বিশেষ উল্লেখ ছিল।

৫

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাজনারায়ণ কলিকাতায় বসবাস আরম্ভ করিলেন। ১৮৬৯ সনের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ১৮৭৯ সনের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই দশ বৎসরকাল তিনি কলিকাতায় অবস্থান

---

* আত্ম-চরিত, পৃঃ ২০৮।

করেন। স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজ পূর্বে 'কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ' নামে অভিহিত হইত। মেদিনীপুর হইতে রাজনারায়ণ ইহার সঙ্গে যথাসম্ভব যোগরক্ষা করিয়া চলিতেন; মধ্যে মধ্যে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার' জন্য লিখিতেন। কেশবচন্দ্র সেন ১৮৬৫ সনে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সংস্রব ত্যাগ করেন এবং ইহার কিছুকাল পরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিলে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' নাম ধারণ করে। কলিকাতায় বসতি স্থাপন করিবার পর রাজনারায়ণকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ উহার অধ্যক্ষ-সভায় গ্রহণ করেন। রাজনারায়ণ অতঃপর অধ্যক্ষ-সভায় সভাপতিরও কার্য করিতে থাকেন। ১৮৭৯ সনে দেওঘরে চলিয়া যাইবার পরেও তিনি আমরণ এইপদেই বৃত ছিলেন। রাজনারায়ণ তাঁহার যোগ্য সহকর্মীরূপে পাইলেন যুবক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের কার্যকালে মানুষ রাজনারায়ণের সঙ্গে পুরাপুরি পরিচিত হইবার সুযোগ পান। কিশোর রবীন্দ্রনাথও অবিলম্বে রাজনারায়ণের সংস্পর্শে আসিয়া পড়িলেন। কলিকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুর-পরিবারে যে স্বাদেশিকতার স্রোত এতদিন ফল্গুনদীর মত সাধারণের অগোচরেই বহিয়া আসিতেছিল, রাজনারায়ণের সংস্পর্শে এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথের কর্মপ্রচেষ্টায় তাহা সাধারণের গোচরীভূত হইয়া উঠিল। কিন্তু ইহার পূর্বে আর দুই-একটি বিষয় বলা আবশ্যক।

রাজনারায়ণ-কৃত অনুষ্ঠানপত্র হইতেই যে নবগোপাল মিত্র মহাশয় হিন্দু মেলা সংগঠনে অনুপ্রাণিত হন একটু আগে তাহা বলা হইয়াছে। হিন্দু মেলার প্রথম অধিবেশনেই তথায় পাঠের জন্য রাজনারায়ণের স্বগ্রাম বোড়াল নিবাসীদের রচিত ও তৎকর্তৃক সংশোধিত একটি জাতীয়ভাব-ব্যঞ্জক কবিতা প্রেরিত হইয়াছিল। রাজনারায়ণ কলিকাতায় বসতি স্থাপন করিয়া সাক্ষাৎভাবে ইহার সঙ্গে যুক্ত হইলেন। ব্রাহ্মসমাজের কার্যে নবগোপালও তাঁহার সহকর্মী ছিলেন। কাজেই তিনি যে অবিলম্বে

রাজনারায়ণকে হিন্দু মেলার মধ্যে টানিয়া লইবেন তাহা বলাই বাহুল্য। হিন্দু মেলার অধ্যক্ষ সভা 'National Society' বা জাতীয় সভা নামে পরিচিত ছিল। হিন্দু মেলা সাম্বৎসরিক উৎসব। ইহার পরিচালনা ব্যতীত জাতীয় সভা প্রতি মাসে জাতির উন্নতিকর জ্ঞান-বিজ্ঞানমূলক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা-বৈঠক আহ্বান করিতেন। সুধীগণ কর্তৃক ইহাতে নানাবিষয়ে বক্তৃতা প্রদত্ত এবং প্রবন্ধ পঠিত হইত। রাজনারায়ণ জাতীয় সভার মাসিক অধিবেশনে নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন ঃ—(১) বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, (২) হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা, (৩) সেকাল আর একাল। ইহার প্রত্যেকটিই বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা' শীর্ষক বক্তৃতায় সেসময়ে বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের, বিশেষতঃ খ্রীষ্টান ও প্রগতিশীল ব্রাহ্মদের মধ্যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা সভা করিয়া ইহার প্রতিবাদে মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ একজন নব্যশিক্ষিত ইংরেজীনবিসের মুখে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাখ্যা শুনিয়া একদিকে যেমন লজ্জায় অধোবদন হইল অন্যদিকে তেমনি আনন্দে ও আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। এই বক্তৃতাটি পুস্তকাকারে বাহির হইলে ইহার শেষ অংশ 'মিলে সবে ভারত সন্তান' কবিতাটি সহ উদ্ধৃত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' (চৈত্র ১২৭৯) লিখিয়াছিলেন,—

"রাজনারায়ণ বাবুর লেখনীর উপর পুষ্প চন্দন বৃষ্টি হউক! এই মহাগীত ভারতের সর্ব্বত্র গীত হউক। হিমালয় কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক! গঙ্গা যমুনা সিন্ধু নর্ম্মদা গোদাবরী তটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্ম্মরিত হউক! পূর্ব্ব পশ্চিম সাগরের গম্ভীর গর্জ্জনে মন্দ্রীভূত হউক! এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক!"

রাজনারায়ণ ১৮৭৫ সনে হিন্দু মেলার সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। এসম্বন্ধে তিনি 'আত্ম-চরিতে' (পৃঃ ২১৫) লিখিয়াছেন,—

"১৮৭৫ সালে যে মেলা হয় তাহার সভাপতির কার্য্য আমি সম্পাদন করি। ঐ মেলা কলিকাতার পার্সীর বাগান নামক বিখ্যাত উদ্যানে হইয়াছিল। এই মেলা উপলক্ষ্যে বরদাবাসী সুবিখ্যাত গায়ক মৌলাবক্সের গান হয়। এবং যশোহরের নড়াল নিবাসী জমিদার রাইচরণ রায় ব্যাঘ্র শিকারে নৈপুণ্য জন্য এক স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হয়েন। আমি সভাপতি স্বরূপে ঐ পদক তাঁহার গলায় পরাইয়া দিই। মৌলাবক্স তাঁহার সঙ্গীতে ক্ষমতা দেখাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।"

রাজনারায়ণের এই সময়কার আর একটি প্রধান কার্য যুবক-মনে স্বদেশপ্রেম উদ্দীপনে সহায়তা। ছাত্র-সভায় সুরেন্দ্রনাথ ম্যাট্‌সিনির স্বাধীনতা-প্রচেষ্টার বিষয় বক্তৃতা দিলেন। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ 'আর্য্যদর্শনে' ম্যাট্‌সিনি, গ্যারীবল্ডী, কাভুরের জীবনীপ্রসঙ্গে নব্য ইটালীর স্বাধীনতা আন্দোলনের আনুপূর্বিক বিবরণও লিপিবদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইটালীর কার্বোনারী নামক গুপ্ত সভার আদর্শে এখানেও সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হইল। বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় তাঁহার ইংরেজী আত্ম-জীবনীতে * ইহার বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাটির জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ যুবকগণ 'সঞ্জীবনী সভা' নামে একটি গুপ্ত সমিতি স্থাপন করিলেন। ইহার কার্যবিবরণী গুপ্ত ভাষায় লিখিত হইত। গুপ্ত ভাষায় সভার নাম দেওয়া হইয়াছিল 'হা ম্ চু পা মু হা ফ্!' বৃদ্ধ হইলেও রাজনারায়ণের মনটি ছিল তাজা, চিরতরুণ। তিনি এই সভার সভাপতি হইলেন। স্বদেশের সর্বপ্রকার উন্নতি সাধন —স্বদেশীয়দের জন্য একটি সাধারণ পোশাক প্রচলন, স্বদেশীয় তাঁতে বস্ত্র প্রস্তুত, দিয়াশলাইয়ের কল স্থাপন প্রভৃতি কর্মপ্রচেষ্টা এই সভার কর্তব্য মধ্যে গণ্য ছিল। ইহার কোনটিই তখন সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই।

---

*Memories of My Life and Times, 1932. Pp. 245-48

তথাপি ইহা তখন কিশোর ও যুবকদের প্রাণে যে কিরূপ গভীর রেখাপাত করিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত বিবরণ * হইতে তাহা আমাদের সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হয়। এইপ্রসঙ্গে রাজনারায়ণ সম্পর্কে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা এখানে উল্লিখিত হইল,—

"ছেলেবেলায় রাজনারায়ণ বাবুর সঙ্গে যখন আমাদের পরিচয় হইল তখন সকল দিক হইতে তাঁহাকে বুঝিবার শক্তি আমাদের ছিল না। তাঁহার মধ্যে নানা বৈপরীত্যের সমন্বয় ঘটিয়াছিল। তখনই তাঁহার চুল-দাড়ি প্রায় সম্পূর্ণ পাকিয়াছে কিন্তু আমাদের দলের মধ্যে বয়সে সকলের চেয়ে যে ব্যক্তি ছোটো তাঁর সঙ্গেও তাঁহার বয়সের কোন পার্থক্য ছিল না। তাঁহার বাহিরের প্রবীণতা শুভ্র মোড়কটির মতো হইয়া তাঁহার অন্তরের নবীনতাকে চিরদিন তাজা করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। এমনকি, প্রচুর পাণ্ডিত্যে তাঁহার কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই, তিনি একেবারেই সহজ মানুষটির মতই ছিলেন। জীবনের শেষ পর্যন্ত অজস্র হাস্যোচ্ছ্বাস কোন বাধাই মানিল না—না বয়সের গাম্ভীর্য, না অস্বাস্থ্য, না সংসারের দুঃখকষ্ট, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। কিছুতেই তাঁহার হাসির বেগকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। এক দিকে তিনি আপন জীবন এবং সংসারটিকে ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন, আর এক দিকে দেশের উন্নতি সাধন করিবার জন্য তিনি সর্বদাই কত রকম সাধ্য ও অসাধ্য প্ল্যান করিতেন তাহার আর অন্ত নাই। রিচার্ডসনের তিনি প্রিয় ছাত্র, ইংরেজী বিদ্যাতেই বাল্যকাল হইতে তিনি মানুষ কিন্তু তবু অনভ্যাসের সমস্ত বাধা ঠেলিয়া ফেলিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে পূর্ণ উৎসাহ ও শ্রদ্ধার বেগে তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন। এদিকে তিনি মাটির মানুষ কিন্তু তেজে তিনি পরিপূর্ণ ছিলেন। দেশের সমস্ত খর্বতা

---

*জীবনস্মৃতি—বিশ্বভারতী সংস্করণ। পৃঃ ৮৯-৯৩

দীনতা অপমানকে তিনি দগ্ধ করিয়া ফেলিতে চাহিতেন। তাঁহার দুই চক্ষু জ্বলিতে থাকিত, তাঁহার হৃদয় দীপ্ত হইয়া উঠিত, উৎসাহের সঙ্গে হাত নাড়িয়া আমাদের সঙ্গে মিলিয়া তিনি গান ধরিতেন—গলায় সুর লাগুক আর না লাগুক সে তিনি খেয়ালই করিতেন না—

এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন!

"এই ভগবদ্ভক্ত চিরবালকটির তেজঃপ্রদীপ্ত হাস্যমধুর জীবন, রোগে শোকে অপরিম্লান তাঁহার পবিত্র নবীনতা আমাদের দেশের স্মৃতি-ভাণ্ডারে সমাদরের সহিত রক্ষা করিবার সামগ্রী তাহাতে সন্দেহ নাই।"*

রাজনারায়ণের সর্বকর্মের মূল ছিল স্বাজাত্যবোধ বা স্বদেশপ্রেম। স্বদেশীয়দের মধ্যে যেখানেই ইহার পরিপন্থী কিছু দেখিতেন সকল শক্তি দিয়া তিনি তাহার বিরোধিতা করিতেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে তিনি কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মবিবাহ আইন আন্দোলনের যে বিরুদ্ধতা করেন তাহারও মূলে ছিল এই গভীর স্বাদেশিকতা। রাজনারায়ণ প্রগতিশীল ব্রাহ্মদের আচার-আচরণ কিরূপ হওয়া উচিত সে-সম্বন্ধে উপদেশ দিতে গিয়াও এই স্বাদেশিকতার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের প্রথম সম্পাদক শিবচন্দ্র দেবকে ১৮৭৮, ১৫ই জুন এক পত্রে লেখেন,—

"We should adopt a national form of divine worship, a national theistic text book and national ritual as far as all this could be done consistently with the dictates of conscience. We should renounce marked foreign customs and manners that we might have without much thought or reaction but in-

* জীবনস্মৃতি—বিশ্বভারতী সংস্করণ। পৃ. ৯২-৩।

nocently, adopted from Europeans but which are repugnant to the general feeling of the nation and by renouncing which we do not act against Brahmoism."

মনস্বী রাজনারায়ণের একমাত্র চিন্তা—কিরূপে যুবক-মনে স্বদেশপ্রেম বা স্বাজাত্যবোধ স্থায়ী করা যায়। তিনি ভারতবর্ষের সমগ্র হিন্দু জাতিকে এই স্বদেশপ্রেমের ভিত্তিতে মিলিত করিতে চাহিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের 'ন্যাশন্যাল কনফারেন্স' বা জাতীয় সম্মেলন (১৮৮৩ এবং ১৮৮৫) এবং 'ন্যাশন্যাল কংগ্রেস' (১৮৮৫) ব্যাপকতর উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহার মূলে যে রাজনারায়ণের চিন্তা কাজ করিয়াছিল তাহা আমরা নিম্নোদ্ধত অংশ হইতে বুঝিতে পারি। রাজনারায়ণ ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দেই লেখেন,—

"ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্যের মধ্যে স্বদেশের উপকার সাধন সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।'...ভারতবর্ষ আমাদিগের জন্মভূমি, ভারতবর্ষের উপকার সাধনে আমরা প্রাণপণে যত্ন করিব। মুসলমান ও ভারতবাসী অন্যান্য জাতির সঙ্গে আমরা রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ে যত দূর পারি যোগ দিব, কিন্তু কৃষক যেমন পরিমিত ভূমিখণ্ড কর্ষণ করে, সমস্ত দেশ কর্ষণ করে না, সেইরূপ হিন্দুসমাজই আমাদিগের কার্য্যের প্রধান ক্ষেত্র হইবে। প্রাচীন ভারতবর্ষ শরীর, মন, সমাজ, ধর্ম, রীতি, নীতি, শিল্প, বিজ্ঞান বিষয়ে যেরূপ উন্নত অবস্থায় অবস্থাপিত ছিল, পুনরায় সেই অবস্থা লাভ করিতে এমন কি, তদপেক্ষা উচ্চতর অবস্থা লাভ করিতে আমরা সমস্ত হিন্দু জাতিকে উত্তেজিত করিব। যাহাতে ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির আদি পুরুষ বৈবস্বত মনু হইতে রাজপুতনার বীরকুলচূড়ামণি প্রতাপ সিংহের সময় পর্য্যন্ত ভারতের মহিমার প্রধান কথা অবলম্বন করিয়া হিন্দু জাতি উন্নতির মধ্যে ক্রমে

ক্রমে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়, আমরা প্রাণপণে এইরূপ চেষ্টা করিব। যাহাতে হিন্দুগণ ভ্রাতৃভাবে সম্বদ্ধ হয়, যাহাতে বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী, রাজপুত, মহারাষ্ট্রীয়, মাদ্রাজী প্রভৃতি হিন্দুবর্গ সমবেত হয়, যাহাতে তাহাদের সকল প্রকার স্বাধীনতা লাভ জন্য ধর্ম্মসঙ্গত বৈধ সমবেত চেষ্টা হয়, তাহাতে আমরা প্রাণপণে যত্ন করিব।" *

রাজনারায়ণের চিন্তা ক্রমে হিন্দুজাতির সংগঠনমূলক একটি ব্যাপক পরিকল্পনার আকারে লিপিবদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হয়, ইহা আমরা একটু পরেই দেখিতে পাইব। রাজনারায়ণ রাজনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি নানা বিষয়েই সংঘবদ্ধ সমবেত চেষ্টার পক্ষপাতী ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভবনে ১৮৭৪ সনের ১৮ই এপ্রিল সাহিত্যালোচনার জন্য 'বিদ্বজ্জন-সমাগম' হয়। রাজনারায়ণ ইহার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। পর বৎসর ১লা জানুয়ারী 'College Reunion' নামে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ও অন্যান্য কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের একটি সম্মেলন হইল। রাজনারায়ণ এখানে 'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত' শীর্ষক একটি তথ্যমূলক প্রবন্ধ পাঠ করেন। আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতির চেষ্টায় কলিকাতায় ১৮৭৬ সনের ২৬শে জুলাই ভারতবাসীদের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনার উদ্দেশ্যে 'Indian Association' বা ভারত-সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার অধ্যক্ষ-সভায়ও রাজনারায়ণকে দেখিতে পাই। রাজনারায়ণ যে দশ বৎসর কলিকাতায় অবস্থান করেন, তাহার মধ্যে এখানে যতরকম দেশহিতকর প্রতিষ্ঠান ছিল তাহার প্রায় প্রত্যেকটির সঙ্গেই তাঁহার সংযোগ স্থাপিত হয়। তিনি চিন্তাবীর তো বটেনই, উপরন্তু সাধ্যমত নানারূপ কর্মপ্রচেষ্টায়ও যোগ দিতে ইতস্ততঃ করেন নাই।

---

*তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন ১৮০৩ শক।

৬

রাজনারায়ণ ১২৮৬ বঙ্গাব্দের ২০শে আশ্বিন দেওঘর গমন করেন। অতঃপর মৃত্যুকাল (১৮৯৯ খৃঃ) পর্যন্ত তিনি এইখানেই অবস্থান করিয়াছিলেন। দেওঘর-বৈদ্যনাথধাম প্রাচীনপন্থী হিন্দুদিগের তীর্থক্ষেত্র। মনস্বী রাজনারায়ণের অবস্থিতিকালে দেওঘর নব্যপন্থীদেরও তীর্থক্ষেত্র হইল। তিনি চিন্তাশীল ও কর্মী যুবকদের একটি প্রধান আকর্ষণীয় বস্তু ছিলেন। কোনও নূতন বিষয়ের চিন্তা বা অবতারণা করিতে হইলে সৎপরামর্শের জন্য যুবকগণ দেওঘরে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে যান। রাজনারায়ণ ছিলেন তাঁহাদের নিকট স্বদেশপ্রেমের নিখুঁত প্রতীক।

দেওঘরে অবস্থানকালে রাজনারায়ণ দেওঘরের উন্নতিমূলক কার্যসমূহের সঙ্গে বার্ধক্য সত্ত্বেও যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহার মননশক্তি কিন্তু বরাবর অক্ষুণ্ণ এবং সক্রিয়ই ছিল। দেওঘরে বসতিস্থাপনের স্বল্পকাল পরেই তিনি ভারতবর্ষের সমগ্র হিন্দু জাতির কল্যাণকর একটি সভার বিষয় চিন্তা করিয়া তৎসম্বন্ধে পরিকল্পনা রচনা করিতে তৎপর হইলেন। প্রথমে ইংরেজীতে লিখিত হইলেও, ইহার বঙ্গানুবাদ 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' নামে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ইহার তিন বৎসর পরে মূল ইংরেজী *Old Man's Hope* মুদ্রিত হইল। 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' মূল ইংরেজী ও বাংলায় প্রকাশিত হইলে হিন্দু সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে বেশ একটি সাড়া পড়িয়া যায়। রাজনারায়ণ ইহার ভূমিকায় লেখেন যে, মুসলমানদের যেমন National Mohommedan Association, ইংরেজদিগের যেমন Anglo-Indian Defence Association এবং ফিরিঙ্গীদের যেমন Eurasian and Anglo-Indian Association নামক এক একটি

জাতীয় সভা, তেমনি হিন্দুদিগেরও একটি সভা থাকা আবশ্যক। তিনি অতঃপর সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ লেখেন—

"হিন্দুদিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধ, স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা করা, হিন্দুদিগের জাতীয় ভাব উদ্দীপন করা এবং সাধারণতঃ হিন্দুদিগের উন্নতি সাধন করা সভার উদ্দেশ্য হইবে।…কেবল ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় দুঃখ নিবারণ জন্য এরূপ সমিতি সংস্থাপন করা যে আবশ্যক হইতেছে এমত নহে। দেববাণী সংস্কৃতের চর্চ্চা ভারতবর্ষে একপ্রকার লোপ পাইয়াছে বলিলেই হয়। সরস্বতী দেবী এক্ষণে গঙ্গাতীর পরিত্যাগ করিয়া রাইন নদীর উপকূলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমাদিগের যুবকদিগের ক্রমশঃ শারীরিক অবনতি হইতেছে। আমাদিগের বিদ্যালয় সকলে ধর্ম্ম শিক্ষা না থাকা প্রযুক্ত যুবকদিগের নৈতিক অবনতি হইতেছে। তজ্জন্য এখনকার লোকেরা ক্রমশঃ সংশয়বাদী, স্বার্থপর ও ইউরোপীয় বিলাসানুরাগী হইতেছে। আমাদিগের দেশের লোকে ক্রমশঃ পানাসক্ত হইতেছে। ভারতবর্ষে দিন দিন দরিদ্রতার বৃদ্ধি হইতেছে। এমনকি গবর্ণমেণ্ট সম্প্রদায়ের একজন* নিজমুখে স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে পঁচিশ কোটী লোকের মধ্যে পাঁচ কোটী অর্দ্ধাশনে দিন যাপন করে। আমাদিগের অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল—এমন কি সামান্য দেশালাইটি পর্য্যন্ত বিলাত হইতে আমদানি করিতে হয়।…হে হিন্দু মহোদয়গণ! আপনারা এই দারুণ দুরবস্থার প্রতিকারের জন্য কি কোন চেষ্টা করিবেন না? আপনারা কি আলস্যে নিদ্রায় চিরকাল যাপন করিবেন? পুরাকালে পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে হিন্দু জাতির যে অগ্রণী পদ ছিল সেই অগ্রণী পদে পুনঃ স্থাপিত করিতে কি আপনারা সচেষ্ট হইবেন না!…গবর্ণমেণ্টের উপরে এত নির্ভর করেন কেন! আপনারা কি এমন প্রত্যাশা করেন যে, যে অন্ন আপনারা ভক্ষণ করেন, তাহা গবর্ণমেণ্ট আপনাদিগের মুখে তুলিয়া দিবেন?

* Sir W. W. Hunter.

তাঁহারা বিদেশীয় লোক। আপনারা কি প্রত্যাশা করেন, তাঁহারা তাঁহাদিগের নিজের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল আপনাদিগেরই উপকার করিতে থাকিবেন? এমন নিষ্কাম ধর্ম্ম তাঁহাদিগের নিকট হইতে কখনই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না।"

রাজনারায়ণ 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা'য় একটি নিখিল-ভারতীয় মহা হিন্দু সমিতি স্থাপনের প্রস্তাব করেন। প্রত্যেক প্রদেশে নগরে ও গ্রামে ইহার শাখা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইবে। হিন্দুর ইতিহাস, ঐতিহ্য, কীর্তি সম্বন্ধে হিন্দু সন্তানদের পরিচিত করাইয়া তাহারা যে পুনরায় উন্নত ও শ্রেষ্ঠ হইতে পারে সেদিকে আত্মপ্রত্যয় জন্মাইতে হইবে। মহা হিন্দু সমিতির একটি জাতীয় ধ্বজা বা পতাকা থাকিবে, তাহাতে 'ঈশ্বর ও মাতৃভূমি' এই বাক্য অঙ্কিত থাকিবে। কোনও প্রসিদ্ধ স্থলে সমিতির বার্ষিক অধিবেশন হইবে এবং তাহাতে হিন্দুদিগের ধর্ম, শরীর, মন, নীতি, রাজনীতি, কৃষি এবং শিল্প সম্বন্ধীয় প্রস্তাব গৃহীত হইবে। সমিতিতে কি ধরনের জাতীয় ঐক্যবোধক বক্তৃতা হইবে তাহার নমুনাও রাজনারায়ণ পুস্তিকাখানিতে দিয়াছেন। সভাপতির বক্তৃতার পর ঋগ্বেদ হইতে যে শ্লোকটি পঠিত হইবে তাহার বঙ্গানুবাদ এই—"একত্রে গমন কর, একত্রে কথা কহ, তোমাদিগের মন এক বলিয়া জান। তোমাদিগের মন এক হউক, তোমাদিগের হৃদয় এক হউক, তোমাদিগের চেষ্টা এক হউক, তাহা হইলে মঙ্গল তোমাদের অনুগামী হইবে।"

জাতীয় ঐক্যসাধনের জন্য রাজনারায়ণ সমগ্র ভারতবর্ষে একভাষা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অনুভব করিলেন। তিনি প্রস্তাব করিলেন, মহা হিন্দু সমিতির যাবতীয় কার্য একই ভাষায় লিখিত হইবে। ইদানীং ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা কি হইবে তাহা লইয়া নানারূপ আলোচনা ও বিতর্ক চলিতেছে। রাজনারায়ণ সত্তর বৎসর পূর্বে ইহার এইরূপ সমাধান করিয়া গিয়াছেন,—

"মহা হিন্দু সমিতির সভ্যেরা যাহাতে ভারতবর্ষের সকল স্থানের সভ্যগণ হিন্দি ভাষা ও দেবনাগর অক্ষর অবলম্বন করিয়া পরস্পর পত্র লিখেন ও আলাপ করেন, সর্ব্বতোভাবে তাহার চেষ্টা করিবেন। ঐরূপ আলাপের জন্য বিদেশীয় অর্থাৎ ইংরাজী ভাষার সাহায্য লওয়া স্বদেশ-প্রেমী হিন্দুদিগের পক্ষে লজ্জার বিষয়। বঙ্গদেশে ও মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানে যেখানকার প্রচলিত ভাষা হিন্দি নহে, তথাকার সভ্যদিগের উক্ত কার্য সাধন জন্য হিন্দি শেখা কর্ত্তব্য। যে পর্য্যন্ত না তাঁহারা হিন্দি শেখেন ইংরাজী ভাষা অগত্যা উক্ত আলাপের উপায় হইবে। ভারতবর্ষের কোন বিশেষ দেশে সংস্থিত ভিন্ন ভিন্ন শাখা সমিতির সভ্যেরা পরস্পরকে অবশ্যই সেই দেশের প্রচলিত ভাষাতে পত্রাদি লিখিবেন। স্বদেশপ্রেমী ও মাতৃভাষানুরাগী ব্যক্তিদিগের ইহাই করা কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষের প্রত্যেক দেশের লোকসংখ্যার সঙ্গে তুলনা করিলে সেই দেশের অতি অল্পলোকেই ইংরাজী জানে, অতএব সেই সেই দেশের প্রচলিত ভাষাতেই সভার কার্য সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। কেবল ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকের মধ্যে আলাপ অথবা তাহাদিগকে পত্র লিখিবার সময় হিন্দি (অগত্যা ইংরাজী) ব্যবহৃত হইবে।"

হিন্দুমাত্রেই মহা হিন্দু সমিতির অন্তর্ভুক্ত। কোনও কারণেই কাহাকেও বর্জন করা হইবে না। রাজনারায়ণ ভূমিকায় লেখেন, "আমাদিগের সকলেরই এই কথা হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, **আমরা যতই লইব ততই বাঁচিব আর যতই ছাঁটিব ততই মরিব।**"

'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' বাংলা ও ইংরেজীতে প্রকাশিত হইলে ইংরেজী ও বাংলা পত্রিকায় ইহার সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হয়। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (কার্ত্তিক ১৮০৮ শক) অন্যান্য কথার মধ্যে লিখিলেন, "এই ঘোর বিপ্লবের সময় সভাসমিতি বা যে কোন উপায়েই হউক যিনি এই হিন্দু জাতির বিনাশোন্মুখ ধর্ম্মরীতি রক্ষার সূচনা করিবেন তিনি বাস্তবিক

এদেশের পরম বন্ধু। অনেকের ধারণা ইংরাজী শিক্ষা দেশের উপকার অপকার দুই করিতেছে। আমরাও ইহা অস্বীকার করি না। কিন্তু এই বৃদ্ধ হিন্দুর ন্যায় যিনি ইংরাজী শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষা পাইয়া স্বদেশানুরাগের এইরূপ উচ্চ আশা হৃদয়ে ধারণ করেন আমরা তাঁহাকে রত্নের ন্যায় মস্তকে ধারণ করিতে প্রস্তুত আছি।" *The Old Man's Hope* বাহির হইলে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' ১৮৮৯ সনের ৪ঠা আগস্ট লিখিলেন, "Patriotism of the highest type pervades every syllable of old man's thought and utterances."

রাজনারায়ণ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব হইতেই ভারতবাসীদের, বিশেষ করিয়া ভারতবাসী হিন্দুদের এক মহাসম্মেলনে মিলিত হইয়া শিক্ষা, রাজনীতি, কৃষি, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ চেষ্টা করিতে উদ্বুদ্ধ করিতে থাকেন। মহা হিন্দু সমিতির প্রস্তাবের মধ্যে জাতি-সংগঠনমূলক একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনারই পরিচয় আমরা পাই। ভারতবাসী ধর্মপ্রবণ বলিয়া ধর্মকেই ইহার মূল ভিত্তি করা হয় বটে, তথাপি জাতীয় জীবনের যাবতীয় সমস্যাই ইহার আলোচনার বিষয়ীভূত হইল। রাজনারায়ণের দূরদৃষ্টি এবং চিন্তার প্রসারতা ও গভীরতা শুধু তাঁহার সমসাময়িকদের নিকট নহে, এতদিন পরে আমাদের নিকটেও বিস্ময়ের বস্তু বলিয়া বোধ হয়। মনস্বী রাজনারায়ণের হিন্দু মেলার পরিকল্পনা ও মহা হিন্দু সমিতির প্রস্তাব জাতীয় স্বাধীনতা প্রচেষ্টার ইতিহাসে এক-একটি উজ্জ্বল অধ্যায়। রাজনারায়ণ ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার রচনা একদিকে যেমন স্বদেশ-প্রেমে প্রদীপ্ত অন্যদিকে তেমনি প্রসাদগুণবিশিষ্ট। সাহিত্যক্ষেত্রে ইহার স্থান অতি উচ্চে।

রাজনারায়ণ দেওঘরে অবস্থিতিকালেই ১৮৯৯ সনের ১৮ই সেপ্টেম্বর ইহলীলা সংবরণ করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজনারায়ণের মধ্যে বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। মৃত্যুর পর রাজনারায়ণ সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ মাত্র উদ্ধৃত করিয়া এ নিবন্ধ শেষ করিব,—

"যখনই আমরা তাঁহার নিকট শীতল হইতে গিয়াছি তখন আমরা তাঁহার প্রসন্ন বদনে স্বর্গীয় হাস্য দেখিয়াছি—অথচ তিনি রোগশয্যায় পড়িয়া আছেন এবং তাঁহার চারিদিকে শোকের বায়ু বহিতেছে। তাঁহার রোগাক্রান্ত শরীরের আড়াল হইতে কি যে এক অমূল্য স্বর্গীয় প্রেমময় জ্যোতির্ম্ময় বস্তু নিরন্তর প্রতিভাসিত হইত তাহা সহস্র চেষ্টা করিয়াও লেখনী দ্বারা ব্যক্ত হইবার নহে। যিনি দুই মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার সৎসঙ্গের আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন তিনি আজীবন তাহাতে মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছেন···। অতএব নবপ্রয়াত মহাত্মার আশ্চর্য্য অমায়িক অকৃত্রিম হৃদয়ের গুণসকল প্রকাশ করিয়া বলিবার চেষ্টায় ক্ষান্ত থাকা ভিন্ন আর গত্যন্তর দেখিতেছি না। তাঁহার ঘরাও ভাবের অগণন গুণ—প্রবীণ বাল্যতা সরসতা মাধুর্য্য শীলসৌজন্য প্রভৃতি অশেষ গুণ বর্ণনা করিতে যাওয়া লেখনীর কেবল পণ্ডশ্রমই সার।"*

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কার্ত্তিক ১৮২১ শক।

নবগোপাল মিত্র

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রসঙ্গে মনস্বী এমার্সনের একটি কথার উল্লেখ করিয়াছি। নবগোপাল মিত্র সম্বন্ধেও উহা পুরাপুরি খাটে। গত শতাব্দীর শেষার্ধে শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, সামাজিক আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি বিষয়ে জাতীয় ভাবোদ্দীপক প্রচেষ্টার যে সূচনা হয় এবং যাহার ফলে সকল বিষয়েই আমরা আজ এতখানি স্বাজাত্যবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়াছি তাহার মূলে ছিলেন কর্মবীর নবগোপাল মিত্র। তিনি নীরবে কর্ম করিয়া আবার নীরবেই চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কর্মফল বাঙালী তথা ভারতবাসী পুরামাত্রায় ভোগ করিয়া ধন্য হইতেছে। তাঁহার কার্যাবলী জাতির এত নিজস্ব এবং জাতীয় জীবনের সঙ্গে এতখানি ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া আছে যে, ইহার গোড়াকার কর্ণধারকে আর আমাদের স্মরণেই আসে না। তবু তাঁহার কীর্তি অমর অজেয়। কয়েক বৎসর পূর্বে একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক অন্য একটি প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, হাওড়া-সেতু নির্মাণ অবধি লক্ষ লক্ষ লোক ইহার উপর দিয়া গমনাগমন করিতেছে, তাহারা একবার মনেও করে না ইহার নির্মাতা কে ; ইহা আমাদের নিকট এত স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। নবগোপাল মিত্র সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই বলিতে ইচ্ছা হয়।

আমরা পূর্ব-অধ্যায়ে নবগোপাল সম্বন্ধে একাধিকবার উল্লেখ পাইয়াছি। মনস্বী রাজনারায়ণের চিন্তা ও ভাবধারণা নবগোপাল হিন্দু মেলা ও জাতীয় সভার মধ্যে রূপদান করেন। তাঁহার কুলজী সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু জানা নাই। গত শতাব্দীর শেষার্ধে তিনি দেশহিতকর নানাকর্মে ব্যাপৃত ছিলেন। এত অল্পদিনের মধ্যেই আমরা

তাঁহার কথা ভুলিয়া গিয়াছি। এক হিসাবে ইহা দুঃখেরও বটে, আবার সুখেরও বটে। দুঃখের এইজন্য বলিতেছি যে, আমরা আমাদের কর্মবীর ও চিন্তাবীরদের প্রতি নিজ কর্তব্য পালন করি নাই। অপর পক্ষে ইহা সুখের এইজন্য যে, হাওড়া-সেতুর মতই তাঁহার কর্ম জনসমাজে পরিব্যাপ্ত হইয়া ইহাকে সেইভাবে অনুপ্রাণিত করিতেছে। সামাজিকতার মূল উদ্গাতাকে খোঁজ না করিলেও উন্নতির গতি অবরুদ্ধ হইবে না।

নবগোপাল সম্বন্ধে যতটুকু জানা যায়, তিনি কোন্নগরের মিত্র-পরিবারভুক্ত ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা তারিণীচরণ মিত্র তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া স্বদেশসেবায়—হিন্দু মেলার উৎকর্ষ সাধনে আত্মনিয়োগ করেন। নবগোপালের তিন কন্যা ছিলেন। পুস্তকে তাঁহার যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহা তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যার কনিষ্ঠ পুত্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত। দুঃখের বিষয়, তাঁহারা নবগোপাল সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই অবগত নহেন।

নবগোপাল হিন্দু স্কুলের পাঠ সমাপন করিয়া কিছুদিন আইন পড়িয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। কারণ তিনি মোক্তার ছিলেন, অমৃতলাল বসু এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাটিতে তাঁহার গতায়াত ছিল। তিনি ক্রমে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ-গণেন্দ্রনাথ প্রমুখ তাঁহার পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণের সহিত পরিচিত হইলেন। যুবক নবগোপালের চালচলনে দেবেন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহার কর্মশক্তিতেও দেবেন্দ্রনাথের নিশ্চয়ই আস্থা জন্মিয়াছিল। কেশবচন্দ্র সেনের মত প্রভাবশালী ব্রাহ্মনেতা দলবলসহ যখন কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যান তখন নবগোপাল প্রমুখ যুবকগণ আসিয়া দেবেন্দ্রনাথের সহায় হইলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—"যখন কেশববাবু তাঁহার দলবল সহ আদি ব্রাহ্মসমাজকে ত্যাগ করিলেন, তখন নবগোপালবাবু প্রমুখ কয়েকজন প্রখ্যাত এবং অকৃত্রিম জনহিতৈষী

নবগোপাল মিত্র

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রসঙ্গে মনস্বী এমার্সনের একটি কথার উল্লেখ করিয়াছি। নবগোপাল মিত্র সম্বন্ধেও উহা পুরাপুরি খাটে। গত শতাব্দীর শেষার্ধে শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, সামাজিক আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি বিষয়ে জাতীয় ভাবোদ্দীপক প্রচেষ্টার যে সূচনা হয় এবং যাহার ফলে সকল বিষয়েই আমরা আজ এতখানি স্বাজাত্যবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়াছি তাহার মূলে ছিলেন কর্মবীর নবগোপাল মিত্র। তিনি নীরবে কর্ম করিয়া আবার নীরবেই চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কর্মফল বাঙালী তথা ভারতবাসী পুরামাত্রায় ভোগ করিয়া ধন্য হইতেছে। তাঁহার কার্যাবলী জাতির এত নিজস্ব এবং জাতীয় জীবনের সঙ্গে এতখানি ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া আছে যে, ইহার গোড়াকার কর্ণধারকে আর আমাদের স্মরণেই আসে না। তবু তাঁহার কীর্তি অমর অজেয়। কয়েক বৎসর পূর্বে একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক অন্য একটি প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, হাওড়া-সেতু নির্মাণ অবধি লক্ষ লক্ষ লোক ইহার উপর দিয়া গমনাগমন করিতেছে, তাহারা একবার মনেও করে না ইহার নির্মাতা কে; ইহা আমাদের নিকট এত স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। নবগোপাল মিত্র সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই বলিতে ইচ্ছা হয়।

আমরা পূর্ব-অধ্যায়ে নবগোপাল সম্বন্ধে একাধিকবার উল্লেখ পাইয়াছি। মনস্বী রাজনারায়ণের চিন্তা ও ভাবধারণা নবগোপাল হিন্দু মেলা ও জাতীয় সভার মধ্যে রূপদান করেন। তাঁহার কুলজী সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু জানা নাই। গত শতাব্দীর শেষার্ধে তিনি দেশহিতকর নানাকর্মে ব্যাপৃত ছিলেন। এত অল্পদিনের মধ্যেই আমরা

তাঁহার কথা ভুলিয়া গিয়াছি। এক হিসাবে ইহা দুঃখেরও বটে, আবার সুখেরও বটে। দুঃখের এইজন্য বলিতেছি যে, আমরা আমাদের কর্মবীর ও চিন্তাবীরদের প্রতি নিজ কর্তব্য পালন করি নাই। অপর পক্ষে ইহা সুখের এইজন্য যে, হাওড়া-সেতুর মতই তাঁহার কর্ম জনসমাজে পরিব্যাপ্ত হইয়া ইহাকে সেইভাবে অনুপ্রাণিত করিতেছে। সামাজিকতার মূল উদ্গাতাকে খোঁজ না করিলেও উন্নতির গতি অবরুদ্ধ হইবে না।

নবগোপাল সম্বন্ধে যতটুকু জানা যায়, তিনি কোন্নগরের মিত্র-পরিবারভুক্ত ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা তারিণীচরণ মিত্র তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া স্বদেশসেবায়—হিন্দু মেলার উৎকর্ষ সাধনে আত্মনিয়োগ করেন। নবগোপালের তিন কন্যা ছিলেন। পুস্তকে তাঁহার যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহা তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যার কনিষ্ঠ পুত্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত। দুঃখের বিষয়, তাঁহারা নবগোপাল সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই অবগত নহেন।

নবগোপাল হিন্দু স্কুলের পাঠ সমাপন করিয়া কিছুদিন আইন পড়িয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। কারণ তিনি মোক্তার ছিলেন, অমৃতলাল বসু এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাটিতে তাঁহার গতায়াত ছিল। তিনি ক্রমে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ-গণেন্দ্রনাথ প্রমুখ তাঁহার পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণের সহিত পরিচিত হইলেন। যুবক নবগোপালের চালচলনে দেবেন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহার কর্মশক্তিতেও দেবেন্দ্রনাথের নিশ্চয়ই আস্থা জন্মিয়াছিল। কেশবচন্দ্র সেনের মত প্রভাবশালী ব্রাহ্মনেতা দলবলসহ যখন কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যান তখন নবগোপাল প্রমুখ যুবকগণ আসিয়া দেবেন্দ্রনাথের সহায় হইলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—"যখন কেশববাবু তাঁহার দলবল সহ আদি ব্রাহ্মসমাজকে ত্যাগ করিলেন, তখন নবগোপালবাবু প্রমুখ কয়েকজন প্রখ্যাত এবং অকৃত্রিম জনহিতৈষী

সহৃদয় লোকনেতা আসিয়া ব্রাহ্মসমাজের পতাকাতলে দাঁড়াইয়া, সংবাদ-পত্রাদিতে লিখিয়া ও মৌখিক বক্তৃতা দিয়া, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আদি সমাজের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। স্বদেশীভাব প্রচার করিবার জন্য পিতৃদেবের অর্থ সাহায্যে National Paper নামক একখানি সাপ্তাহিক বাহির হইল।"*

দেবেন্দ্রনাথের অর্থ সাহায্যে ইতিপূর্বে ১৮৬১, ১লা আগস্ট পাক্ষিক রূপে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কেশবচন্দ্র ইহার বৈষয়িক সম্পাদক ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইবার কালে তিনি ইহা সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। তখন মূল ব্রাহ্মসমাজের (পরে আদি ব্রাহ্ম-সমাজ নামে পরিচিত) আদর্শ ও উদ্দেশ্যের কথা প্রচারের জন্য একখানি ইংরেজী মুখপত্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। ইহারই ফল এই 'ন্যাশন্যাল পেপার'। এই কাগজখানি সাপ্তাহিক আকারে ১৮৬৫, ৭ই আগস্ট নবগোপালের সম্পাদনায় বাহির হইল। দেবেন্দ্রনাথ আজীবন স্বাদেশিকতার পরিপোষক ছিলেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারে ইহা বরাবর অক্ষুণ্ণ ছিল। কেশবচন্দ্র সেন যখন খ্রীষ্টধর্মের মাহাত্ম্য, বিদেশীয় ভাব, ব্রাহ্মবিবাহ আইন, প্রভৃতি সম্বন্ধে হয় স্বয়ং প্রচারে লিপ্ত হইলেন নতুবা দলীয় লোকেরা প্রচারকার্য চালাইতে লাগিলেন তখন আদি ব্রাহ্মসমাজ তথা দেবেন্দ্রনাথ-পরিবারের স্বাদেশিক মনোবৃত্তি অধিকতর সক্রিয় হইয়া উঠিল। 'ন্যাশন্যাল পেপারে' জাতীয়ভাব প্রচার করা তো হইতই, ইহা ছাড়াও অন্যভাবে তাঁহারা বিশেষভাবে সহায়তা করিতে আরম্ভ করেন। রাজনারায়ণ বসুর অনুষ্ঠানপত্র হইতে একটি জাতীয় সভা ও একটি জাতায় সম্মেলনের ভাব লইয়া যখন হিন্দু

* জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ১৩১।

মেলা স্থাপনে নবগোপাল উদ্যোগী হইলেন, তখন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবার তাঁহার সাহায্যার্থে অগ্রসর হন। দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখ ব্যক্তিগণের স্মৃতি-রচনা হইতে ইহা আমরা জানিতে পারি। আধুনিক কোনও কোনও লেখক মহর্ষির পরিবারের গুণ-পণার কথা, বিশেষতঃ হিন্দু মেলায় তাঁহাদের যোগাযোগের বিষয় লিখিতে গিয়া নবগোপালের কৃতিত্ব সম্বন্ধে বর্ণনায় যেন কতকটা কার্পণ্য প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু একথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে, সুদক্ষ ইঞ্জিনীয়ারের কৃতি যেমন হাওড়া-সেতু নির্মাণের মূলে, হিন্দু মেলার মূলেও তেমনি নবগোপালের কর্ম নৈপুণ্য বিদ্যমান।

হিন্দু মেলা নবগোপালের জীবনের প্রধান কীর্তি। কিন্তু এবিষয়ে বলিবার পূর্বে দেবেন্দ্রনাথের আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁহার যোগা-যোগের কথা কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। আদি ব্রাহ্মসমাজের ইংরেজী মুখপত্র 'ন্যাশন্যাল পেপারে'র সম্পাদক হিসাবে নবগোপাল ইহার মাধ্যমে জাতীয় ভাবমূলক উদ্দেশ্য ও প্রচারকার্য চালাইতেন বলিয়াছি। ১৮৬৭ সনে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ করাইবার জন্য আন্দোলন উপস্থিত করেন এবং পাঁচ বৎসর পরে ১৮৭২ সনের তিন আইন 'ব্রাহ্ম' নাম বাদ দিয়া 'Civil Marriage Act' নামে বিধিবদ্ধ হয়। আদি ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধ আন্দোলনের ফলেই সরকার উক্ত আইনের নাম হইতে 'ব্রাহ্ম' কথাটি বাদ দিতে বাধ্য হন। এই আন্দোলনে নবগোপাল মিত্র অগ্রণী ছিলেন। ব্রাহ্মগণও 'হিন্দু'—আদি ব্রাহ্মসমাজ এই মত পোষণ করিতেন। প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ জামাতা সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় এবং নবগোপাল মিত্র সিমলায় গিয়া আইনসচিব স্টিফেনের হস্তে একখানি স্মারকলিপি প্রদান করিয়াছিলেন। ইহাতে যে বিশেষ ফলোদয় হয় তাহা একটু পূর্বেই বলিয়াছি। রাজনারায়ণ বসু আত্ম-চরিতে (পৃঃ ১১৫) এইবিষয় বর্ণনাকালে বিশেষ করিয়া

নবগোপাল সম্বন্ধে লেখেন, "নবগোপাল মিত্র বঙ্গদেশের Father of Physical Education, অর্থাৎ যুবকদিগের ব্যায়াম-চর্চ্চার প্রথম প্রবর্তক বলিয়া বিখ্যাত। [ইনি ব্রাহ্ম বিবাহ আন্দোলনের সময়ে আমাদিগের বিশেষ পরামর্শদাতা ছিলেন। লোকটি অতিশয় বুদ্ধিমান।]" আদি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে কোনরূপ প্রচারকার্য চালাইবার ব্যবস্থা ছিল না। রাজনারায়ণ লিখিয়াছেন, তিনি এই অভাব পূরণের জন্য 'ব্রাহ্মধর্মবোধিনী সভা' নামে একটি স্বতন্ত্র সভা স্থাপন করেন। নবগোপাল মিত্র এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার সম্পাদক-পদে বৃত হন। এই সভার অধীন একটি ব্রাহ্ম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতি মাসের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ রবিবারে এখানে ধর্ম বিষয়ে উপদেশ দানের ব্যবস্থা ছিল। ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে স্বাদেশিকতামূলক অন্যান্য কার্যেও নবগোপালের যোগাযোগ ছিল। তিনি 'সঞ্জীবনী সভা'র সঙ্গে যোগ দেন।

নবগোপালের প্রধান কীর্তি হিন্দু বা জাতীয় মেলা সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত বিশেষ কিছুই বলা হয় নাই। উপরে রাজনারায়ণ বসু মহাশয় নবগোপালকে 'Father of Physical Education' বা যুবকদিগের মধ্যে ব্যায়াম চর্চার প্রথম প্রবর্তক বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। বস্তুতঃ হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠার পূর্ব হইতেই তিনি যে যুবকদের ব্যায়াম-চর্চার আয়োজন করিতেছিলেন তাহার প্রমাণ আছে। তিনি এই উদ্দেশ্যে পরে পুস্তিকাদিও লিখিয়াছিলেন। হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্যায়াম-চর্চাকেও মেলার কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন। হিন্দু মেলা ১৮৬৭ সনের ১২ই এপ্রিল চৈত্র-সংক্রান্তিতে বেলগাছিয়ার ডন্‌কিন্‌ সাহেবের বাগানবাড়িতে সর্ব-প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। সেবার আয়োজন অতি সামান্যই ছিল। দ্বিতীয় বৎসর হইতে সাড়ম্বরে ইহা অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। জাতীয়

শিক্ষা, জাতীয় সাহিত্য, জাতীয় কারু ও চারু শিল্প, কৃষি, মল্লবিদ্যা, ব্যায়াম-চর্চা প্রভৃতির উৎকর্ষ সাধন এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ও লোকের মধ্যে ঐক্যস্থাপন উদ্দেশ্যেই এই মেলা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এককথায় সর্ববিষয়ে জাতিকে আত্মনির্ভর গুণ শিক্ষা দেওয়াই ছিল ইহার মূল লক্ষ্য। মেলার বিভিন্ন বিভাগের কার্য সুপরিচালনার জন্য ছয়টি সাব-কমিটি গঠিত হয়। দেবেন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর হইলেন ইহার সম্পাদক। নবগোপাল মিত্র সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিলেন। হিন্দু মেলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছিলেন এখানে তাহা উল্লেখযোগ্য,—

"এই মেলার প্রথম উদ্দেশ্য, বৎসরের শেষে হিন্দু জাতিকে একত্রিত করা। এইরূপ একত্র হওয়ার ফল যদ্যপি আপাততঃ কিছু দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, কিন্তু আমাদের পরস্পরের মিলিত ও একত্র হওয়া যে কত আবশ্যক ও তাহা যে আমাদের পক্ষে কত উপকারী তাহা বোধ হয় কাহারও অগোচর নাই। একদিন কোন এক সাধারণ স্থানে একত্রে দেখাশুনা হওয়াতে অনেক সৎ কর্ম্ম সাধন, উৎসাহ বৃদ্ধি ও স্বদেশের অনুরাগ প্রস্ফুটিত হইতে পারে। যত লোকের জনতা হয় ততই ইহা হিন্দু মেলা ও ইহা হিন্দুদিগের জনতা এই মনে হইয়া হৃদয় আনন্দিত ও স্বদেশনুরাগ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্ম্ম কর্ম্মের জন্য নহে, কোন বিষয় সুখের জন্য নহে, কোন আমোদ-প্রমোদের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য, ইহা ভারতভূমির জন্য।

"ইহার আর একটি মহৎ উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্য আত্মনির্ভর। এই আত্মনির্ভর ইংরেজ জাতির একটি প্রধান গুণ ; এই গুণের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আপনার চেষ্টায় মহৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া এবং তাহা সফল করাকেই আত্মনির্ভর কহে। ভারতবর্ষের এই একটি প্রধান অভাব, আমাদের সকল কর্ম্মেই আমরা রাজপুরুষগণের সাহায্য যাচ্ঞা করি, ইহা

কি সাধারণ লজ্জার বিষয়? কেন আমরা কি মানুষ নহি? মানবজন্ম গ্রহণ করিয়া চিরকাল পরের সাহায্যের উপর নির্ভর করা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি আছে? অতএব যাহাতে এই আত্মনির্ভর ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়—ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয়, তাহা এই মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।"

হিন্দু মেলায় জাতীয়তামূলক সঙ্গীত গীত ও প্রবন্ধ পঠিত হইত। সংস্কৃতেরও উৎসাহ দেওয়া হইত। সংস্কৃত ও বাংলায় উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ-লেখক পুরস্কার পাইতেন। প্রদর্শনী মেলার একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। চারু ও কারু শিল্প, বিশেষতঃ মহিলাদের তৈরী সেলাইয়ের কাজ, কৃষি-দ্রব্য, চরখা, তাঁত ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি প্রদর্শিত হইবার জন্য বিভিন্ন স্থান হইতে আনয়নের ব্যবস্থা ছিল। মল্লযুদ্ধ, শারীরিক কসরৎ, ব্যায়ামানুশীলন এবং ইহার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও মেলার দ্রষ্টব্য বিষয় ছিল। বাঙালীজাতি, বিশেষতঃ যুবকেরা ইহার দিকে কতখানি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ মনীষিগণের বিবরণ হইতে তাহা আমরা জানিতে পারি। শিবনাথ শাস্ত্রী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিপিনচন্দ্র পাল, ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতা ক্যাপটেন জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি হিন্দু মেলায় বিভিন্ন সময়ে যোগদান করিয়া ইহার আদর্শে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। নবগোপাল হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠার পরে 'ন্যাশনাল সোসাইটি' বা সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভা মেলার বাৎসরিক উৎসব পরিচালনা করিতেন। বৎসরের মধ্যে প্রতি মাসে ইহার উদ্দেশ্যের পরিপূরকরূপে বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে এখানে বক্তৃতা ও আলোচনার ব্যবস্থা ছিল। বলা বাহুল্য, নবগোপাল মিত্রই ছিলেন ইহার মূলে। ব্যায়াম ও অন্যান্য বিষয়াদি অনুশীলনের জন্য এতদিন মেলার আনুকূল্যে যে বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চলিয়াছিল, তাহাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া নবগোপাল ১৮৭২ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৩নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে

একটি 'ন্যাশন্যাল স্কুল' বা জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত, ইঞ্জিনীয়ারিং, সার্ভেয়িং, রসায়নবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, ব্যায়াম, অশ্বারোহণ, বন্দুক-চালনা প্রভৃতি এখানকার শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। তখনও অস্ত্র-আইন পাস হয় নাই। কাজেই বন্দুক-চালনা শিক্ষা বেআইনী বলিয়া গণ্য হইত না। হিন্দু মেলার কর্মক্ষেত্র ক্রমশঃ প্রসারিত হইল। বাংলার বিভিন্ন স্থানে ইহার শাখাস্বরূপ মেলা প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে নবগোপাল স্বয়ং হিন্দু মেলার সম্পাদক হইলেন। নবগোপাল যে তাঁহার সমুদয় শক্তি হিন্দু মেলার উন্নতিকল্পে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন—সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় এবং ঐ সময়কার লেখকদের স্মৃতিকথায় তাহা সুব্যক্ত। 'মধ্যস্থ'-সম্পাদক প্রসিদ্ধ নাট্যকার মনোমোহন বসু হিন্দু মেলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকিয়া ইহার উন্নতিমূলক কার্যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনিও নবগোপাল সম্বন্ধে বহু প্রশংসাসূচক উক্তি করিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতে দুইটি মাত্র উক্তি এখানে উল্লেখ করিব। মনোমোহন বলেন,—

"সমাজের যতদূর বিশৃঙ্খলা ঘটিবার তাহা ঘটিয়াছে। এই দুরবস্থা চাক্ষুষ করিয়া কোন্ চিন্তাশীল হিন্দু স্থির থাকিতে পারে? কোন্ সুশিক্ষিত স্বদেশবৎসল মন প্রতিবিধানে অগ্রসর না হইয়া স্বীয় ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উত্তেজনা ও ধিক্কারে বধির থাকিতে পারে? যে সকল মহাশয়গণের এরূপ উন্নত মন—যে সকল হিন্দুকুলোদ্ভব মহাত্মাগণ এইরূপ চিন্তাশীল, তাঁহারাই এই 'চৈত্র মেলা' নামা হিন্দু সমাজ বন্ধনের অদ্বিতীয় উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে সিমুলিয়া বাসী গুণরাশি, নির্মৎসর, অধ্যবসায়ী শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল মিত্র মহাশয় সর্ব্বাগ্রগণ্য। যে সকল গুণদ্বারা বহুজন সাধ্য বৃহৎকাণ্ডের আবিষ্কর্ত্তা ও নিয়ন্তা হওয়া সম্ভব, তাঁহাতে সে সমস্ত গুণ সর্ব্বতোভাবে বিদ্যমান আছে। সেই মহৎ গুণাবলীর শৃঙ্খলে অন্যান্য স্বদেশহিতৈষী মহাশয়েরা আবদ্ধ রহিয়া মধু-

মক্ষিকার ন্যায় অল্পে অল্পে ক্রমে ক্রমে স্বদেশের সৌভাগ্য মধুচক্র একখানি রচিত করিয়া তুলিতেছেন। অতএব তাঁহারা হিন্দুমাত্রেরই কৃতজ্ঞতা ভাজন।”

হিন্দু মেলার অষ্টম অধিবেশনের আশাতীত সাফল্য দেখিয়া মনোমোহন ‘মধ্যস্থ’ পত্রিকায় (ফাল্গুন ১২৮০) লেখেন,—

“এতদিনে আমাদিগের প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের অবিচলিত ও অধ্যবসায় তরুকে ফলোন্মুখ দেখা যাইতেছে। শুভক্ষণে বঙ্গদেশ এই মহাত্মাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন। আমাদের এই উক্তিকে কোনো কোনো পক্ষীয় কোনো কোনো লোক অতিরিক্ত প্রতিষ্ঠাবাদ রূপে গণ্য করিতে পারেন। কিন্তু আমরা সর্ব্ব দিক বিবেচনা, এরূপ বিষয়ের সকল কথা স্মরণ এবং অন্যান্য দেশহিতৈষীগণের সহিত ইঁহার কার্য্যের তুলনা না করিয়া একথা বলি নাই। আমরা বহুবৎসরাবধি তাঁহার প্রকৃতি ও কার্য্যাদি পর্য্যালোচকের দৃষ্টিতে দেখিয়া ও পরীক্ষা করিয়া আসিতেছি— মধ্যস্থ প্রচারের বহু পূর্ব্ব হইতেই আমরা তদ্দর্শক আছি। তাঁহার কৃত অনুষ্ঠানসমূহ সম্বন্ধে অনেক বার অনেক প্রকাশ্য স্বাভিপ্রায় মুখে লেখনীতে ব্যক্ত করা গিয়াছে, কিন্তু এত কালের এত সুযোগের মধ্যে তাঁহার নাম করিয়া অদ্যকার মত কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠা অভিব্যক্ত করি নাই। না করিবার প্রধান কারণ তাঁর স্বকীয় প্রার্থনা। অর্থাৎ তিনি যখনই কোন উপলক্ষ্যে আমাদের দ্বারা কোন উদ্যোগ দেখিতে পাইতেন, তৎক্ষণাৎ আমাদিগকে সুমিষ্ট কৌশলে নিবারণ করিয়া রাখিতেন। সে নিবারণের তাৎপর্য্য আর কিছুই নয়, মনোমত ইচ্ছানুযায়ী কাজ যতদিন না হইতেছে —কাজের মত কোনো কাজ যতক্ষণ সমাজ-মধ্যে পূর্ণাবয়বে দৃষ্ট না হইতেছে, ততক্ষণ সুদ্ধ পরস্পরের ধন্যবাদ কোন্ কাজের? তাহাতে বরং অনিষ্ট বই ইষ্ট হইবার সম্ভাবনা অল্প।...

“অদ্য আমরা স্থানান্তরে ‘জাতীয় ভাবের’ ব্যাখ্যা করিয়াছি...অত্র

বঙ্গদেশে বাবু নবগোপাল মিত্রই সেই জাতীয় ভাবের প্রথম ভাবুক ও প্রধান প্রচলন কর্ত্তা। তিনি বিদ্যালয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে না হইতেই —তদবধি একাল পর্য্যন্ত ঐ পবিত্র ভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া সমাজের অবস্থা, বান্ধবমণ্ডলীর সাহায্য ও স্বীয় বহুদর্শনজনিত জ্ঞানানুসারে সেই ভাবের রূপান্তর ও উন্নতি যখন যেমন হউক, কিন্তু অনন্যকর্ম্মা ও অনন্য-ভাবুকরূপে অবিচলিত চিত্তে দৃঢ় অধ্যবসায় সহযোগে সেই পথের পথিক ও সেই পবিত্র ব্রতের ব্রতী হইয়া আসিতেছেন। কিসে স্বীয় পৈতৃক সমাজ প্রকৃত সামাজিকতা, প্রকৃত জাতীয় ভাব, প্রকৃত স্বদেশানুরাগ প্রভৃতি সদগুণে ভূষিত হইবেন—কিসে তাহাদিগের ভীরুতা ও স্বার্থপরায়ণতা অপগত হইবে—কিসে তাহারা অপর জাতীয়ের নিকট পূর্ব্ববৎ হেয় পদার্থ না থাকিয়া সভ্য সমাজের পাঁচটার মধ্যে একটা হইতে পারিবে, তিনি এই চিন্তাতেই নিমগ্ন মহোদ্যোগেই ব্যাপৃত—এই অনুষ্ঠানেই কাল কাটাইতেছেন। তাঁহার মুখে 'জাতীয় জাতীয়, জাতীয়!' তাঁহার সকল কার্য্যে 'জাতীয়, জাতীয়, জাতীয়।' তাঁহার যত্নে স্থাপিত সভার নাম 'জাতীয়!' বিদ্যালয়ের নাম 'জাতীয়!' ব্যায়ামশালার নাম 'জাতীয়!' মেলার নাম 'জাতীয়!' তিনি জাগ্রত অবস্থায় 'জাতীয়!' লইয়া বিব্রত! তিনি সুপ্তাবস্থায় স্বপ্ন দেখেন 'জাতীয়!' তিনি জাগ্রত 'জাতীয়!'" *

হিন্দু মেলার ভিতর দিয়া নবগোপাল ভারতবাসীর মনে সক্রিয় জাতীয়তাবোধের উন্মেষ সাধনে সক্ষম হইয়াছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ লেখকগণ নিজ নিজ গ্রন্থে ইহার সবিশেষ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা, দীনবন্ধুর নাটক, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস,

---

* "বক্তৃতামালা" পৃঃ ৮-৯। লেখক প্রণীত "জাতীয়তার নবমন্ত্র বা হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত" পুস্তকে হিন্দু মেলার আনুপূর্বিক বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সোমপ্রকাশ, মহেন্দ্রলাল সরকারের হোমিওপ্যাথি, এই সকলের মধ্যে শিক্ষিত দলের মনে যেমন নবভাব আনিয়া দিতেছিল, তেমনি আর এক কার্য্যের আয়োজন হইয়া নব আকাঙ্ক্ষার উদয় করিয়াছিল। তাহা…নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত 'জাতীয় মেলা' নামক মেলা ও প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠা এবং দেশের সকল বিভাগের ও সকল শ্রেণীর নেতৃবৃন্দের তাহার সহিত যোগ। বঙ্গসমাজের ইতিবৃত্তে ইহা একটি প্রধান ঘটনা ; কারণ সেই যে বাঙ্গালীর মনে জাতীয় উন্নতির স্পৃহা জাগিয়াছে তাহা আর নিদ্রিত হয় নাই।"*

নবগোপাল স্বদেশবাসীদের নবজাতীয়তার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য হিন্দু মেলার কার্যে 'তন্ মন' ঢালিয়া দিলেন। মল্লযুদ্ধ, ব্যায়াম প্রভৃতির বিষয় ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। বাঙালীর বিদ্যায় 'গুণ হইয়া দোষ হইল'। ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিয়া বাঙালীরা শাসন-কার্যে ইংরেজদের একচেটিয়া অধিকার লোপ করিয়া তাহাতে ভাগ বসাইতে উদ্যত হয়। কর্তৃপক্ষ তাহাদের এই উদ্দেশ্যে বাদ সাধিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাহারা কোনরূপে বীর্যবান্ হইয়া দেশরক্ষার অধিকারী হয় ইহাও তাঁহাদের অভিপ্রেত ছিল না। গত শতাব্দীর সপ্তম দশকে বাঙালীরা যাহাতে সৈন্যদলে ভর্তি হইতে পারে, অন্ততঃ তাহাদের লইয়া যাহাতে একটি ভলান্টিয়ার বা 'স্বেচ্ছাসৈনিক'-বাহিনী গঠিত হয় সে উদ্দেশ্যে আন্দোলন শুরু হয়। নবগোপাল ইহারও পুরোভাগে ছিলেন। ১৮৭৪ সনের ১লা জুন কলিকাতা টাউন হলে তিনি বাঙালীদের সরকারী সৈন্য বিভাগে প্রবেশ সম্পর্কে এক বক্তৃতা দিলেন। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' (৪ জুন ১৮৭৪) লেখেন,—

"গত সোমবার টাউন হলে আমাদের দেশহিতৈষী বাবু নবগোপাল

---

* রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ২৫৭।

মিত্র একটি অপূর্ব্ব বক্তৃতা করিয়াছেন।…ইনি সেই মহাপুরুষ যিনি দেশ উদ্ধার করিবার নিমিত্ত আপনার প্রাণ পণ করিয়াছেন।…নবগোপাল বাবু তাঁহার বক্তৃতায় নানারূপ উদাহরণ ও যুক্তির দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে আমাদের দেশীয়রা যেরূপ বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা বিখ্যাত হইয়াছেন, যদি গভর্ণমেণ্ট ইঁহাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে দেন তাহা হইলে ইঁহারা সমরেও বিখ্যাত হইতে পারেন।…তিনি বিশ্বাস করেন যে এ পর্য্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে কোনরূপ বিক্রম দেখাইতে পারি নাই সে আমাদের দোষ না। ইংরাজেরা যে আমাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে দেন নাই ইহা কেবল সেই নিমিত্ত।…"

বাঙালীরা বিদ্যা-বুদ্ধিতে যেরূপ, যুদ্ধক্ষেত্রেও সেইরূপ যে কৃতিত্ব দেখাইতে পারে, বিগত প্রথম ও দ্বিতীয় মহাসমরে বিভিন্ন রণাঙ্গনে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তাহারা সেনাধ্যক্ষ পদেরও সম্যক উপযুক্ত। কেহ কেহ পূর্বে এসম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করিতেন। কিছুকাল পূর্বেকার হায়দরাবাদের ব্যাপারে তাহা একেবারে খণ্ডিত হইয়াছে।

জাতীয় জীবনে রঙ্গমঞ্চের যে একটি বিশিষ্ট স্থান আছে, নবগোপাল তাহা বিশ্বাস করিতেন। কলিকাতায় ১৮৭২ সনের শেষ ভাগে 'ন্যাশন্যাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হয়। নবগোপাল ইহার একজন প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার অমৃতলাল বসু বলেন—

"১৮৭২ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে যখন আমরা প্রথম সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করি, তখন ঐ নবগোপাল বাবুর উপদেশেই আমরা উহার নাম দিই ন্যাশন্যাল থিয়েটার।"*

নবগোপাল বাংলাদেশে সার্কাসেরও প্রবর্তক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এসম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"কতকগুলা 'মড়া-খেগো' ঘোড়া লইয়া, নবগোপালবাবুই সর্ব্ব প্রথম

---

* মাসিক বসুমতী বৈশাখ ১৩৩১, পৃঃ ১০৩।

বাঙ্গালী সার্কাসের সূত্রপাত করেন। আজ যে বোসের সার্কাসের (Bose's Circus) কৃতিত্ব এবং নানা প্রশংসাবাণী শুনা যায়, উহা তাহারই পরিণতি এবং নবগোপাল বাবুর অনুষ্ঠিত সেই প্রথম বাঙ্গালী সার্কাসের চরম ক্রমোন্নতিই বলিতে হইবে।"

নবগোপাল এই সময়কার অন্যান্য জাতীয় আন্দোলনেও যোগ দিয়াছিলেন। তিনি আনন্দমোহন-সুরেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত 'Indian Association' বা 'ভারত-সভা'র অধ্যক্ষ সমিতির একজন উদ্যোগী সভ্য ছিলেন। দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র আইন বিধিবদ্ধ হইলে ইহার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হয় তাহার মধ্যেও নবগোপালবাবু ছিলেন। ১৮৭৭ সনে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে উক্ত আইনের প্রতিবাদে এক বিরাট জনসভা হয়। এই সভায় পার্লামেণ্টে প্রেরণার্থ স্মারকলিপি রচনার জন্য একটি সাব-কমিটি গঠিত হইল। নবগোপাল ইহার একজন উদ্যোগী সদস্য ছিলেন।

দীর্ঘকাল জাতীয়তামূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া নবগোপাল শেষে নিঃস্ব হইয়া পড়েন এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের এসেস্‌মেণ্ট বা গৃহের কর নির্ধারণ বিভাগে চাকুরী লইতে বাধ্য হন। তিনি বরাবর 'ন্যাশন্যাল পেপারে'র সম্পাদক ছিলেন। তিনি 'বেঙ্গল একাডেমি অফ লিটারেচার' বা 'বঙ্গসাহিত্য সভায়' দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্র সম্বন্ধে ইংরেজীতে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। কর্মবীর নবগোপাল সম্বন্ধে জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ ঠাকুরের সঙ্গে আমরাও বলি,—

"তিনি এত করিলেন, অথচ এখন তাঁহার নামও কেহ করে না। ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়। এদেশে তাঁহার ন্যায় স্বদেশানুরাগী নীরব কর্ম্মবীরের একটা স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন থাকা নিতান্ত আবশ্যক।"*

---

* জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ১৩১-২।

শিশিরকুমার ঘোষ

১

ব্রিটিশের শাসন-বৈগুণ্যে ভারতবাসী সর্ববিষয়ে পরনির্ভরশীল হইয়া পড়িতেছিল। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রাজনারায়ণের ভাবধারণা এবং নবগোপালের হিন্দু-মেলানুষ্ঠান ইহার গতি অনেকটা সংযত করিতে সক্ষম হয়। রাজনীতিক্ষেত্রে আত্মনির্ভরবোধ পুরাপুরি জন্মিতে আরও কিছুর আবশ্যক ছিল। অবশ্য উল্লিখিত অনুষ্ঠানাদি দ্বারা ইহার পথ অনেকটা পরিষ্কৃত হইতে আরম্ভ হয়। শিশিরকুমার ঘোষের নাম আজ ভারতের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রায় সকলেই অবগত আছেন। তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য—রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রেও দেশবাসীর পরানুচিকীর্ষা পরিত্যাগ করিয়া স্বাবলম্বন বা আত্মনির্ভর-শক্তির উন্মেষ সাধনে কঠোর প্রয়াস। ভারতের রাষ্ট্রনীতি পরবর্তীযুগে যে সক্রিয়রূপ ধারণ করিয়া আমাদের স্বাধীনতা-প্রচেষ্টাকে জয়যুক্ত করিয়াছে তাহার মূল আমরা শিশিরকুমারে দেখিতে পাই। আজ এই কারণে তাঁহার কথা আমাদের বিশেষ করিয়া আলোচনা করা কর্তব্য।

শিশিরকুমার সম্বন্ধে তাঁহার ভগিনী স্থিরসৌদামিনী ভক্তিপূর্ণচিত্তে নানা কথা লিখিয়াছেন। ইহাতে হয়তো অতিরঞ্জন রহিয়াছে। তথাপি তাঁহার নিম্নের উক্তি হইতে মানুষ শিশিরকুমারের একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। স্থিরসৌদামিনীর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমরা শিশিরকুমার সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। তিনি লেখেন, "সেজদাদার বিষয় আর কি লিখিব? ভারতবর্ষে এমন লোক নাই যে ৺শিশিরকুমার ঘোষকে না জানে। এই যে ভারতবর্ষ স্বাধীন স্বাধীন করিয়া উন্মত্ত, ইহার মূল ভিত্তি আমার সেজদাদা। কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি ধর্ম্মবিষয়ে শিশির-

কুমারের তুল্য কেহ ভারতবর্ষে জন্মিয়াছেন কিনা বলিতে পারি না। তিনি ক্ষুদ্র একটি পল্লীতে জন্মগ্রহণ করিয়া জগৎপূজ্য হইয়াছেন। যাঁহার রচিত 'অমিয়নিমাই চরিত' পাঠে অনেক পাষণ্ড উদ্ধার হইল যত দিন চন্দ্র সূর্য্য এই পৃথিবীতে লয় না পাইবে তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি 'অমিয়নিমাই চরিত' ধর্ম্মজগতে তাঁহার জয় ঘোষণা করিবে।...তিনি ক্ষুদ্র কার্য্য করিতে কখনও কুণ্ঠিত হন নাই অর্থাৎ ভূঁই নিড়ান ও ঘরের দেওয়াল দেওয়া ঘরের চাল ছাওয়া প্রভৃতি ছোট কার্য্যও তিনি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেন। এদিকে সন্তরণ বিষয়ে, কুস্তি লড়া ও বন্দুক ছোঁড়া এ সমস্ত বিষয়েও তাঁহার অদ্ভূত ক্ষমতা ছিল। আবার সেতার, এসরাজ, পাখওয়াজ বাজনায় তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। তিনি চিত্রবিদ্যায় এরূপ সুনিপুণ ছিলেন যে, যে-কোন বস্তু তিনি দেখিবামাত্র অঙ্কন করিতে পারিতেন।... প্রকৃতি তাঁহার এরূপ সরল ছিল যে পঞ্চম বর্ষীয় বালকের সহিতও তিনি ক্রীড়া-কৌতুক দৌড়াদৌড়ি করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার পরিচ্ছদের দিকে দৃষ্টিপাত ছিল না। এমন কি অনেক সময়ে অনেক বড়লোকের বাড়ী যাইয়া তাঁহাকে অপদস্থ হইতে হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার মন এতদূর উঁচু ছিল যে তাহা তিনি মোটেই লক্ষ্য করিতেন না। তাঁহার স্নেহের অবধি ছিল না।"

২

শিশিরকুমার ১২৪৭ বঙ্গাব্দের (১৮৪০) আষাঢ় মাসে যশোহর জেলায় ঝিকরগাছার নিকটবর্তী পলুয়া-মাগুরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই পলুয়া-মাগুরা বর্তমানে অমৃতবাজার নামে পরিচিত। শিশির-কুমারের মাতা অমৃতময়ীর নামে এই গ্রামের নামকরণ হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ অমৃতবাজার পত্রিকাও অমৃতময়ীর নাম বহন করিতেছে।

শিশিরকুমারের পিতা হরিনারায়ণ যশোহরের একজন বর্ধিষ্ণু ব্যবহারজীবী ছিলেন। তাঁহার আট পুত্র, তিন কন্যা, তন্মধ্যে শিশিরকুমার তৃতীয়। বসন্তকুমার, হেমন্তকুমার, শিশিরকুমার, মতিলাল—শিশিরকুমারের জীবন-কথা আলোচনা করিতে গেলে এই চারি জনের সম্বন্ধেই কম-বেশী বলিতে হয়। কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণের, বিশেষতঃ শিশিরকুমারের জীবনে জ্যেষ্ঠ বসন্তকুমারের প্রভাব অপরিসীম। বসন্তকুমারের জ্ঞানার্জনস্পৃহা, দেশভক্তি, কর্মকৌশল শিশিরকুমারের মনে একটি সুদৃঢ় ছাপ রাখিয়া যায়। তিনি জ্যেষ্ঠ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "আমি দাদাকে ঈশ্বরের ন্যায় ভক্তি করিতাম। তাঁহার একটু সন্তুষ্টির নিমিত্ত আমি শত বার প্রাণ দিতে পারিতাম। যেমন কাদা দিয়া পুতুল গড়ে সেইরূপ তিনি আমাকে গড়িয়াছিলেন, ভালই গড়িয়াছিলেন।…অদ্যাপি শ্রীভগবানের পূজা করিতে বসিয়া আমি প্রভুকে দেখি না, সেস্থানে দাদাকে দেখি।"*

শিশিরকুমার প্রথমে যশোহর স্কুলে অধ্যয়ন করেন। অধ্যয়নে তাঁহার গভীর মনযোগ ছিল। তৎসত্ত্বেও তিনি শরীরচর্চায় কখনও অবহেলা করেন নাই। কুস্তি, কসরৎ, খেলাধূলা, দৌড়ঝাঁপ, সাঁতার-কাটা প্রভৃতিতেও তিনি বিশেষ পটু ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় যশোহর হইতে বার মাইলের পথ হাঁটিয়া প্রায়ই নিজ গ্রামে আসিয়া পৌঁছিতেন। ঝড়বৃষ্টি তিনি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতেন না। যশোহর স্কুলে অধ্যয়নের পর শিশিরকুমার কিছুকাল কলিকাতার কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলেও (যাহা পরে 'হেয়ার স্কুল' হইয়াছে) পড়িয়াছিলেন মনে হয়। কেন না তিনি ১৮৫৭ সনে প্রবেশিকা পরীক্ষা এই স্কুল হইতেই দিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পর ইহাই প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষা। ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের ১৮৫৬-৫৭ সনের রিপোর্টে

* অমিয়নিমাই চরিত, ২য় খণ্ড, উৎসর্গপত্র।

(Appendix C) বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের মধ্যে শিশিরকুমারের এইরূপ উল্লেখ আছে,—

"Name of Scholars : Shesser Coomar Ghose ; School at which gained: Colootollah Branch School; When gained : April 1857 ; Monthly value of Scholarship : Hindu College Scholarship Rs. 8 ; For how long tenable : One year ; For proficiency in which branch : General proficiency."

প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া শিশিরকুমার এক বৎসরের জন্য মাসিক আট টাকা বৃত্তি লাভ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে এই বৎসর গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পিতা) প্রমুখ পরবর্তী-কালের স্বনামধন্য ব্যক্তিগণও প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রথমোক্ত দুই জনও বৃত্তি পান। শিশিরকুমার ইহার পর কিছুকাল প্রেসিডেন্সী কলেজে ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তখন এই কলেজেই এ বিষয় পড়ান হইত। শিশিরকুমার গণিত-চর্চায় বিশেষ আনন্দ পাইতেন।

শিশিরকুমার কতদিন প্রেসিডেন্সী কলেজে ইঞ্জিনীয়ারিং অধ্যয়নে রত ছিলেন তাহা সঠিক বলা যায় না। তবে অনুমান হয় ছাত্রাবস্থা অতিক্রম না হইতেই তিনি আর একটি বিশেষ কার্যে জড়িত হইয়া পড়েন। গত শতাব্দীর 'নীল-হাঙ্গামা' বাংলার সামাজিক ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ব্যাপার। এই শতাব্দীর মধ্যভাগে নিম্ন ও মধ্য বঙ্গে নীলকরদের অত্যাচার চরমে উঠে। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' এই সব অত্যাচার অনাচারের কাহিনীকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। নীলকর-অত্যাচারে জর্জরিত রাজশাহী, পাবনা, নদীয়া, যশোহর ও ফরিদপুর জেলার রায়তগণ ইহাদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হইতে শুরু করে।

যশোহর ও নদীয়ার কতকাংশে যুবক শিশিরকুমার প্রজাবৃন্দকে একই উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি এইসময়ে 'হিন্দু পেট্রিয়টে' রাশনাম মন্মথলাল ঘোষের সংক্ষিপ্ত এম. এল. জি. (ভ্রমক্রমে 'জি' স্থলে বার বার 'এল' মুদ্রিত হয়) স্বাক্ষরে পত্রাকারে নীলকরদের অত্যাচার-কাহিনী লিখিয়া পাঠাইতেন। ইতিপূর্বে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রসঙ্গে আমরা ইহা জানিতে পারিয়াছি। ইংরেজ সিবিলিয়ান কর্মচারী ও ইংরেজ নীলকরদের অধিকাংশের মধ্যেই স্বভাবতঃই যোগাযোগ ছিল। শিশিরকুমারের বিরুদ্ধে স্থানীয় কর্মচারীগণ মামলা রুজু করিতে তৎপর হইলেও উপযুক্ত প্রমাণাভাবে তাদের নিরস্ত থাকিতে হয়। শিশিরকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে নীলচাষীদের লইয়া সভাসমিতির অনুষ্ঠান করেন এবং কিরূপে প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়িতে হইবে তাহার পরামর্শ দেন। ১৮৬০ সনের নীল-আন্দোলন যে অতখানি দানা বাঁধিয়াছিল তাহার জন্য শিশিরকুমারের কৃতিত্ব যথেষ্ট।

৩

পিতা হরিনারায়ণের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ বসন্তকুমার ও মধ্যমাগ্রজ হেমন্তকুমারের ন্যায় শিশিরকুমারকেও অর্থাগমের উপায় দেখিতে হয়। তাঁহাদের মত তিনিও শিক্ষকতা কার্য আরম্ভ করেন। শিশিরকুমার প্রথমে কোন্নগর স্কুলে এবং পরে সাতক্ষীরা স্কুলে শিক্ষকতা কার্যে রত হন। স্কুল-পরিদর্শক সুবিখ্যাত ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কোন্নগরে অবস্থানকালেই হয়তো তাঁহার আলাপ পরিচয় হইয়া থাকিবে। ভূদেব শিশিরকুমারের কার্যে বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি তাঁহাকে মাসিক পঁচাত্তর টাকা বেতনে একটি সহকারী পরিদর্শকের পদে নিযুক্ত করিলেন। শিশিরকুমার এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিতেই জ্যেষ্ঠ বসন্তকুমার মৃত্যুমুখে

পতিত হন (১৮৬৭, ২৪ মার্চ)। তখন যশোহরের জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট মনরো সাহেব হেমন্তকুমার ও শিশিরকুমারকে উচ্চতর বেতনে ইনকাম ট্যাক্স এসেসরের কর্মে নিয়োজিত করেন।

শিক্ষা-বিভাগে কার্যকালেই মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্র পরিচালন সম্পর্কে শিশিরকুমারের অভিজ্ঞতা হইতে থাকে। তিনি জ্যেষ্ঠ বসন্তকুমারের আগ্রহাতিশয্যে কলিকাতা হইতে সস্তায় একটি কাঠের মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করিয়া স্বগ্রামে লইয়া আসেন এবং তাহা কার্যোপযোগী করিয়া তুলেন। এই মুদ্রাযন্ত্রটির নাম রাখা হয় অমৃত প্রবাহিণী যন্ত্র। বসন্তকুমার এই যন্ত্র হইতে 'অমৃত প্রবাহিণী' নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন। তাঁহার বড় সাধ ছিল একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বাহির করা। বসন্তকুমারের মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যেই শিশিরকুমার সরকারী চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী মধ্যমাগ্রজের সঙ্গে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রতিষ্ঠা করিলেন। শিশিরকুমার হইলেন ইহার সম্পাদক ও প্রধান লেখক। মধ্যমাগ্রজ হেমন্তকুমার, পরবর্তীকালের বিখ্যাত ব্যারিস্টার ও কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট আনন্দমোহন বসু, কিশোরীলাল সরকার এবং জগদ্বন্ধু ভদ্র ইহার লেখক শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

শিশিরকুমার নব্যশিক্ষিত, প্রগতিশীল, উদারমতাবলম্বী অথচ প্রকৃত দেশহিতকামী। অমৃতবাজার পত্রিকা প্রকাশ করিয়া ইহাকে জাতির একটি পূর্ণাঙ্গ মুখপত্র করিয়া তুলিতে প্রথম হইতেই তিনি প্রয়াসী হইলেন। ইহা যে রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে একটি নূতন ধারার প্রবর্তন করিতে যাইতেছে, প্রথম সংখ্যায় মুদ্রিত উদ্দেশ্যপত্রের এই অংশেই তাহা সুব্যক্ত। তিনি শ্লেষাত্মক ভঙ্গীতে লেখেন, "স্বার্থশূন্য মহাত্মা ইংরাজ বাহাদুরেরা··· যাহারা কেবলমাত্র আমাদের হিত ও স্বচ্ছন্দতার নিমিত্ত, রাজ্য শাসনের ন্যায় অতি ক্লেশকর ও কঠিন কার্য্যে আমাদিগকে হস্তক্ষেপণ করিতে দেন

না, তাহাদিগের রীতিনীতি, উদ্দেশ্য, স্বার্থশূন্যতা ও কৌশল যথাসাধ্য বর্ণনা করিয়া তাহাদিগের নিকট যে ঋণ পাশে আবদ্ধ আছি, তাহা পরিশোধের যত্ন করি।" অমৃতবাজার পত্রিকার

"অধীনতা কালকূটে মরি হায় হায়।
করেছে কি আর্য্যসুতে চেনা নাহি যায়॥"

—শিরোভূষণটিতে ইহার উদ্দেশ্য আরও সুপরিস্ফুট। প্রতিষ্ঠা অবধি পত্রিকা ভারতবাসীদের অহরহ এই কথাই শুনাইতে লাগিলেন যে, ইংরেজ শাসক এবং ভারতবাসী শাসিত। উভয়ের মধ্যে এই শাসক-শাসিতের সম্বন্ধ ছাড়া আর কোনও সম্পর্ক নাই। এইজন্য উভয়ের স্বার্থ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যাহাতে ইংরেজের স্বার্থ, তাহাতে ভারতবাসীর স্বার্থ নাই, যাহাতে ভারতবাসীর স্বার্থ তাহাতে ইংরেজের স্বার্থ নাই ; একের লাভে অন্যের ক্ষতি, সুতরাং উভয়ের মিলনের সম্ভাবনাও নাই। ভারতবাসীদের মধ্যে এই চেতনা জাগ্রত না হওয়ার ফলে তাহারা আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে পারিতেছে না, উপরন্তু শাসকশ্রেণীর হস্তে লাঞ্ছনাই তাহাদের ভাগ্যে জুটিতেছে। সুতরাং রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে তাহাদের ইংরেজের মুখাপেক্ষী না হইয়া নিজের পায়ে দাঁড়াইতে অভ্যাস করা কর্তব্য। নিজেদের সংঘবদ্ধ করা, রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্যে সভাসমিতি স্থাপন, এদেশে পার্লামেণ্টারী বা প্রতিনিধিমূলক শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন প্রভৃতি বিষয়ে আন্দোলন পত্রিকা উপস্থিত করিলেন। ইউরোপীয় সমাজের, বিশেষতঃ শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের অত্যাচার-অনাচারের কথাও পত্রিকা বাহির করিতে লাগিল। পত্রিকা প্রকাশের চারমাসের মধ্যেই ইহাকে একটি জটিল মানহানির মামলায় পড়িতে হয়। মানহানির মামলা হইলেও যাবতীয় পদস্থ সিবিলিয়ানই এই অছিলা করিয়া পত্রিকার বিরোধিতা করিতে লাগিলেন এবং যাহাতে ইহার সর্বনাশ সাধন হয় তাহার জন্য সচেষ্ট হইলেন। কূটবুদ্ধি সিবিলিয়ানগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, পত্রিকা-প্রবর্তিত আন্দোলনের

পরিণাম তাহাদের পক্ষে মোটেই সুখপ্রদ হইবে না। উক্ত মানহানির মামলায় মুদ্রাকর এবং প্রবন্ধলেখক দণ্ডিত হন। কিন্তু শ্বেতাঙ্গদের মূল লক্ষ্য সম্পাদক শিশিরকুমার মুক্তি পাইলেন। ইহার পর তাঁহাকে অন্য মোকদ্দমায়ও জড়াইতে চেষ্টা করা হয়, তাহা হইতেও তিনি নিষ্কৃতি লাভ করিতে সক্ষম হন। পত্রিকা কিন্তু পূর্ণোদ্যমে রাষ্ট্রনীতি-চর্চা চালাইতে লাগিল।

মফস্বলের একটি ক্ষুদ্র পল্লী হইতে প্রকাশিত এবং মুখ্যতঃ রাষ্ট্রনীতি চর্চায় রত হইলেও তৎকালীন দেশোন্নতিমূলক জনহিতকর বিবিধ প্রচেষ্টার সঙ্গে অবিলম্বে পত্রিকার যোগাযোগ স্থাপিত হইল। হিন্দু মেলার কথা আমরা ইতিপূর্বে জানিয়াছি। মফস্বল হইতে 'পত্রিকা' ইহার উদ্দেশ্য প্রচার ও উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করিলেন। শিক্ষা সংস্কার, ব্যায়াম অনুশীলন, স্ত্রীশিক্ষা, বিধবাবিবাহ, অধ্যাত্মবাদ প্রভৃতির আলোচনা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের উপর বিদ্রূপাত্মক রচনা পত্রিকায় যথারীতি স্থান পাইত। রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পক্ষেও যে সমাজ সংস্কার, শিক্ষার প্রসার প্রভৃতি আবশ্যক 'পত্রিকা' তাহা দেশবাসীকে অনবরত শুনাইত। জনসাধারণের মধ্যে রাষ্ট্রীয় চেতনা উন্মেষের জন্য পত্রিকার কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন অঞ্চলে রাজনৈতিক সভাসমিতি স্থাপনে উদ্যোগী হন। কেন্দ্রীয় সভারূপে কলিকাতার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনকে নেতৃত্ব গ্রহণে তাঁহারা পরামর্শ দিতে থাকেন।

৪

শিশিরকুমারের সকল কার্যের মূলেই ছিল অকৃত্রিম দেশপ্রেম। তাঁহার স্বদেশপ্রেম ভাববিলাসীর অবসর-বিনোদনের উপায় ছিল না। ইহাকে কত বিভিন্ন উপায়ে বস্তুগত করিয়া তোলা যায় সেবিষয়ে তিনি সতত

সচেষ্ট থাকিতেন। স্বগ্রামস্থ স্কুলে তিনি অভিনব 'ড্রিল' প্রবর্তন করিয়াছিলেন। পাকা বাঁশের লাঠি দিয়া বন্দুকের সঙ্গীন তৈরি করিয়া ড্রিলের সময় ছাত্রদের উহার ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া হইত। শিশিরকুমার 'নীলদর্পণ'-প্রণেতা দীনবন্ধু মিত্রকে বলিয়াছিলেন, "যদি এরূপভাবে দেশের সকল স্কুলে 'ড্রিল' শিক্ষা দেয়, তবে তুমি দেখিবে একটা blood-shed (রক্তপাত) না হইয়া যাইবে না।"*

কবিবর নবীনচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন ঃ

"শিশির তখন মাতৃভূমির দুঃখের কথা বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিতেন, উচ্ছাসে উন্মত্ত হইতেন।...যশোহরে লিখিত আমার খণ্ড-কবিতায় ও 'পলাশীর যুদ্ধে' স্বাধীনতার জন্য যে নিঃশ্বাস ও মাতৃভূমির জন্য অশ্রুবিসর্জ্জন আছে, তাহা কথঞ্চিৎ শিশিরকুমারের সংসর্গের ও শিক্ষার ফল। তিনি ও তাঁহার পত্রিকাই প্রথম এই দেশে স্বদেশভক্তির পথপ্রদর্শক।"†

নবীনচন্দ্র কর্মজীবনের প্রথমেই ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই যশোহরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়া যান এবং প্রায় এক বৎসর এইপদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তখন তিনি নানাভাবে শাশরকুমারের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। প্রথমদিন শিশিরকুমারের সঙ্গে যখন তাঁহার সাক্ষাৎ হয় তখন তিনি বিচারাসনে বসিয়া। প্রথম দিনকার সাক্ষাতে শিশিরকুমারকে তিনি কি মূর্তিতে দেখিয়াছিলেন তাহা এখানে উল্লেখ করিতেছি,—

"বেলা তিনটার সময়ে এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি আমার এজলাসে আসিয়া উপস্থিত। একখানি ক্ষুদ্র কাষ্ঠ বিশেষ বলিলেও চলে। বয়স অনুমান

---

* নবীনচন্দ্র সেন—'আমার জীবন,' ২য় ভাগ, পৃঃ ২৫

† ঐ, পৃঃ ২৬

ত্রিশ বৎসর। সমস্ত শরীরে কেবল কয়েকখানি হাড়। নাকের, মুখের এমনকি সর্ব্বশরীরের অস্থি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। চক্ষু কোটরস্থ, কিন্তু তীব্র, উজ্জ্বল, হাস্যকর। মুখে গালভরা পান ও গালভরা কেমন এক প্রকার বিদ্রূপাত্মক হাস্য। পানের অলক্তরসে অধর প্রান্তদ্বয় প্লাবিত। পরিধানে সামান্য ধুতি, সামান্য পিরান, তাহারও নাস্তি বোতাম। তাহার উপর একখানি চাদরের দড়ি—বুকের উপর অঙ্কশাস্ত্রের পূরণের চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া প্রান্তদ্বয় স্কন্ধের উপর দিয়া পৃষ্ঠে পড়িয়াছে। এই ত রূপ! কিন্তু মূর্ত্তিখানি দেখিলে বোধ হয় কি যেন একটি অদ্বিতীয় লোক।"*

৫

যশোহরে ১৮৭০-৭১ সনে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখা দেয়। শেষোক্ত বৎসরে জলপ্লাবনহেতু স্থানান্তরে গমনাগমনও ভয়ানক কষ্টকর হইয়া উঠে। এতদিন মফস্বলে থাকিয়া শিশিরকুমার সাধ্যমত পত্রিকা সম্পাদনা করিয়া আসিয়াছেন। উপরোক্ত দুই কারণে এবং পত্রিকাখানির উন্নতি মানসে তিনি ইহা লইয়া ১৮৭১ সনের অক্টোবর মাসে সপরিবারে কলিকাতায় আগমন করেন। কলিকাতায় সংবাদপত্র পরিচালন এবং বৃহৎ পরিবার প্রতিপালন বড়ই ব্যয়সাপেক্ষ। শিশিরকুমার সুকৌশলে অল্পকালের মধ্যেই সমূহ বিপদ কাটাইয়া উঠিতে সমর্থ হইলেন। রাজা দিগম্বর মিত্র, মহারাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রমুখ হিন্দু প্রধানগণ যেমন একদিকে তাঁহাকে সহায়তা করিতে লাগিলেন, অন্যদিকে অমৃতলাল বসু প্রমুখ প্রগতিবাদী যুবক সম্প্রদায়ও 'পত্রিকা'র প্রচারে বিশেষ উদ্যোগী হইলেন। শিশিরকুমার নানাভাবে

* ঐ, পৃঃ ২০

পত্রিকাখানির উন্নতি সাধনে তৎপর হন। ইহাতে এতদিন ব্যঙ্গাত্মক রচনাই স্থান পাইত। ১৮৭২ সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী হইতে তিনি ইহাতে ব্যঙ্গচিত্রও দিতে আরম্ভ করেন। অন্যান্য পত্রিকা হইতে প্রবন্ধ-সঙ্কলনও ইহাতে প্রকাশিত হইতে থাকে। দ্বিতীয় বৎসর হইতে মধ্যে মধ্যে ইংরেজী প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট করা হইলেও ১৮৭২ সন হইতেই প্রকৃতপক্ষে ইহাকে ইংরেজী-বাংলা সাপ্তাহিকে পরিণত করা হইল। ইহার আট পৃষ্ঠা ব্যাপী একটি ইংরেজী ক্রোড়পত্রও (Overland Edition) ইহাতে সন্নিবেশিত হয়।

মফস্বলে নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরণ দ্বারা যথাযথ সংবাদ আহরণের ব্যবস্থা পূর্বে ছিল না। বাংলার সংবাদপত্র-জীবনে শিশিরকুমারই ইহার প্রথম প্রবর্তক। ১৮৭৩-৭৪ সনে যখন বাংলা ও বিহারে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় তখন তিনি মধ্যমাগ্রজ হেমন্তকুমার ঘোষকে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত অঞ্চলসমূহে নিজস্ব প্রতিনিধি করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার প্রেরিত সংবাদ সপ্তাহের পর সপ্তাহ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া দুর্গতদের দুঃখদুর্দশার কথা লোকের গোচরীভূত করিতে লাগিল। শিশিরকুমারের এই সুন্দর অথচ অভিনব ব্যবস্থাটিকে অভিনন্দিত করিয়া কবি ও নাট্যকার 'মধ্যস্থ'-সম্পাদক সুবিখ্যাত মনোমোহন বসু তাঁহাকে যে-পত্র লেখেন তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিলাম,—

"দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চলে আপনাদের একজন গমন করিয়া স্বদেশের অশেষ উপকার করিয়াছেন। এরূপ মহৎ কার্য্যে অস্মদ্দেশীয় সম্পাদকগণ উদ্‌যুক্ত হয়েন ইহা স্বদেশহিতেচ্ছু মাত্রেরই ঐকান্তিক প্রার্থনা। বঙ্গীয় সম্পাদক শ্রেণীর মধ্যে আপনি যে ইহার প্রথম পথপ্রদর্শক হইলেন এবং তদ্দ্বারা যে বর্ত্তমান ঘটনার সত্যাসত্য নির্ণয় ও ভবিষ্যতের নিমিত্ত সদ্দৃষ্টান্ত ও সদুৎসাহ দান করিলেন, তাহা মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিতেছি। আপনি বহু ব্যয় ও বহু আয়াসসাধ্য বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরণ দ্বারা বিশেষ সমাচার

সংগ্রহ করাতে সুশিক্ষিত বাঙ্গালী—বিশেষতঃ সম্পাদক শ্রেণীর মুখোজ্জ্বলকারক ও গৌরববর্দ্ধক কার্য্য করিয়াছেন। আপনার সংবাদদাতার তাবৎ পত্র আমি বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে পড়িয়াছি; তাঁহার সুতীক্ষ্ণ সদনুসন্ধিৎসা ও সুযুক্তিপূর্ণ অভিপ্রায়াদি পাঠে মহাসন্তোষ লাভ করিয়াছি এবং তাঁহাকে একজন স্বদেশমিত্র বিজ্ঞ বিদ্বানরূপে চিনিতে পারিয়া তাঁহার প্রতি ও আপনার প্রতি শত ধন্যবাদ অর্পণ করিয়া সুখী হইতেছি।"*

৬

বাঙালী-জীবনে ১৮৭০-৮০ এই দশ বৎসর কাল একটি গৌরবময় যুগ। এইসময় সমাজ ও দেশহিতকর বহু প্রচেষ্টার সূচনা হয়। শিশির-কুমার কলিকাতায় আসিয়া ইহার প্রায় প্রত্যেকটির সঙ্গেই সাক্ষাৎ-ভাবে যুক্ত হইলেন। হিন্দু মেলার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। তিনি ইহার বিভিন্ন বার্ষিক অধিবেশনে ও ইহারই অঙ্গীভূত জাতীয় সভার মাসিক অধিবেশনাদিতেও উপস্থিত থাকিয়া আলোচনায় যোগ দিতেন এবং ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে প্রয়াস পাইতেন। ১৮৭৪ সনে হিন্দু মেলায় শিশিরকুমার 'বর্তমান দুর্ভিক্ষ ও তন্নিবারণের উপায়' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। কুস্তি-কসরৎ-ব্যায়ামাদি হিন্দু মেলার একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। শিশিরকুমার ইহার একজন বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন।

এই সময়কার আর একটি সমাজ-কল্যাণকর প্রচেষ্টা হইল সাধারণগম্য 'জাতীয় নাট্যশালা' প্রতিষ্ঠা। উত্তর কলিকাতার কয়েকজন যুবক এবিষয়ে উদ্যোগী হইয়া ১৮৭২, ৭ই ডিসেম্বর ইহাতে 'নীলদর্পণ' প্রথম অভিনয় করেন। টিকিট বিক্রয় দ্বারা অভিনয় দেখানো কলিকাতায় এই প্রথম। নাট্যশালা জাতীয়তার উন্মেষে কতখানি সাহায্য করিয়াছে তাহা

* 'মধ্যস্থ', বৈশাখ, ১২৮১

আজ সুবিদিত। শিশিরকুমার ইহার উন্নতিতেও অগ্রসর হইলেন। নিজ পত্রিকায় এ-সম্বন্ধে উৎসাহসূচক নিবন্ধ লিখিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, নিজেও সমসাময়িক ঘটনার উপর নাটক-প্রহসন রচনায় মন দিলেন। জাতীয় নাট্যশালায় 'নয়শো রূপেয়া' (৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৩) এবং 'বাজারের লড়াই' (২৯শে জানুয়ারী, ১৮৭৪) অভিনীত হইল। 'নিমাই সন্ন্যাস' নামে তিনি পরে আরও একখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। জাতীয় নাট্যশালার উদ্যোক্তাদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংসার জন্য যে সালিসী কমিটি নিযুক্ত হয় তাহাতে হেমন্তকুমার ঘোষ একজন সভ্য ছিলেন। শিশিরকুমারও পশ্চাতে থাকিয়া বিবাদ-ভঞ্জনে বিশেষ সহায়তা করেন। 'ইণ্ডিয়ান মিররে' (২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৩) একজন পত্র-লেখক শিশিরকুমারের কৃতিত্ব সম্বন্ধে লেখেন,—

"This collison would have proved destructive of National entertainments had not the well-known editor of the Amrita Bazar Patrika intervened between the contesting parties. His good advices and solicitations gradually conquered the obstinacy and party feeling of each party and at last brought the matter to a happy end."

গিরীশচন্দ্র ঘোষ ও দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে শিশিরকুমার ১৮৭৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জাতীয় নাট্যশালার অন্যতম ডিরেক্টর পদে বৃত হন।

এইসময়ে শিশিরকুমারের আর একটি কার্য হইল—শহরে ও মফস্বলে বাঙালীর মনে যে রাষ্ট্রীয় চেতনার উদ্রেক হইতেছিল তাহাকে স্থায়ী রূপ দান। পত্রিকা-মারফত তিনি দেশবাসীকে শিখাইলেন যে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও আমাদিগকে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে হইবে এবং রাষ্ট্রীয় অধিকার নিজ শক্তি দ্বারাই অর্জনীয়। তখন বোম্বাইয়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ

আয়ার্লণ্ডের মত ভারতবর্ষ হইতেও বিলাতের পার্লামেণ্টে প্রতিনিধি প্রেরণের পক্ষপাতী ছিলেন, শিশিরকুমার ইহার ঘোরতর প্রতিবাদ করেন। তিনি বলিলেন, তেলে জলে যেমন মিশ খায় না তেমনি ইংরেজ ও ভারতবাসীর মিলন সম্ভব নহে। আমাদের পার্লামেণ্ট হইবে এদেশে, আমাদেরই আদর্শানুযায়ী। কিন্তু ইহার পূর্বে দেশবাসীকে রাজনৈতিক শিক্ষা দিতে হইবে। পত্রিকার পক্ষ হইতে বিভিন্ন জেলায় ও শহরে রাষ্ট্রীয় সভা প্রতিষ্ঠার কথা আগেই বলিয়াছি। কলিকাতায় আসিয়া শিশিরকুমার এ-বিষয়ে আরও অবহিত হইলেন এবং এখানে একটি কেন্দ্রীয় সমিতি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিতে লাগিলেন।

তখনও পর্যন্ত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বাংলার একমাত্র কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, কিন্তু ইহা তখন প্রায় জমিদার-সভায় পর্যবসিত। শিশিরকুমার প্রথমে ইহাকেই সাধারণ প্রতিনিধিসভায় পরিণত করিবার প্রস্তাব করেন এবং চাঁদার হার বার্ষিক পঞ্চাশ টাকার স্থলে কমাইয়া পাঁচ টাকায় আনিবার জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান। উক্ত সভা ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ প্রধান সদস্যদের লইয়া এ-উদ্দেশ্যে দুইটি গোপন অধিবেশন করেন। তাহাতে স্থির হয় যে, চাঁদার হার হ্রাস করা হইবে না। ইহার পরই একটি কেন্দ্রীয় সভা প্রতিষ্ঠাকল্পে নিয়মাবলী ও অনুষ্ঠানপত্র রচিত ও মুদ্রিত হয়। কিন্তু 'সাধারণী' (৩রা অক্টোবর ১৮৭৫) বলেন, "কোন মহাত্মা সেই ভাবী সভার সভাপতিত্ব স্বীকার না করায়, সভা জন্মলাভ করে নাই।" বলাবাহুল্য, শিশিরকুমারই এরূপ চেষ্টায় বিশেষ অগ্রণী হইয়াছিলেন।

৭

এইসময় আনন্দমোহন বসু বিলাতে অধ্যয়নে রত, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সিবিলিয়ানী কর্ম হইতে অপসৃত হওয়ায় বিব্রত। ইহার পর আনন্দমোহন কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া বন্ধু শিশিরকুমারের পূর্ব প্রস্তাবের সূত্র ধরিয়া আবার একটি কেন্দ্রীয় সভা প্রতিষ্ঠার আলোচনা চালাইতে লাগিলেন। 'সাধারণী' ১৮৭৫, ১৭ই আগস্ট লিখিলেন ঃ

"কলিকাতা সহরে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক একটি সভা স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। সভার কি কি উদ্দেশ্য তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

১। কি করিলে সর্ব্বসাধারণের রাজকীয় ও অন্যান্য বিষয়ে বিশেষ উন্নতি হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে সকলের মত সংগ্রহ ও প্রচার করা।

২। সাধারণের ইষ্টসাধন ও তাহাদের যাহাতে রাজনৈতিক বিষয়ে জ্ঞান জন্মে তদ্বিষয়ে বাদানুবাদ ও তৎসমুদয় প্রতিষ্ঠা করণ।

৩। বিভিন্ন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বত্ব রক্ষার নিমিত্ত ন্যায়সঙ্গত উপায় নির্দ্ধারিত ও তৎসমুদায় অবলম্বন করণ।

৪। সর্ব্বসাধারণের মনে যাহাতে একজাতিত্ব ভাবের উদয় হয়, তন্নিমিত্ত সাধ্যমত চেষ্টা করণ।

৫। দেশের অর্থোৎপাদক শক্তি যাহাতে সম্যক্ স্ফূর্ত্তি লাভ করে, তাহার উপায় অবলম্বনকরণ।"

বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সময় আনন্দমোহন কলিকাতায় উপস্থিত ছিলেন। ইহার পর তিনি পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে বাহির হন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে কলিকাতায় প্রধানতঃ শিশিরকুমারের উদ্যোগে 'ইণ্ডিয়ান লীগ' নামে একটি কেন্দ্রীয় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল। এবিষয়ে প্রধান উদ্যোক্তা

ছিলেন আনন্দমোহন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে সভা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কোনও কোনও সংবাদপত্রে সমালোচনা হইয়াছিল। 'সাধারণী' (৩রা অক্টোবর ১৮৭৫) লেখেন :

"এবার বিলাতের প্রত্যাবৃত্ত কতিপয় কৃতবিদ্য যুবক বাঙ্গালায় একটি সভা স্থাপনের পুনরুদ্যোগ করিলেন। কোন কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় যে, অমৃত বাজার সম্পাদকগণ এই সভার অনুষ্ঠাতা, তাহার পর কেহ কেহ বলেন যে, তাঁহারা সভার অনুষ্ঠাতা নহেন। যাহা হউক বিগত ২৫শে সেপ্টেম্বর বঙ্গ রঙ্গভূমিতে একটি সভা আহূত হইয়াছিল, অমৃত বাজার সম্পাদকগণ বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন এবং বাবু কালীমোহন দাস সম্পাদকত্বে অভিষিক্ত হইয়াছেন।·· প্রতিধ্বনি···[বলেন] বাবু আনন্দমোহন বসু সভাস্থাপন পক্ষে একজন প্রধান উদ্যোগী, তাঁহার অনুপস্থিতিকালে সভার উদ্বোধন করিয়া ভাল হয় নাই।···আনন্দমোহনকে আমরা ভালবাসি কিন্তু এত বড় কলিকাতা নগরীতে কি কেবল আনন্দ-মোহনই ভরসা ?···এক আনন্দমোহনই সভার সর্ব্বেসর্ব্বা হইবেন, এ কথা তাঁহার গুণের পরিচায়ক হইলেও বাঙ্গালীর নিতান্ত হীনাবস্থার কথা।···"

শিশিরকুমার যে একটু তাড়াতাড়িই সভা প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহা স্বীকার করিয়া তিনি পত্রিকায় (৩০শে সেপ্টেম্বর ১৮৭৫) লিখিলেন,—

"The organization was founded by a *coup de etat* as that was the only possible way of carrying successfully.···Something like a *coup* was necessary to select the···zealous from the wavering."

সুবিখ্যাত শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লীগের অস্থায়ী সভাপতি হইলেন, শিশিরকুমার হইলেন সহকারী সম্পাদক। অধ্যক্ষ সভায় আটত্রিশ জন

সদস্যের মধ্যে মনোমোহন ঘোষ, নবগোপাল মিত্র, আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিও ছিলেন। লীগের কর্মপরিচালনায় মতদ্বৈধতা হেতু অল্পকাল মধ্যে ইহারা অনেকেই লীগের সংস্রব ত্যাগ করেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস হইতে পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লীগের স্থায়ী সভাপতি হইলেন।

লীগ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা সম্পর্কে এতই সমালোচনা হইয়াছে যে, ইহা দ্বারা অনুষ্ঠিত সংকার্যগুলির দিকে কেহ বড় একটি দৃষ্টি দেন নাই। লীগ-প্রতিদ্বন্দ্বী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় *A Nation in Making* পুস্তকে বলিয়াছেন যে, লীগের দ্বারাও কিছু কাজের কাজ হইয়াছিল (The Indian League did some useful work)। কলিকাতা কর্পোরেশনে নির্বাচন-প্রণালী প্রবর্তনের সার্থক প্রচেষ্টা, বাঙালীদের কারিগরি-বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য এলবার্ট বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা ও পরিচালন প্রভৃতি বিষয়ে লীগের কার্য স্মরণীয়। লীগ প্রতিষ্ঠা অবধি বাংলাদেশে রাজনৈতিক ও অন্যবিধ প্রচেষ্টারও বিশেষ সাড়া পড়িয়া যায়। ২১শে সেপ্টেম্বর ১৮৭৬ তারিখের 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ইহার একটি বিবরণ এইরূপ দিয়াছেন,—

"গত বৎসর ইণ্ডিয়ান লীগের সংস্থাপনে বঙ্গদেশে আবার রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বে এদেশে যে সমুদয় রাজনৈতিক আন্দোলন হইয়াছে তাহার কোন একটি বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল।... কিন্তু লীগ কোন বিশেষ আন্দোলনের নিমিত্ত স্থাপিত হয় না। এদেশ-বাসীদের হৃদয়ে রাজনৈতিক উন্নতির স্পৃহা উদ্দীপন করিবার নিমিত্ত লীগ অনুষ্ঠিত হয় এবং এখন যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে বোধ হয় লীগের আশা কিয়ৎ পরিমাণে সফল হইয়াছে। লীগ এক বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি প্রধান কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ইহার যত্নে কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল ইলেকশন কার্য্যটি সমাধা হইয়াছে। আর কয়েকটি কার্য্য

সমাধা করিবার নিমিত্ত লীগের সভ্যেরা এখন উদ্যোগ করিতেছেন। কিন্তু লীগের দ্বারা আরও কয়েকটি উপকার হইয়াছে। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ক্রমে নির্জীব হইয়াছে।...লীগ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনকে এই নির্জীব অবস্থা হইতে কিয়ৎ পরিমাণে জাগরিত করিয়াছেন। যদিও কলিকাতার ইলেকটিভ প্রথা লইয়া ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন পরাস্ত হন,...তথাচ ইহার নিমিত্ত তাঁহারা এরূপ উদ্যোগ ও পরিশ্রম করেন যে অনেকে তাহা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হয়। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান সভা যে এত শীঘ্র প্রতিষ্ঠিত হইল (২৯শে জুলাই ১৮৭৬) তাহারও মূল লীগ। লীগের অনুষ্ঠিত কলেজ দ্বারা মহেন্দ্রবাবু বিশেষ উদ্যোগী হন। মহেন্দ্রবাবু বিজ্ঞান সভার নিমিত্ত গত ছয় বৎসর অবধি ক্রমাগত পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি ইহার নিমিত্ত যে বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, আপনার অনেক সুখস্বচ্ছন্দতা পরিত্যাগ করিয়াছেন, ইহা অস্বীকার করিলে মহাপাপ হইবে।...সম্প্রতি কলিকাতায় যে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হইয়াছে এ লীগের ছায়া। এটি লীগের অবিকল নকল। যদি লীগের সভ্যদিগের মধ্যে পরস্পর মনোবাদ না হইত তাহা হইলে বোধ হয় ইহার সৃষ্টি হইত না। যদি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য দেশের মঙ্গল করা হয়, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে কালে লীগ একত্রিত হইবেন।...লীগে শুদ্ধ এদেশীয়দিগের মধ্যে এই আন্দোলন উত্থিত করে নাই, এদেশীয় ফিরিঙ্গিদিগের মধ্যে এইরূপ অনুষ্ঠান হইতেছে।...”

৮

দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সঙ্কোচের চেষ্টা বহুদিনের। সার জর্জ ক্যাম্‌বেলের সময় হইতেই ইহার সূত্রপাত হয়। তাঁহার সময়েই ঢাকা

ও রাজশাহী বিভাগের কমিশনারদ্বয় এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও আরও একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সঙ্কোচের সপক্ষে মত প্রকাশ করেন। বঙ্কিমবাবুর মতে "much of the general feeling of distrust towards the government which has often been the comment, is due to the native press."। শিশিরকুমার অমৃতবাজার পত্রিকায় (১৬ই মার্চ ১৮৭৩) তাঁহার এরূপ মতের তীব্র সমালোচনা করিয়া লেখেন, "Certainly in a free country such remarks from a person of Bankim Babu's position would have brought down upon him universal condemnation, but under the pressure of a foreign government even the truest patriot turns a traitor to his country." শিশিরকুমার নিতান্ত কর্তব্যের খাতিরেই এইরূপ কঠোর মন্তব্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কেন না ইহার পরই বঙ্কিমচন্দ্রকে বহরমপুরে যখন ডফিন নামক ব্রিটিশ সেনানী অপমান করেন তখন শিশিরকুমারই লিখিয়াছিলেন, "An insult to persons like Bankimchandra means an insult to the whole nation,…"*

সিবিলিয়ানী কর্ম হইতে সুরেন্দ্রনাথকে অন্যায়ভাবে অপসারণ, গাইকোয়াড়ের গদিচ্যুতি, দিল্লীর দরবার, আফগান যুদ্ধ প্রভৃতি ব্যাপারে দেশীয় সংবাদপত্রগুলি কয়েক বৎসর যাবৎ সরকারের তীব্র সমালোচনা করিতেছিল। ইহার কোনও কোনটি বড়লাট লর্ড লিটনের একেবারে অসহ্য হইল। তিনি ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ একদিনের অধিবেশনেই ব্যবস্থা পরিষদে 'Vernacular Press Act' বা দেশীয় সংবাদপত্র আইন পাস করাইয়া ইহার স্বাধীনতা বহুলাংশে সঙ্কুচিত করিয়া দিলেন।

* অমৃতবাজার পত্রিকা, ৮ই জানুয়ারী ১৮৭৪

'সোমপ্রকাশ' বন্ধ হইল। 'সাধারণী' টাকা জমা দিয়া নিজ অস্তিত্ব কোনরকমে বজায় রাখিলেন। কিন্তু 'অমৃতবাজার পত্রিকা' তথা শিশিরকুমার যে পন্থা অবলম্বন করিলেন, তাহাতে সকলেই বিস্ময়াভিভূত হইল। পত্রিকা পরবর্তী ২১শে মার্চ হইতে সম্পূর্ণ ইংরেজীতেই আত্মপ্রকাশ করিল। তখনকার দিনে এত অল্প সময়ে এরূপ আমূল পরিবর্তন নিতান্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। পত্রিকাখানি সম্পূর্ণ ইংরেজীতে পরিবর্তিত করা সম্পর্কে শিশিরকুমার কিন্তু বলিলেন,—

"It is with deep regret that we part with our Vernacular Columns. This step has been forced upon us by our friends and patrons upon whose judgment and patriotism we have confidence. We tried to start this paper in this shape from the beginning of this year; but for reasons it is needless to mention we could not make all the necessary arrangements till this week. Whether this change will benefit our country or not, Heaven alone knows, but we think an absolutely independent paper, conducted in the English language, is just now a great necessity. We have passed through many trials and we are over-powered with gratitude when we recollect the sympathy that was extended to us and we hope, if we have deserved it, Heaven will move our country-men to grant it once more."

এই উক্তির মধ্যে গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ তো দূরের কথা, শিশিরকুমার ইহাতে উক্ত ব্যাপারের উল্লেখমাত্রও করেন নাই।

শিশিরকুমার এত তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণ ইংরেজী আকারে পত্রিকা বাহির করিতে পারিবেন কর্তৃপক্ষের এরূপ ধারণা ছিল না। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ব্যাহত হইল, পরন্তু পত্রিকার এই কার্যে ভারতবাসীদের মনে উল্লাস এবং আত্মপ্রত্যয় দুই-ই বাড়িয়া গেল। শিশিরকুমার কিন্তু ইহার অল্পকাল পরেই 'আনন্দবাজার পত্রিকা ও শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া' নামক আর একখানি সাপ্তাহিক পুরাপুরি বাংলাতেই বাহির করেন। উহার সম্পাদক হইলেন রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় (বিদ্যাভূষণ)। ইহাতে ধর্ম ছাড়া, বিবিধ সংবাদ, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়েও আলোচনা থাকিত।

দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র আইন, অস্ত্র আইন, সিবিল সার্বিস প্রশ্ন, আফগান যুদ্ধ প্রভৃতি লইয়া ভারতবাসীদের মধ্যে ঘোরতর আন্দোলন শুরু হইল। শিশিরকুমার এইগুলির সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে যোগ না দিলেও পত্রিকার মাধ্যমে ইহার বিরুদ্ধে স্বদেশবাসীদের উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পত্রিকার ইংরেজী সংস্করণ বিলাতে প্রচারিত করিয়া সেখানকার জনসাধারণকে এসকল বিষয় অবগত করাইতেও তিনি ত্রুটি করেন নাই। বিলাতে সরকার-বিরোধী দলের নেতা মহামতি গ্লাডস্টোন ভারত-শাসন সম্পর্কে তীব্র মন্তব্য করিয়া নির্বাচন কেন্দ্রে এবং পার্লামেণ্টে যেসব বক্তৃতা দেন তাহার উপাদান অনেকাংশে পত্রিকার পৃষ্ঠা হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। লর্ড রিপনের আমলে দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র আইন রহিত হয়। ঐ সময় স্বায়ত্ত-শাসন, প্রজাস্বত্ব, শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা চলে এবং কোনও কোনটি লইয়া তদন্ত কমিশনও বসে। প্রগতিমূলক সকল ব্যবস্থায় শিশিরকুমারের আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। লর্ড রিপনের ঐসকল কার্যের তিনি সমর্থন করিতেন। লর্ড রিপনের আহ্বানে

শিশিরকুমার একাধিকবার তাঁহার সঙ্গে দেখা করেন এবং প্রস্তাবিত আইনগুলি সম্বন্ধে নিজ মতামত ব্যক্ত করেন। দেশীয় ও ইউরোপীয় বিচারকদের মধ্যে ব্যবহার-সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য রিপনের আইন-সচিব কোর্টনে ইলবার্ট যে-বিল আনয়ন করেন তাহা লইয়া ইউরোপীয় মহলে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। শিশিরকুমার নিজ পত্রিকায় বিলটি সমর্থন করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, ইউরোপীয়দের অভদ্র আচরণ, বাঙালীদের উপর অযথা গালিবর্ষণ প্রভৃতির সমুচিত জবাব পত্রিকায় দিতে লাগিলেন।

স্বদেশে জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক বিষয়ে আন্দোলন পারচালনা এবং বিলাতে ভারত-কথা প্রচার—এ দুইয়ের উপরই শিশিরকুমার বিশেষ জোর দিতেন। এলান অক্টোভিয়ান হিউম কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্বে শিশিরকুমারের সঙ্গে পরামর্শ করিতে কলিকাতায় আগমন করেন। তখন শিশিরকুমার তাঁহাকে এই কথাই বলিয়াছিলেন যে, রাজনৈতিক আন্দোলন শুধু শিক্ষিত লোকদের মধ্যে আবদ্ধ রাখিলে চলিবে না, ইহার মধ্যে নিরক্ষর জনসাধারণকেও টানিয়া আনিতে হইবে। কারণ রাজনীতি শুধু শিক্ষিতদের আলোচ্য নহে, অশিক্ষিত জনগণেরও ইহাতে সমান স্বার্থ। এই উদ্দেশ্যে তিনি 'ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন' নামে একটি রাজনৈতিক জনসভা প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইহা স্থায়ী হয় নাই। বিলাতে ভারত-কথা প্রচারের জন্যও তিনি খুবই আগ্রহশীল ছিলেন। কংগ্রেসের কোনও প্রতিনিধি-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবার পূর্বেই তিনি উইলিয়ম ডিগবি এবং অন্যান্য ভারতহিতৈষী ইংরেজের সহায়তায় সেখানে ভারত-কথা প্রচারে অগ্রসর হইয়াছিলেন। শ্বেতাঙ্গদের হস্তে নির্যাতিত ভারতীয়দের মোকদ্দমার পরিচালনা এবং অন্যান্য সাহায্য দানের জন্য ইণ্ডিয়ান রিলিফ সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার সঙ্গেও শিশিরকুমারের যোগ ছিল।

দেশের শ্রী ফিরাইয়া আনিতে হইলে আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে কলকারখানা স্থাপন করা একান্ত আবশ্যক—শিশিরকুমার ইহা মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন। তিনি যশোহর অঞ্চলে চিনির কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। একটি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার জন্যও কিছুকাল উদ্যোগ আয়োজন করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোনোটিই তখন সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। স্বদেশী আন্দোলনকালে যাহাতে স্বদেশীদ্রব্য সুলভ হয় সেজন্য তিনি স্বদেশী বাজার স্থাপন করাইলেন। ইহাও দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় নাই।

পত্রিকা পরিচালনা ও সম্পাদনায় শিশিরকুমার অনুজ মতিলালকে প্রথমাবধিই শিক্ষিত করিয়া তোলেন। পরে অষ্টম দশকে তাঁহার যখন স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় তখন ভ্রাতার হস্তেই সমস্ত কার্য তিনি সঁপিয়া দেন। তবে পত্রিকায় তিনি প্রায়ই লিখিতেন এবং ইহার উন্নতি-চিন্তায় অনেক সময় যাপন করিতেন। ১৮৮৯ সনে কাশ্মীরের মহারাজার গদিচ্যুতি সম্পর্কে গোপনীয় কাগজপত্র প্রকাশ করিয়া পত্রিকা সরকারীমহলে বেশ একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। ইহাকে উপলক্ষ্য করিয়াই 'Official Secrets Act' বিধিবদ্ধ হয়। অমৃতবাজার পত্রিকা এতদিন সাপ্তাহিক ছিল। ১৮৯১ সনে বিবাহ-বিষয়ক সম্মতি আইন সম্বন্ধে আন্দোলনের সময় একখানা ইংরেজী দৈনিকের অভাব বিশেষ করিয়া অনুভূত হইলে পত্রিকা ১৮৯১ সনের ১৯শে ফেব্রুয়ারী প্রথম দৈনিক আকারে প্রকাশিত হইল। শিশিরকুমার যে এ-ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন তাহা সহজেই অনুমেয়।

১০

শিশিরকুমার পত্রিকা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট জীবন মুখ্যতঃ ধর্মালোচনায় অতিবাহিত করেন। তিনি প্রথমে ব্রাহ্মসমাজ ভক্ত

ছিলেন। অধ্যাত্ম-বিদ্যার (Spiritualism) চর্চায়ও প্রায় এইসময় হইতেই তাঁহাকে লিপ্ত দেখিতে পাই। শিশিরকুমার আজীবন ইহার চর্চা করিয়া গিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি *Hindu Spiritual Magazine* নামে অধ্যাত্ম-বিদ্যায় একখানি ইংরেজী মাসিকও প্রকাশ করেন। তিনি ক্রমে চৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের অনুরাগী হইয়া পড়েন। তিনি চৈতন্যদেবের জীবনী সম্বলিত বাংলা ভাষায় 'অমিয়নিমাই চরিত' (ছয় খণ্ডে) এবং ইংরেজী *Lord Gauranga* (দুই খণ্ডে) প্রণয়ন করেন। বৈষ্ণবধর্ম সম্পর্কে তিনি আরও বহু পুস্তক লেখেন, এ-বিষয়ে পত্রিকাদিও তিনি বাহির করিলেন। চৈতন্যদেবের জন্মতিথি অনুষ্ঠানের জন্য তিনি জনসভারও আয়োজন করিয়াছিলেন। আধুনিক যুগে শিক্ষিত সমাজেও যে চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের এত প্রভাব তাহা শিশির-কুমারের বৈষ্ণবধর্ম প্রচারেরই ফল বলা যাইতে পারে। তাঁহার লেখনী দ্বারা বাংলা সাহিত্যও বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়াছে।

শিশিরকুমার ১৯১১ সনের ১০ই জানুয়ারী ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁহার কর্মপ্রচেষ্টার ফল আমরা আজ ভোগ করিতেছি। শিশিরকুমারের কর্ম ও ধর্ম-জীবন ভারতবাসীর মনে দৃঢ় ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর পর কলিকাতায় যে স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে উদারনৈতিক মতাবলম্বী গোপালকৃষ্ণ গোখলে বলিয়াছিলেন,—

"What struck me most in him was the combination of deep spirituality with passionate patriotism and this combination produced another combination of two seemingly contradictory qualities —deep peace and great restlessness of mind and energy".

গোখলে মহোদয়ের মতে শিশিরকুমারের প্রগাঢ় দেশপ্রীতি এবং

গভীর অধ্যাত্মবোধ দুইয়ের অপূর্ব মিলন ঘটিয়াছিল। একদিকে তাঁহার কর্মতৎপরতা ও তজ্জনিত চাঞ্চল্য এবং অপর দিকে অপরিমেয় মানসিক শান্তি ঐকারণেই তাঁহার মধ্যে প্রচুর দেখিতে পাওয়া যাইত। শিশির-কুমারের দেশভক্তি, কর্মতৎপরতা এবং ধর্মবুদ্ধি ভারতবাসীকে প্রকৃত লক্ষ্যপথের সন্ধান দিয়াছে সন্দেহ নাই।

মনোমোহন ঘোষ

১

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে যেসব বঙ্গসন্তান শাসক জাতির নির্যাতন নিপীড়ন হইতে স্বদেশবাসীকে মুক্ত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, মনোমোহন ঘোষ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁহার কৃতকর্মে এইসময়কার জাতীয় ইতিহাস সমুজ্জ্বল। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রামগোপাল সান্যাল, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ মনস্বীগণ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে মনোমোহন ঘোষের গুণপনা ও কৃতিত্বের বিষয় নিজ নিজ পুস্তকে বিবৃত করিয়াছেন। এইসকল সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে পাঠক-পাঠিকারা তাঁহার সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করিয়া লইতে পারেন। সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা হইতেও ইদানীং আমরা তাঁহার সম্বন্ধে নানাকথা জানিতে পারিয়াছি।

মনোমোহন ঘোষ ঢাকা-বিক্রমপুরের অন্তর্গত বয়রাগাদি গ্রামে ১৮৪৪ সনের ১৩ই মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রামলোচন ঘোষ সেযুগের একজন কৃতী পুরুষ ছিলেন। তিনি যৌবনে রামমোহন রায়ের সংস্পর্শে আসেন এবং তখনকার প্রগতিমূলক কার্যাদির সঙ্গে যুক্ত হন। দ্বারকানাথ ঠাকুরও তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। সরকারী কর্মে লিপ্ত থাকিলেও তিনি স্বাধীন সত্ত্বা কখনও বিসর্জন দেন নাই। নানা জনকল্যাণকর কর্মে, বিশেষতঃ শিক্ষা-বিস্তার বিষয়ে তাঁহার গভীর মনোযোগ ছিল। ঢাকা স্কুল ও পরে ঢাকা কলেজের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার শেষ কর্মস্থল কৃষ্ণনগরে তিনি বাসভবন নির্মাণ করিয়া স্থায়ীভাবে বসতি করিতে আরম্ভ করেন। কৃষ্ণনগর কলেজ প্রতিষ্ঠায়ও তিনি বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন।*

---

* বর্তমান লেখকের 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' (দ্বিতীয় সংস্করণ) 'রামলোচন ঘোষ' অধ্যায় দ্রষ্টব্য

প্রথম পক্ষে সন্তানাদি না হওয়ায় রামলোচন প্রৌঢ় বয়সে দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করেন। মনোমোহন ঘোষ তাঁহার দ্বিতায় পক্ষের প্রথম সন্তান। তাঁহার অনুজ তুই ভ্রাতার মধ্যে লালমোহন ঘোষ সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি ১৯০৩ সনে কংগ্রেসের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। মনোমোহনের শৈশব ও কৈশোর কৃষ্ণনগরেই কাটে। তিনি ১৮৫০ সনে ছয় বৎসর বয়সে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। এই স্কুল হইতে ১৮৫৯ অব্দে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইলেন। ১৮৫৮–৫৯ সনের শিক্ষাবিষয়ক সরকারী বিবরণের পরিশিষ্ট অংশে 'সিনিয়র ও জুনিয়র বৃত্তির উপযুক্ত বলিয়া গণ্য' তালিকায় জুনিয়র বৃত্তির যোগ্য ছাত্রদের মধ্যে মনোমোহনের এইরূপ উল্লেখ পাই,—

List of candidates who attained the English Senior and Junior Scholarship standard, but for whom no Scholarship was available."

... ...

Junior

Monomohan Ghose, Kishnaghur Collegiate School. *

কলেজিয়েট স্কুল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া মনোমোহন কৃষ্ণনগর কলেজেই অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। তিনি অতি আদর-যত্নে লালিত পালিত হইলেও, পিতা রামলোচনের পরিচালনাগুণে শৈশব হইতেই পাঠে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ জন্মে। অল্পবয়সেই ইংরাজী ভাষা তিনি বিশেষভাবে আয়ত্ত করেন। ১৮৬০ সনে নীলের হাঙ্গামার সময়ে

* Cf. *Appendices to General Report on Public Instruction in the Provinces of the Bengal Presidency, for 1858-59.* Vol. II. Appendix C, p. 10.

মনোমোহন কলিকাতাস্থ বিভিন্ন ইংরেজী পত্রিকায় নীলকরদের অত্যাচার অনাচার সম্বন্ধে নিয়মিতভাবে সংবাদ প্রেরণ করিতে থাকেন। সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'হিন্দু পেট্রিয়টে' এই সম্পর্কে সংবাদ দিবার জন্য মনোমোহনকে কৃষ্ণনগরের বিশেষ সংবাদদাতা নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

২

কৃষ্ণনগরে প্রায় দুই বৎসর কাল অধ্যয়ন করিয়া মনোমোহন ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হইলেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুর-পরিবারের সঙ্গে রামলোচনের ঘনিষ্ঠতা অক্ষুণ্ণ ছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আলয়ে পুত্র মনোমোহনের থাকিবার ব্যবস্থা হইল। দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে মনোমোহন শীঘ্রই বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। অধীত বিদ্যায় মনোমোহনের ব্যুৎপত্তি, বিশেষতঃ ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার পাণ্ডিত্য অল্পকালের মধ্যেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। সত্যেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "একজন ইংরাজ মাষ্টার আমাদের পড়াতে আসতেন, তিনি মনোমোহনের সম্বন্ধে বলতেন, 'An old head on young shoulders'—যুবার ধড়ে বুড়ার মাথা।" *

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৬১ সনে অকালে ইহধাম ত্যাগ করেন। নীলকরদের অত্যাচার-অনাচারের কথা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করায় উহাদের কোপে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পতিত হয়, এবং সম্পাদক হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পরই ইহার নানারূপ বিপদ উপস্থিত হয়। মনোমোহন এইসময় একটি নূতন সংবাদপত্র প্রকাশে উদ্যোগী হইলেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র সতর বৎসর। দেবেন্দ্রনাথ গুণীমাত্রকেই বরাবর উৎসাহ দিতেন।

* 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস', পৃঃ ৫৮

কৃতী মনোমোহনের এই সাধু সংকল্প যাহাতে শীঘ্র কার্যে পরিণত হয় সে-উদ্দেশ্যে যথোপযুক্ত অর্থ সাহায্য করিতে তিনি সম্মত হইলেন। ১৮৬১ সনের ১লা আগস্ট দেবেন্দ্রনাথের অর্থে ও মনোমোহনের সম্পাদনায় 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকা প্রকাশিত হইল। কেশবচন্দ্র সেন তখন মহর্ষির দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। তিনি মনোমোহনকে পত্রিকা পরিচালনায় যথোচিত সহায়তা করিতে লাগিলেন। কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠতাতপুত্র পরবর্তীকালে 'ইণ্ডিয়ান মিররের' সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেনও ইহাতে লিখিতে আরম্ভ করেন। পূর্ববঙ্গে সম্পন্ন গৃহস্থদের দাসী ক্রয় করিয়া গৃহে রাখার প্রথা ছিল। এই প্রথার বিরুদ্ধে মনোমোহন 'মিররে' লেখনী ধারণ করেন। ইহার ফলে যে আন্দোলন উপস্থিত হয় তাহাতে এই প্রথা অচিরে উঠিয়া যায়। * ১৮৬২, মার্চ মাস পর্যন্ত মনোমোহন 'মিররের' সম্পাদকতা করেন। এইমাসে তিনি ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিলাত যাত্রা করিলেন। একটু পরেই এবিষয় বলিতেছি।

৩

১৮৫৩ সনের সনন্দে স্থির হয় যে, জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে ভারতীয় সিবিল সার্বিসে যোগ্য বিবেচিত হইলে সকলেই নিযুক্ত হইতে পারিবে। তখন ভারতবাসীদের পক্ষেও ইহার দ্বার উন্মুক্ত হয়। ১৮৫৮ সনে সংস্কৃত ও আরবী প্রত্যেকটির জন্য নির্দিষ্ট নম্বর ৩৭৫ বাড়াইয়া ৫০০ করা হইল। ভারতীয়দের সিবিল সার্বিসে প্রবেশে নানা অসুবিধা ছিল, তন্মধ্যে প্রধান অসুবিধা ছিল—সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া বিলাতে থাকিয়া পরীক্ষা দেওয়া। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন, রাজা রামমোহন রায় ও

* নববার্ষিকী, পৃঃ ২৪৪

দ্বারকানাথ ঠাকুর উভয়ই পর পর বিলাতে দেহরক্ষা করায় ভারতবাসীদের মনে এই সংস্কার দাঁড়াইয়াছিল যে, বিলাতে গেলে আর স্বদেশে ফিরিয়া আসা যাইবে না—"The land from whose bourne no traveller returns."* রামলোচনের এক পৌত্রীর মুখে শুনিয়াছি, এ-সংস্কারের বিরুদ্ধে তিনিই (রামলোচন) প্রথম দাঁড়ান এবং পুত্রকে বিলাত প্রেরণে উদ্যোগী হন। সত্যেন্দ্রনাথও বলেন যে, মনোমোহনের আগ্রহাতিশয্যেই তিনি ও মনোমোহন সিবিল সার্বিস পরীক্ষা দিবার জন্য একযোগে বিলাতযাত্রা করেন। মনোমোহন পিতার নিকট হইতে এই মনোভাবের অধিকারী হইয়াছিলেন নিঃসন্দেহ। পূর্বেই বলিয়াছি, দেবেন্দ্রনাথ সকল শুভকর্মের উৎসাহদাতা ছিলেন। তিনিও মনোমোহনের এই মনোভাবকে উৎসাহ দিয়া সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁহার বিলাত গমনের সকল রকম বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। মনোমোহন পিতার সম্মতি লইয়া সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে ১৮৬২, ২৩শে মার্চ কলিকাতা হইতে ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। সিংহলে পৌঁছিয়া মনোমোহন 'মেজদা' গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ৩১শে মার্চ তারিখে যে পত্র লেখেন তাহাতে আছে,—

"The parting between Sir Bartle and his wife reminded me forcibly of our parting scene of the morning of the 23rd March, when the shores of India receded from us, and you are all left behind. From that time we are all alone···S. N. T., and I am now again in the fair land of Ceylon, but all its gold is now turned into dust."†

মনোমোহন ও সত্যেন্দ্রনাথ লণ্ডনে পৌঁছিয়া প্রসন্নকুমার ঠাকুরের

* 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস,' পৃঃ ৫৯

† *The Calcutta Review, October* 1924, p. 119.

পুত্র ভারতের প্রথম ব্যারিস্টার খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী এবং সত্যেন্দ্রনাথের জ্ঞাতি জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের আতিথ্য স্বীকার করিলেন। সেখান হইতে অন্যত্র গমনান্তর কিরূপে সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় প্রস্তুত হইবার জন্য উভয়ে এক বৎসর অধ্যয়নে রত ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন।* এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সিবিল সার্বিস পরীক্ষা ১৮৬৩ সনের জুন মাসে যথারীতি গৃহীত হইল। এবারে এক শত উননব্বই জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম পঞ্চাশ জনকে সিবিল সার্বিসে গ্রহণ করা হয়। সফলকাম ব্যক্তিদিগের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ তেতাল্লিশের স্থান অধিকার করেন। মনোমোহন ঘোষ এবার উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। সত্যেন্দ্রনাথ ও মনোমোহন যখন ফ্রান্স পরিভ্রমণে রত তখন তাঁহারা এই সংবাদ পান।

মনোমোহন দমিবার পাত্র ছিলেন না। তিনি এই পরীক্ষার জন্য পুনরায় প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কিন্তু তলে তলে ইংরেজ কর্তৃপক্ষীয়েরা অন্যরূপ ব্যবস্থা করিতে তৎপর হইলেন। সিবিল সার্বিস এতদিন ইংরেজদের একচেটিয়া ছিল। সিবিল সার্বিস কর্মীমণ্ডলী দ্বারা ভারতবর্ষ প্রকৃত প্রস্তাবে শাসিত হইয়া থাকে। এই শাসক-গোষ্ঠিতে ভারতীয় প্রবেশের সরল অর্থ ভারত-শাসনে ভারতবাসীর ভাগ বসানো। ভারতবাসীরা তো এই উদ্দেশ্যেই বরাবর সিবিল সার্বিসে প্রবেশের জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলেন। এবারে যখন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ দেখিলেন যে, এতদিন তাঁহারা মুখে যেরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিতেছিলেন, একজন ভারতীয়ের সিবিল সার্বিসে প্রবেশে সত্যসত্যই তাহা কার্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে তখন তাঁহারা বাঁকিয়া বসিলেন। সিবিল সার্বিস পরীক্ষার কর্তা সিবিল সার্বিস কমিশনারগণ। আর কোনও ভারতবাসী যাহাতে শীঘ্র

* 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস', পৃঃ ৬০

এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারে এজন্য ১৮৬৩ সনের অক্টোবর মাসেই সংস্কৃত ও আরবীর প্রত্যেকটির নম্বর ৫০০ হইতে কমাইয়া পুনরায় ৩৭৫ করিয়া ফেলিলেন। ১৮৬৪ সনে মনোমোহন পরীক্ষা দিতে উপস্থিত হইয়া এইরূপ আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে দ্বিতীয় বারেও অকৃতকার্য হইলেন। ১৮৬৪ সনে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানের পরিমাপ আরও বাড়াইয়া দেওয়া হয়। পর বৎসর (১৮৬৫) পরীক্ষার্থীদের বয়স কমাইয়া বাইশ বৎসর স্থলে একুশ করা হইল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পূর্বে সিবিল সার্বিস পরীক্ষার্থীদের বয়স তেইশ বৎসর ছিল। ১৮৫৯ সনে ভারতবর্ষ হইতে সর্বপ্রথম একজন পার্শী এই পরীক্ষা দিবার জন্যই লণ্ডন গমন করেন। তিনি যখন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন তখন হঠাৎ বয়স কমাইয়া বাইশ করা হয়। তাঁহার বয়স তখন তেইশ বৎসর চলিতেছিল। কাজেই তাঁহার আর পরীক্ষা দেওয়া হইল না।

সিবিল সার্বিস কমিশনার বা পরীক্ষা-ব্যবস্থাপকদের হীন চক্রান্তের ফলে মনোমোহনের পক্ষে তৃতীয় বারেও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভবপর হইল না। তাঁহার পক্ষে লণ্ডন ইণ্ডিয়ান সোসাইটি—যাহা পরে ঈস্ট ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সঙ্গে মিলিত হয়—এইরূপ ব্যবহারের প্রতিবাদ করিয়া তৎকালীন ভারত-সচিবকে ইহার প্রতিকার করিতে অনুরোধ জানান। কিন্তু তাঁহাদের এ-অনুরোধে কোনও কাজ হইল না। ভারত-সচিব সোসাইটিকে জানাইলেন যে, সিবিল সার্বিস কমিশনারদের উপরে তাঁহার কোনও হাত নাই। এই ব্যাপার লইয়া দেশ-বিদেশে নানারূপ আলোচনা ও বিটিশ কর্তৃপক্ষের নিন্দাবাদ হয়। ভূদেব মুখোপাধ্যায় তৎসম্পাদিত পৌষ ১২৭২ সংখ্যক 'শিক্ষাদর্পণে' (ডিসেম্বর ১৮৬৫-জানুয়ারী ১৮৬৬) অন্যান্য কথার মধ্যে লিখিলেন,—

"এই শেষ বারে (১৮৬৫) যে তিনি উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না তাহার কারণ এই যে পরীক্ষার প্রণালী হঠাৎ পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে।

পূর্ব্বে দুই বৎসর সংস্কৃত ও আরবী ভাষায় পরীক্ষা দিলে যে প্রকার সংখ্যা পাওয়া যাইতে পারিত, এবারে তাহার অর্দ্ধেক মাত্র ঐ দুই ভাষায় পরীক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন পরীক্ষিতেরা যে কয়েক বিষয়ে পরীক্ষা দিয়াছিলেন তাহার প্রত্যেক বিষয় হইতে কিছু কিছু সংখ্যা (১২৫ করিয়া) বাদ দিয়া ধরা হইয়াছিল।

"যাহা হউক, এক্ষণে যে রকম নিয়ম দাঁড়াইল তাহাতে বোধ হয় না যে, এদেশীয় কোন ব্যক্তি আর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সিবিল সার্বিসে নিযুক্ত হইতে পারিবেন। বিলাতে না গেলে পরীক্ষা লওয়া হইবে না এই নিয়ম করাতেই ত এদেশীয় অনেক ব্যক্তিকে সিবিল সার্বিসের আশা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। বয়স ২১ বৎসরের অধিক হইলে পরীক্ষা লওয়া হইবে না, এ নিয়মটীও বিলক্ষণ প্রতিবন্ধকতা করিতেছিল। আবার পরীক্ষার প্রণালী এরূপে পরিবর্ত্তন করিবার নিয়ম থাকিলে আর কোন বাঙ্গালী সিবিল সার্বিসের পরীক্ষায় যাইতে সাহসিক হইবেন?"

মনোমোহন ঘোষও ভারতবাসীদের সিবিল সার্বিসে প্রবেশের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করিয়া ১৮৬৬ সনে লণ্ডন হইতে *The Open Competition for the Civil Service of India* শিরোনামে একখানি পুস্তিকা লেখেন। তখন ইহাতে ভারতীয়দের প্রবেশের বিরুদ্ধে যেসব যুক্তিতর্কের অবতারণা করা হইয়াছিল তাহারও সমুচিত উত্তর দিলেন। সিবিল সার্বিসে প্রবেশ করিতে হইলে ভারতবাসীকে অগ্রে ইউরোপীয় রীতিনীতি গ্রহণ করিয়া ইংরেজ বনিয়া যাইতে হইবে তখন এই যে ধুয়া উঠে তাহার উত্তরে মনোমোহন উক্ত পুস্তিকায় লেখেন,—

"We should regret nothing more than a system of false education which would impart to us all the vices of the European, extinguish in us every spark of sympathy for our own country and make us lose

all sense of duty towards ourselves....We are afraid that the tendency of English education in India has already been, to some extent, to deprive many of us of that sympathy for our countrymen which is at present so necessary for our regeneration, and to alienate us from all those ties which ought to bind us to our own country....Let us be Europeanised by all means, if that term means being more civilised but let us not lose that respect which we owe to our language, and our literature."*

৫

মনোমোহন ইহার পর সিবিল সার্বিসের আশা একেবারে ছাড়িয়া দিলেন। ব্যারিস্টারী সনদ লইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া ১৮৬৬ সনের জুন মাসেই তিনি ব্যারিস্টার-শ্রেণীভুক্ত হইলেন। মনোমোহন সেপ্টেম্বর মাসে বিলাত হইতে রওনা হন এবং পরবর্তী ১৫ই নবেম্বর স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নিছক চক্রান্তহেতু সিবিল সার্বিসে মনোমোহনের বার বার অকৃতকার্যতায় দেশবাসীরা তাঁহাকে একেবারে আপন করিয়া লইল। মনোমোহনও পরবর্তী জানুয়ারী মাসে (১৮৬৭) কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারী আরম্ভ করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রথম ভারতীয় ব্যারিস্টার হইলেও তিনি কখনও কোনও ভারতীয় আদালতে ব্যারিস্টারী করেন নাই। এবিষয়ে সুতরাং মনোমোহনকে পথ-প্রদর্শক বলা যাইতে পারে। মনোমোহন স্বীয়

* রামগোপাল সান্যাল কৃত '*General Biography of Bengal Celebrities both Living and Dead*' পুস্তকের ২১শ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত

ব্যবসা মারফত এবং অন্য নানাভাবে নিপীড়িত দেশবাসীর সেবায় 'তন্ মন' বিনিয়োগ করিলেন। মফস্বলের ইংরেজ হাকিম, ইংরেজ নীলকর, পুলিস প্রভৃতির হস্তে নির্যাতন ও অন্যায় অবিচারের আইনসঙ্গত উপায়ে প্রতিকারকল্পে মনোমোহন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

এই প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র বিরুদ্ধে যশোহর-ঝিনাইদহের মহকুমা-হাকিম রাইট সাহেব যে মানহানির মোকদ্দমা আনয়ন করেন 'পত্রিকা'র পক্ষে মনোমোহন কর্তৃক তাহার নিখুঁত পরিচালনা। যশোহরের আদালতে ও কলিকাতা হাইকোর্টে যখনই আবশ্যক হইয়াছে পত্রিকার সপক্ষে তিনি তখনই দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার সুষ্ঠু মোকদ্দমা পরিচালনা হেতু পত্রিকা-সম্পাদক এই মানহানির মোকদ্দমায় মুক্তিলাভ করেন। মনোমোহনকে শেষ মুহূর্তে এই মোকদ্দমার অন্যতম প্রতিবাদী রাজকৃষ্ণ মিত্রের পক্ষ অবলম্বন করিতে হয়, এবং তিনি তাঁহাকে খালাস করাইয়া আনিতে অপারগ হন। হাইকোর্টে আপীলের মামলায় রাজকৃষ্ণের এডভোকেট মনোমোহনের ত্রুটির কথা বলিলে 'অমৃত-বাজার পত্রিকা' (২০ মে, ১৮৬৯) নিম্নোক্ত ভাষায় উহার সমুচিত উত্তর দেন,—

"এই পত্রিকা সংক্রান্ত লাইবেল মকর্দ্দমার আপীলে পল সাহেব রাজকৃষ্ণ বাবুর পক্ষে উকীল ছিলেন। তিনি বক্তৃতা কালে মনোমোহন বাবুকে ইহাই বলিয়া নিন্দা করেন যে, নিম্ন আদালতে রাজকৃষ্ণবাবুর পক্ষ ভালরূপ সমর্থিত হয় নাই। পল সাহেব আপীলের উকীল, সেখানে আদিম মকর্দ্দমার উকীলের বিরুদ্ধে তিনি যদি দুটি পাঁচটি কথা বলিয়া থাকেন, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই, যেহেতু মোয়েক্কেলের সুবিধার্থ—ব্যবহারাজীবগণকে সচরাচর এরূপ করিতে দেখা যায়। প্রকৃতই মনোমোহন বাবু কতকগুলি ভুল করিয়া থাকিবেন, কিন্তু যে অবস্থায় তিনি রাজকৃষ্ণ বাবুর মকর্দ্দমা গ্রহণ করেন, সে অবস্থায়

তাঁহা অপেক্ষা শত গুণে উৎকৃষ্টতর ব্যারিষ্টারের ভুল করিবার সম্ভব ছিল।

"আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, এই লাইবেল মকর্দ্দমায় মনোমোহন বাবু যশোরে বিলক্ষণ সুখ্যাতি লইয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ তিনি সাক্ষীদিগকে যেরূপ সুন্দররূপে কূট প্রশ্ন করেন, তাহাতে তাঁহার ক্ষমতা বিশিষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছিল। এখানকার অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস যে, কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে যদি তিনি রাজকৃষ্ণ বাবুর মকর্দ্দমা সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখিতে পাইতেন, তবে তাঁহাকে তিনি মুক্ত করিয়া লইতে পারিতেন।"*

৬

এই সময়, ১৮৬৯ সনের মে মাসে মনোমোহন স্বয়ং পুলিসের হস্তে নির্যাতিত হন। হেয়ার স্কুলে এগার জন ছাত্র ও হেডমাস্টার গিরিশচন্দ্র দেবের নামে পুলিসে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট মিথ্যা করিয়া এক পুলিস-মারপিটের মামলা আনে। অভিযুক্তদের পক্ষে জ্যাকসন ও মনোমোহন ঘোষ ছিলেন ব্যারিস্টার। এই মোকদ্দমায় কলিকাতায় বিশেষ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় এবং আদালতে খুব ভিড় জমে। কিন্তু মামলার রায় বাহির হইবার পূর্ব হইতেই দর্শকদের উপর ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে পুলিস ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করে। যখন সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে আসামীগণকে হাকিম খালাস দিলেন তখন পুলিসের উৎপাত আরও বাড়িয়া গেল এবং দর্শকদের উপর গালাগালি ও মারপিট বেশী করিয়া শুরু করিয়া দিল।

"কিন্তু বাবু মনোমোহন ঘোষকে মারপিট করিয়া পুলিস চূড়ান্ত বাহবা লইয়াছে। আসামীগণ খালাস পাইলে কাছারীতে ভারি গোল

*এই প্রসঙ্গে কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবন', ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৬-৯ দ্রষ্টব্য

হইয়া উঠিল। প্রহরীগণ এই সুযোগে দর্শকদিগকে ভয়ানক গালিগালাজ ও মারপিট করিতেছিল। কয়েকজন চৌকিদার মনোমোহন বাবুর একটি বন্ধুকে অতি অশ্লীল ভাবে গালি দিতেছে দেখিয়া তিনি তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া তাহারা আরও বাড়িয়া উঠিল। মনোমোহন বাবু ইহাদের চাপরাসের নম্বর টুকিয়া লইলেন। ইতিমধ্যে হার্ণস নামক একজন কনষ্টবল আসিয়া বলিল তিনি কি করিতেছেন। তিনি বলিলেন চৌকিদারদের নামে সমনের প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত তিনি চাপরাসের নম্বর লইতেছেন। হার্ণস বলিল, তুমি এখান হইতে যদি না যাও তবে এক চড়ে তোমার গাল ভাঙ্গিয়া দিব এবং ইহা বলিয়াই তাহার চোখে এক ঘুষি মারিল। শুনিলাম এই আঘাতে তিনি সেখানে অজ্ঞান হইয়া পড়েন। তাহার বন্ধু ও অপর আর একজন ভদ্রলোককে গারদে নিয়া পুরিল। মনোমোহন বাবু তখনই পুলিস কমিশনারের নিকট গমন করেন। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, কক্রেল সাহেব তখনই উপযুক্ত উপায় সকল অবলম্বন করিয়াছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট রবার্টস সাহেবের নিকট মনোমোহন বাবুর মকর্দ্দমা উপস্থিত হইয়াছে।"*

প্রারম্ভিক সাক্ষ্য প্রমাণের পর ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মোকদ্দমা দায়রায় সোপর্দ করিলেন। হাইকোর্টে বিচারপতি মার্কবির এজলাসে ২১শে জুন (১৮৬৯) ইহার শেষ বিচার হইল। সাক্ষ্য প্রমাণ ও বিচারপতির বক্তৃতাদি হইতে উপস্থিত সকলেই বুঝিয়াছিলেন মামলায় হার্নসের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ইংরেজ জুরীগণ একবাক্যে তাহাকে 'নট গিলটি' বলিল, বিচারপতি মার্কবিও তাঁহাদের মতে মত দিয়া উহাকে খালাস দিলেন। ২৪ জুন ১৮৬৯ তারিখের 'অমৃতবাজার পত্রিকা' এই সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন তাহার কিয়দংশ এই,—

---

*অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৭শে মে ১৮৬৯

"এই মহাত্মাদিগের অদ্ভুত বিচারের পরিচয় যে এই প্রথম পাওয়া গেল, এরূপ নয়। যে সকল সাদা সম্পাদকেরা এদেশীয় জুরীদিগের এক কি দুই স্থলে অসংগত বিচার দেখিয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল চীৎকার ধ্বনিতে পূর্ণ করেন তাহারা এই শ্বেতকান্তি মহাত্মাদিগের বিচার দেখিয়া কি মনে করিতেছেন? যদি জুরী প্রণালী এদেশে রাখিতে হয়, তবে যাহাতে সচ্চরিত্র বুদ্ধিমান লোক—কি এদেশীয় কি ইউরোপীয় উহাতে প্রবেশ করেন, তাহার চেষ্টা করা হউক, নচেৎ যত শীঘ্র এই প্রণালীর অন্তর্দ্ধান হয়, ততই মঙ্গল। প্রস্তাবিত অন্যায় বিচারের কত দূর অনিষ্ট ফল হইয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? অত্যাচারী পুলিশকে প্রশ্রয় দেওয়া হইল। যদি অন্যায় করিতে পূর্ব্বে তাহাদের কিছুমাত্র আশঙ্কা ছিল এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ লোপপ্রাপ্তি হইল। যাঁহারা ন্যায়ের জন্য বিচারালয়ের আশ্রয় লইল, তাঁহাদিগকে হতাশ্বাস করা হইল। জাতিবৈর আরো বদ্ধমূল হইল। ইংরাজ শাসন ও নিরপেক্ষ বিচারের উপর লোকের শিথিল বিশ্বাস হইল। আমরা বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করি, এই মকর্দ্দমাটি আগাগোড়া তদন্ত করিবার নিমিত্ত একটি উপযুক্ত কমিটি নিযুক্ত করা হউক, তখন দেখিতে পাইবেন, কতই বিস্ময়কর ব্যাপার বাহির হইয়া পড়িয়াছে।"

পুলিসের হস্তে অহেতুক নির্যাতন এবং বিচারের প্রহসন মনোমোহনকে কিছুমাত্র দমাইতে পারিল না। পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতবাসীদের মধ্যে তিনিই ব্যারিস্টার-রূপে প্রথম ভারতীয় আদালতে ব্যবসা আরম্ভ করেন। একমাত্র ভারতীয় বলিয়া তিনি প্রথম প্রথম স্বব্যবসায়ী ইংরেজদের কতকটা কোপে পড়িলেন বটে, কিন্তু নিজ শক্তিবলে অনতিকালমধ্যে তিনি তাহা কাটাইয়া উঠিলেন। স্বব্যবসায়ীরা এবং হাইকোর্টের বিচারপতিরা মনোমোহনের পাণ্ডিত্যে এবং আইনের কূট বিতর্কে ক্রমেই বিমোহিত হইতে লাগিলেন। রানী বনাম আমিরুদ্দিনের

আপীল মোকদ্দমায় মনোমোহন আসামী আমিরুদ্দিনের পক্ষ সমর্থন করেন। আমিরুদ্দিন ওহাবী মামলায় জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই আপীল মোকদ্দমা বিচারপতি নর্ম্যান ও বেলির এজলাসে হইয়াছিল। মনোমোহন এই মকদ্দমায় হারিয়া যান। কিন্তু বিচারপতি নর্ম্যান তাঁহার গভীর আইনজ্ঞান এবং মোকদ্দমা পরিচালনা-সৌকর্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। মনোমোহনের খ্যাতি-প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল। ক্রমে তিনি মফস্বলের বিভিন্ন জটিল মোকদ্দমা পরিচালনার ভার লইতে শুরু করিলেন। কিন্তু এ-বিষয় বলিবার পূর্বে তাঁহার এই সময়কার অন্য জনহিতকর কার্য সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে।

৭

ভারত শাসনে ভারতবাসীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে সিবিল সার্বিসে ভারতীয়দের প্রবেশ অত্যাবশ্যক একথা মনোমোহন মর্মে মর্মে বিশ্বাস করিতেন। নিজে অকৃতকার্য হইলেও ভারতীয় যুবকগণ যাহাতে এদিকে আকৃষ্ট হয় তাহার জন্য তাহাদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে ব্যারিস্টারী আরম্ভ করিবার পরই একটি ফণ্ড গঠনের প্রস্তাব করেন, কিন্তু তখন তিনি ইহা কার্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। ১৮৬৯ সনে তিনি অনুজ লালমোহন ঘোষকে সিবিল সার্বিস পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাত পাঠান। পরে ভারত-সভা প্রতিষ্ঠিত (১৮৭৬) হইলে যখন সিবিল সার্বিসে ভারতীয় নিয়োগ সম্পর্কে আন্দোলন উপস্থিত হয় তখন তিনি ইহাতে কায়মনে যোগ দিয়াছিলেন। ভারত-সভা কর্তৃক অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় তিনি ভারতবাসীদের সিবিল সার্বিসে প্রবেশের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়া একটি সুচিন্তিত বক্তৃতা প্রদান করেন।

ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, এককথায় ভারতবর্ষের

নিজস্ব যাহা কিছু সে সকলের প্রতি মনোমোহনের গভীর অনুরাগ ছিল বটে কিন্তু এগুলির উন্নতিকল্পে প্রচলিত প্রথার বিরোধী কোনরূপ পন্থা অবলম্বন করিতেও তিনি কখন পশ্চাৎপদ হন নাই। স্ত্রীশিক্ষার তিনি সবিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষা দানের পূর্ব-বৎসর ১৮৫৮ সনে টাকি শ্রীপুরের রায়-বংশের কন্যা স্বর্ণলতার সঙ্গে মনোমোহন বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি পত্নী স্বর্ণলতাকে যথোপযুক্ত শিক্ষাদানের জন্য লরেটো কন্‌ভেণ্টে রাখিয়াছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, "এই সময়ে তাঁহার যে সংযম, মিতাচার ও স্বকর্ত্তব্যসাধনে দৃঢ়মতি দেখা গিয়াছিল, তাহা অতীব প্রশংসনীয়। কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের মুখে ঘোষজ মহাশয়ের এই সময়কার সাধুতা ও সত্যনিষ্ঠার ভূয়সী প্রশংসা শুনিয়াছি।" *

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ফরিদপুর জেলার লোনসিংহ হইতে ১৮৬৯, ২২শে মে (১০ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৬) 'অবলাবান্ধব' নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত করেন। নারী-জাতির উন্নতি ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রদ বহু বিষয়ের আলোচনা এই পত্রিকাখানিতে থাকিত। দ্বারকানাথ লিখিয়াছেন যে, এই পত্রিকাখানি প্রচারিত হইলে মনোমোহন তাঁহাকে ইহা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনার অনেক প্রকার পরামর্শ দান করেন। তিনি শুধু উপদেশ বা পরামর্শ দিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, একবার অর্থের অসচ্ছলতা উপস্থিত হইলে কিছুকাল ইহা প্রকাশের ব্যয়ভার তিনি স্বয়ং বহন করেন।†

কুমারী এক্রয়েড (পরে মিসেস বেভারিজ) কলিকাতায় আসিয়া মনোমোহনের গৃহে আশ্রয় লন এবং এখানে এক বৎসরকাল অবস্থান

---

* 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ,' ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৩৪৮

† নববার্ষিকী, পৃঃ ২৪৫।

করেন। নারীদের উন্নতিবিধায়ক একটি সুষ্ঠু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা কুমারী এক্রয়েডের উদ্দেশ্য ছিল। তিনি এখানে বসিয়া সমাজের অগ্রণী ও মান্যগণ্য ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শাদি চালাইতেন। তিনি কতকটা মেজাজী ছিলেন। রাজনারায়ণ বসু মনোমোহনের ভবনে তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলে কিরূপে তাঁহার সঙ্গে প্রথমে বিতর্ক এবং পরে কলহ উপস্থিত হয় রাজনারায়ণের আত্ম-চরিতে তাহার একটি বর্ণনা আছে। যাহা হউক, আলাপ-আলোচনা ও অর্থসংগ্রহাদির পর ১৮৭৩ সনের ১৮ই নবেম্বর এক্রয়েড হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন। ২৮শে নবেম্বর ১৮৭৩ সংখ্যায় 'ভারত সংস্কারক' (সাপ্তাহিক) হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"গত বারের পূর্ব্ব মঙ্গলবার মিস এক্রয়েডের বিদ্যালয় খুলিয়াছে। আপাততঃ পাঁচটী ছাত্রী সংগৃহীত হইয়াছে, শিক্ষার বন্দোবস্ত শীঘ্রই হইবে। আমরা আশা করি বিদ্যালয়টির নাম যখন হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় হইয়াছে, ইহার সকল ব্যবস্থা তদনুযায়ী হইবে, তাহা হইলে ছাত্রীর অভাব অপূর্ণ থাকিবে না।"

বলাবাহুল্য, এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় মনোমোহন বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি ইহার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক হন।

শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন যে, নারীদের উচ্চশিক্ষা দান সম্পর্কে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদের মধ্যে ১৮৭২ সনে যখন বিতর্ক উপস্থিত হয় তখন মনোমোহন নারীদের উচ্চশিক্ষায় পক্ষপাতীদের সমর্থন করেন।* কুমারী এক্রয়েডের বিবাহ (১৮৭৫) হইলে হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় উঠিয়া যায়। পরে ১৮৭৬, জুন মাসে বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। উচ্চশিক্ষার পক্ষপাতী ব্রাহ্মগণ—আনন্দমোহন বসু, দুর্গামোহন দাস প্রভৃতি ইহার

---

* রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', ২য় সংস্করণ পৃঃ ৩৪৮-৯

পরিচালক হইলেন। মনোমোহন ইহার একজন কর্মকর্তা হন। তিনি ১৮৭৩ সনে বেথুন স্কুলের (পরে, স্কুল ও কলেজ) সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হন।* মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এইপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

৮

মানহানির মোকদ্দমা উপলক্ষে ১৮৬৯ সনেই 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সঙ্গে মনোমোহন ঘোষের ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয়। পত্রিকা ইহার পর ১৮৭১ সনের শেষে কলিকাতায় উঠিয়া আসে। সম্পাদক শিশিরকুমার পত্রিকা মারফত রাষ্ট্রীয় বিষয়সমূহের আলোচনার জন্য বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে রাজনৈতিক সভা এবং কলিকাতায় একটি কেন্দ্রীয় সমিতি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আন্দোলন উত্থাপন করেন। ১৮৭৫ সনে তিনি কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান লীগ নামে একটি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় সমিতি স্থাপন করিলেন, মনোমোহনও ইহার সঙ্গে যুক্ত হইলেন। কিন্তু ইহার পদ্ধতি লইয়া কর্ম-কর্তাদের মধ্যে মতান্তর উপস্থিত হয়। এই মতান্তর ক্রমে বিচ্ছেদে পরিণত হইয়া ১৮৭৬ সনে ২৬শে জুলাই 'ভারত-সভা' বা 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার প্রধান উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু ও শিবনাথ শাস্ত্রী। এই নূতন সভার সঙ্গে মনোমোহনেরও যে বিশেষ যোগ ছিল তাহা

---

* 'বামাবোধিনী পত্রিকা'র (বৈশাখ ১৮৮০) ইংরেজী অংশে এ-সম্বন্ধে এই সংবাদটি বাহির হয়—"A Committee composed of the Hon'ble J. B Phear, *President*, Raja Kali Krishna Bahadur, Babu Peary Churn Sircar, Mr. W. C. Bonnerji and Mr. M. Ghose, *Secretary*, has been appointed by the Lieutenant Governor to take charge of the Bethune School"

শিবনাথের এই উক্তি হইতে জানা যাইতেছে, "১৮৭৬ সালে ভারত-সভা যখন স্থাপিত হইল, তখন তিনি ইহার একজন প্রধান পরামর্শদাতা হইলেন ; তাঁহার ভবন ইহার প্রতিষ্ঠাতাদিগের সম্মিলনের ক্ষেত্র হইল ; এবং তিনি ইহার কার্য্যনির্ব্বাহ বিষয়ে ইহার কর্ম্মচারীদিগকে সাহায্য করিতে লাগিলেন।"* মনোমোহন যে ভারত-সভার কার্যনির্বাহক সভার একজন সদস্য ছিলেন তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন।

মনোমোহন কলিকাতায় ও মফস্বলে ফৌজদারী মামলা পরিচালনা করিতে যাইয়া একটি বিষয় বড়ই উপলব্ধি করিতে থাকেন এবং সেই বিষয়টি লইয়া কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর হইতেই ইহার মারফত আন্দোলন করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু একথা বলিবার পূর্বে তাঁহার পরিচালিত কতকগুলি প্রধান মোকদ্দমার কথা এখানে উল্লেখ করা যাক। অমৃতবাজার পত্রিকার বিরুদ্ধে লাইবেল মোকদ্দমা ও রানী বনাম আমীরুদ্দিনের মামলা সম্বন্ধে আমরা জানিয়াছি। চট্টগ্রামে লালচাঁদ চৌধুরীর মামলা, ফেনুয়া মামলা, সাহাপুর হত্যা মামলা, নদীয়া ছাত্র মামলা, রংপুর ডিয়ার মোকদ্দমা, জামালপুর মেলা সম্পর্কিত মামলা, মুলুকচাঁদ চৌকিদারের মোকদ্দমা, লোকনাথপুর মামলা প্রভৃতি কতকগুলি বিখ্যাত মোকদ্দমা মনোমোহন পরিচালনা করেন। রামগোপাল সান্যাল মহাশয় *History of Criminal Cases* পুস্তকে এইসব মোকদ্দমার বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। এইসকল মামলা হইতে কতকগুলি বিষয় সুস্পষ্ট হইয়া যায়। মফস্বলে ইংরেজ হাকিম, ইংরেজ নীলকর ও অন্যান্য ব্যবসায়ী, ইংরেজ সিবিলিয়ানের পোঁ-ধরা দেশী ও বিলাতী পুলিস, আমলা ও অন্যান্য সরকারী কর্মচারী—ইহাদের দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে বীভৎসরকমের অত্যাচার-অনাচার সংঘটিত হইয়া চলিয়াছে। লোকনাথ-

* 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', পৃ ২য় সংস্করণ, ঃ ৩৪৯।

পুর মোকদ্দমায় হত্যাকারী সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়ায় সংবাদদাতাদেরই কঠোর দণ্ড হইবার উপক্রম হয়। মনোমোহনের মোকদ্দমা-পরিচালনা কৌশলে সত্য ঘটনা বাহির হইয়া পড়ে এবং সংবাদদাতারা মুক্তিলাভ করে। যেখানে ইংরেজ অপরাধী ও এদেশীয় ফরিয়াদি সেখানে সুবিচারের আশামাত্র ছিল না। মিথ্যা সাক্ষী, জাল দলিল, প্রবল পক্ষের হুমকি ও হয়রানি—ইহাতে নিরীহ গরীব প্রজাদের টিকিয়া থাকাই দায় হইত। ইহাদের সমর্থন করিতে গেলে মফস্বলের উকীল, মোক্তার ও মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদেরও দুর্গতির একশেষ হইত। যেসব মামলায় সরকারা বাদী তাহাতে যিনিই শাসক, তিনিই বিচারক। যিনি ফরিয়াদি, তিনিই বিচারাসনে উপবিষ্ট, ইহার ফলেও বিচারে অনাচার অহরহ অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। বিচারকের জাতভাইয়েরাও কোনও মামলায় ফরিয়াদী হইলে প্রতিপক্ষের আর উদ্ধারের উপায় ছিল না। মনোমোহন দেখিলেন, এইরকম বিচারগত অনাচার দূর করিতে হইলে সর্বাগ্রে শাসন ও বিচার বিভাগকে স্বতন্ত্র করা প্রয়োজন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বেই নেতৃবর্গ এসম্বন্ধে অবহিত হইয়াছিলেন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর দ্বিতীয় অধিবেশন হইতে ইহার প্রথম দিককার প্রতিটি অধিবেশনে এসম্বন্ধে সরকার কর্তৃক কার্যকরী পন্থা অবলম্বনের দাবি জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হইত। আর ইহার মূলে ছিলেন মনোমোহন ঘোষ মহাশয়।

৯

ভারতবর্ষের পক্ষে প্রচারকার্য চালাইবার জন্য মনোমোহন ১৮৮৫ সনে ইংলণ্ড গমন করেন। ১৮৮৬ সনে কলিকাতা অধিবেশন হইতেই কংগ্রেসে শাসন ও বিচার বিভাগ স্বতন্ত্রীকরণ সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত

হইতে থাকে। আর মানোমোহন অত্যধিক উৎসাহ সহকারে ইহার আলোচনা শুরু করেন। কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁহার যে এত ঘনিষ্ঠতা জন্মে তাহার মূলেও ছিল এই বিষয়টি। ১৮৮৬ সনে দ্বিতীয় অধিবেশনে কংগ্রেস এসম্বন্ধে যে প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন তাহা এই,—

"This Congress do place on record an expression of the universal conviction that a complete separation of executive and judicial functions (such that in no case the two functions shall be combined in the same officer) has become an urgent necessity, and that in its opinion it behoves the Government to effect this separation without further delay, even though this should in some provinces, involve some extra expenditure."*

মনোমোহন ঘোষ পুরোভাগে না আসিলেও সর্বদা জাতীয় কংগ্রেসের অনুবর্তী হইয়া কাজ করিতেন। ১৮৯০ সনে কলিকাতা অধিবেশনে তিনি কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন। ১৮৯৫ সনে কংগ্রেসের একাদশ (পুণা) অধিবেশনে মনোমোহন স্বয়ং শাসন ও বিচার বিভাগ স্বতন্ত্রীকরণ সম্পর্কে প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং চিমনলাল শীতলবাদ তাহা সমর্থন করেন। প্রস্তাবটি সংক্ষিপ্ত হইলেও মূলকথা সবই ইহাতে আছে,—

"That this Congress again appeals to the Government of India and the Secretary of State to take practical steps for the purpose of carrying out the separation of Judicial from Executive functions in the administration of justce,"‡

* *How India Wrought for Freedom*, by Annie Besant P. 33.

† ঐ, পৃঃ ২২৩

মনোমোহন ১৮৮৭, ১৮৯০ এবং ১৮৯৫ সনে কংগ্রেসের পক্ষে প্রচার কার্য পরিচালনার জন্য ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। স্বদেশের সেবায় তিনি আর অধিক দিন নিরত থাকিতে পারেন নাই। মনোমোহন ঘোষের অপূর্ব মাতৃভক্তি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। এত কার্যের মধ্যেও তিনি প্রতি বৎসর পূজার ছুটিতে কৃষ্ণনগরে গিয়া মাতার সঙ্গে কিছুদিন বাস করিতেন। ১৮৯৬ সনের অক্টোবর মাসে ছুটির সময় তিনি মাতৃদর্শনার্থে কৃষ্ণনগরে যান। সেখানেই তিনি ১৭ই অক্টোবর তারিখে মাথায় রক্ত উঠিয়া অচৈতন্য হইয়া পড়েন এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কংগ্রেসের পরবর্তী ১৮৯৬ সনের কলিকাতা অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নিজ অভিভাষণে মনোমোহনের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন।

১০

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সঙ্গে মনোমোহনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা এখন পর্যন্ত কিছু বলা হয় নাই। প্রাদেশিক সম্মেলন ১৮৮৮ সনে কলিকাতায় ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের সভাপতিত্বে প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। ইহার পর প্রায় প্রতিবৎসর কলিকাতায় সম্মেলন হইত। কিন্তু মুখ্যতঃ বাংলার সমস্যা আলোচনার জন্যই এই সম্মেলন, সুতরাং বিভিন্ন মফস্বল শহরেও ইহা অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। ১৮৯৫ সনে বহরমপুরে বৈকুণ্ঠনাথ সেনের উদ্যোগে সম্মেলনের অধিবেশন হইল। পরবর্তী অধিবেশন হয় ১৮৯৬ সনে কৃষ্ণনগরে। মনোমোহন ঘোষ এই অধিবেশনের প্রধান উদ্যোক্তা ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। পরবর্তী অধিবেশন হয় রাজশাহীর অন্তর্গত নাটোর শহরে। এবারকার সভাপতি ছিলেন মনোমোহন ঘোষের বিশিষ্ট বন্ধু সদ্য অবসরপ্রাপ্ত

সিবিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সত্যেন্দ্রনাথ অভিভাষণে পরলোকগত বন্ধু মনোমোহন সম্বন্ধে যে সারগর্ভ উক্তি করেন তাহা উদ্ধৃত করিতেছি,—

"The life and soul of the last Conference [held at Krishnagar in 1896 was my friend, the late lamented Manomohan Ghose. He acted as Chairman of the Reception Committee, and I dare say, you will remember his princely hospitality and the cordiality of his reception. Who could have guessed that he would pass away before the opening of this Conference ? You all must miss his genial presence in this hall. He would have been a tower of strength to the present Conference ; and we cannot sufficiently deplore the loss of his great learning and experience, his sound judgement and strong common sense, and skilful guidance as a political leader. But it is not only as a sound politician that we deplore his loss. He was a man of many-sided activity and liberal sympathies. He led an exemplary life in his domestic circle. The helpless and indigent ever found in him a generous patron, the oppressed and downtrodden a ready champion of their cause. I shall not dwell on the personal friendship which makes his loss more than a public grief to me. He it was who originally started the project of our going on a pilgrimage to England. This was more than 35 years ago. To him, indeed, we owe the idea, which has since proved so fruitful, of competing with Englishmen

in England for entry into the charmed circle of the Indian Civil Service. By his death the country has sustained a loss which it will not be easy to repair."*

মনোমোহনের অকৃত্রিম দেশভক্তির পরিচয় আমরা তাঁহার বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে পাই। তিনি দীনের বন্ধু, অত্যাচারিত-নিপীড়িতের সহায় ছিলেন। বিনা পারিশ্রমিকে কত কঠিন মোকদ্দমা তিনি পরিচালনা করিয়াছেন, কত লোককে ফাঁসির মঞ্চ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। বিচারের অনাচার দূরীকরণে মনোমোহনের চেষ্টার অন্ত ছিল না। দেশবাসী তাঁহার কৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া আজ ধন্য হইতেছে।

---

*_The Amrita Bazar Patrika_, June 11. 1897.

আনন্দমোহন বসু

আদর্শচরিত্র, নির্মলবুদ্ধি, স্বদেশগতপ্রাণ আনন্দমোহন বসু ১৯০৬ সনের ২০শে আগস্ট ইহলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার জীবিতকালে ভারতবর্ষ তথা বঙ্গদেশ বহু বিপদ-আপদের সম্মুখীন হইয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শ-সংঘাতের ফলে ঐসময়ে যে অমৃত ও হলাহল যুগপৎ উত্থিত হইয়াছিল, তাহা আজ সর্বজনবিদিত। আনন্দমোহন নীলকণ্ঠের মত হলাহল পান করিয়া অমৃতটুকু নিঃশেষে স্বদেশীয়দের মধ্যে বিলাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি সমসাময়িক বহু স্বদেশকর্মীর মত দীর্ঘজীবী হইতে পারেন নাই। ইহার একটি প্রধান কারণ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই তিনি স্বদেশের জন্য কঠোর চিন্তা ও কর্মে নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। যে ঐহিক কাঠামো আমাদের জীবনীশক্তি ধারণ করিয়া আছে, তাহার যত্ন লইতে তিনি অবসরমাত্র পান নাই। আনন্দমোহনের মনে আঞ্চলিক বা শ্রেণীগত স্বার্থ স্থান পাইত না। সমগ্র বাংলা ও বাঙালী, আর ব্যাপকতরভাবে বলিতে গেলে সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী অনুক্ষণ তাঁহার দেহ মন জুড়িয়া ছিল। তাঁহার মুখনিঃসৃত বাণী ভাবী-কালের পথের নির্দেশ দিত। আত্মনির্ভরতা সর্বপ্রকার উন্নতির আকর ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের প্রধান শিক্ষা। তাই আমরা এখনও তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া ধন্য।

আনন্দমোহন ময়মনসিংহ জেলার জয়সিদ্ধি গ্রামে ১৮৪৭ সনের ২৩শে সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। পিতা পদ্মলোচন বসু ময়মনসিংহ জেলা শহরে রাজসরকারে কর্ম করিতেন। তিনি সেখানে নিজ বাসভবনে আনন্দমোহনকে লইয়া আসেন ও হার্ডিঞ্জ বাংলা বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়া দেন। আনন্দমোহন এখানকার পাঠ সমাপনান্তে নয় বৎসর

বয়সে পরীক্ষায় চারি টাকা সরকারী বৃত্তি লাভ করেন। পদ্মলোচন ইহার পর পুত্রকে জেলা স্কুলে প্রেরণ করিলেন। তখন জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর পিতা পরবর্তীকালের বিখ্যাত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয়। তিনি ১৮৫৮ সনের ২৩শে সেপ্টেম্বর শেষোক্ত পদে নিয়োজিত হইলে উমাচরণ দাস স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইলেন। আনন্দমোহন যোগ্য শিক্ষাব্রতীর শিক্ষায় ও উপদেশে স্বীয় জীবন নিয়ন্ত্রণের সুযোগ কৈশোরেই প্রাপ্ত হন। ১৮৬২ সনে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে নবম স্থান অধিকার করেন। পরীক্ষার অল্পকাল পূর্বে আনন্দমোহনের পিতৃবিয়োগ হওয়ায় পাঠে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে, নতুবা তাঁহার মত মেধাবী ছাত্র অনায়াসে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করিতে পারিতেন।

আনন্দমোহনের মাতা উমাকিশোরী কর্মকুশলী, তেজস্বিনী ও অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিলেন। পদ্মলোচনের মৃত্যুর পর তিনি স্বহস্তে বিষয়-আশয় পরিচালন ও পরিবার প্রতিপালনের ভার লইলেন। আনন্দমোহনের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেও তিনি পশ্চাৎপদ হইলেন না। পুত্রকে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য কলিকাতায় পাঠাইলেন। আনন্দমোহন কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন এবং সেখান হইতে ১৮৬৪ সনে এফ. এ. এবং ১৮৬৭ সনে বি. এ. অনার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। প্রত্যেক পরীক্ষায়ই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করেন। ১৮৬৭ সনের ৯ই মার্চ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার সার হেনরি সামনার মেন সমাবর্তন উৎসবকালে নিজ বক্তৃতায় আনন্দমোহনের কৃতিত্বের উল্লেখ করিয়া বলেন ঃ

"Probably the Cambridge standard of Mathematics is the highest in the world. The Senior

Wrangler, for his years, (a qualification which of course it is necessary to make), is probably the most accomplished mathematician in Europe. Now I have it on the authority of the Examiner, who did not himself fall far short of the highest Cambridge standard, that our first Bachelor of Arts, who obtained the first of the new scholarships, would, if he had continued his course of studies a little longer have come very near to the level of the Senior Wrangler."*

মেন সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী যে ঠিক হইয়াছিল, তাহা আমরা পরে দেখিতে পাইব। এক বৎসর পরে, ১৮৬৮ সনে এম. এ. পরীক্ষায় আনন্দমোহন গণিতে প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হন। অঙ্ক শাস্ত্রে তিনি এত ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন যে তাহা দেখিয়া তাঁহার অধ্যাপকগণও বিস্মিত হইয়া যান।

এম. এ. উপাধি লাভের অব্যবহিত পরেই আনন্দমোহন প্রেসিডেন্সী কলেজের ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে প্রতিনিধি-অধ্যাপকের পদে নিয়োজিত হইলেন। ১৮৭০ সনে বিলাত যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত তিনি এইপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইতিমধ্যেই ১৮৬৯ সনে আনন্দমোহন প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করিলেন। ইহার পূর্ব বৎসর হইতেই মাত্র এই বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা হয়। প্রথম বৃত্তিধারী ছিলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নামক একজন মেধাবী যুবক। বিখ্যাত গণিতবিদ্ গৌরীশঙ্কর দে আনন্দ-মোহনের প্রতিযোগী ছিলেন। তিনি ঐ বৎসর অকৃতকার্য হইলেও পর বৎসর ১৮৭০ সনে এই বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন।

---

* University of Calcutta convocation Addresses, Vol. I, p. p. 160—61

পূর্বেই আমরা ভগবানচন্দ্র বসুর কথা উল্লেখ করিয়াছি। বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর ১৮৬৭ সনের জুলাই (বাংলা শ্রাবণ) মাসে আনন্দমোহন তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বর্ণপ্রভা বসুর সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। স্বর্ণপ্রভা ছিলেন আনন্দমোহনের যোগ্যা সহধর্মিণী। দেশোন্নতিমূলক বিভিন্ন কার্যে তিনি স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন। কিন্তু এখানেই তাঁহার কর্তব্য শেষ হয় নাই। তিনি নিজেও নানা বিষয়ে অগ্রণী হইয়া কার্য করিতেন। নারীজাতির উন্নতিবিধায়ক কার্যে তিনি তৎপর ছিলেন। বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তিনি স্বামীর সহায়ক ছিলেন। বঙ্গমহিলা সমাজ প্রধানতঃ তাঁহারই উদ্যোগে ১লা আগস্ট ১৮৭৯ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিখ্যাত নারীহিতৈষী উমেশচন্দ্র দত্তের মৃত্যু হইলে তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষাকল্পে এবং তাঁহার সম্পাদিত 'বামাবোধিনী পত্রিকা' যাহাতে অব্যাহতভাবে চলে তাহার জন্য বিশেষ যত্ন লইয়াছিলেন।

গত শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে কলিকাতায় ব্রাহ্মধর্মের আন্দোলন অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে। এইধর্মের অনুবর্তিগণ কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে সমাজসংস্কারে মন দিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে এবিষয়ে মতানৈক্য ঘটে। ফলে কেশবচন্দ্র ও তদনুবর্তী 'উন্নতিশালী' ব্রাহ্মগণ মূল কলিকাতা সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হন এবং ১৮৬৬ সনের ১১ই নবেম্বর 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' নামে একটি নূতন সমাজ স্থাপন করেন। আনন্দমোহন ব্রাহ্মধর্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই এই সমাজের সঙ্গে যুক্ত হন এবং ইহার পরিচালক সভার অধিবেশনসমূহে যোগ দিতে থাকেন। ১৮৬৯ সনের ২২শে আগস্ট ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন দিবসে সস্ত্রীক আনন্দমোহন আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিলেন। এইদিন আনন্দমোহনের সঙ্গে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মোহিনীমোহন বসু, অনাথবন্ধু গুহ, রজনীনাথ রায়, কৃষ্ণবিহারী

সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী (তখন ভট্টাচার্য) প্রমুখ একুশজন যুবক দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' (১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮৬৯) লেখেনঃ "অতঃপর উন্নতিশীল ব্রাহ্মরা শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দচন্দ্র (মোহন) বসুকে স্বদলস্থ করিয়া একটি বহুমূল্য রত্ন উপলব্ধি করিয়াছেন। আমাদের ইচ্ছা করে বটে যে, কেশববাবু নির্বিঘ্নে চিরজীবী হউন, কিন্তু যদি ঈশ্বর কখনও আমাদিগকে তাঁহার অভাব অনুভব করান, আনন্দবাবু সে অভাব পূরণ করিতে পারিবেন।"

তখনকার নব্য ব্রাহ্মযুবকদের ন্যায় আনন্দমোহনও কেশবচন্দ্রের আদর্শে বিশেষ অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। তিনি মাদ্রাজ কংগ্রেসে (১৮৯৮) সভাপতির অভিভাষণে কেশবচন্দ্রকে, "My leader and friend" বলিয়া উল্লেখ করেন। কেশবচন্দ্রও আনন্দমোহনের গুণপনায় বিশেষ মুগ্ধ ছিলেন। ১৮৭০ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী যখন কেশবচন্দ্র বিলাত রওনা হন, তখন অন্যান্যদের সঙ্গে আনন্দমোহনও তাঁহার সঙ্গী হইলেন। আনন্দমোহনের উদ্দেশ্য ছিল বিলাতে উচ্চ গণিত অধ্যয়ন। তিনি লণ্ডনে পৌঁছিয়া অল্পকাল পরেই কেম্ব্রিজে গমন করেন এবং সেখানকার ক্রাইস্টস্ কলেজে ভর্তি হন। আনন্দমোহনের অধ্যয়ন ও কৃতিত্বের কথা এদেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতে থাকে। কলিকাতায় অবস্থানকালে তিনি ১৮৬৮ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রতিষ্ঠিত যশোহরের 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র লেখক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ ছিলেন তাঁহার বিশেষ বন্ধু। পত্রিকা আনন্দমোহনের পাঠোৎকর্ষ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ প্রদান করিতেন। সেসব কথার বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভবপর নহে। ১৮৭৪ সনের প্রথমেই গণিত বিদ্যার শেষ ও সর্বোচ্চ পরীক্ষায় আনন্দমোহন ষোড়শ স্থান অধিকার করিয়া ভারতবাসীদের মধ্যে প্রথম র‍্যাংলার হইবার সম্মান অর্জন করেন। এই পরীক্ষায় ১০৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে

৪৯ জন মাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। আনন্দমোহনকে এই পরীক্ষা দিতে গিয়া নানারকম অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। এসম্পর্কে তিনি 'পত্রিকা'-সম্পাদককে যে পত্র লেখেন, তাহার কিয়দংশ এই ঃ

"Our countrymen properly selected, and entering Cambridges with a previous preparation and a full knowledge of the system of working here can expect to take the highest place in Tripos. I hope I would someday be able to illustrate this practically by sending some of our young friends who will not suffer from the same causes as I have done. I cannot tell you how much time and how many advantages I lost by haviug to get up two new languages I mean Latin and Greek and which I should have read a little before entering the University ; by my giving up all reading for the Mathematical Tripos during the greater part of a year and from a new other causes of interuption on my time and study. But now reviewing all I feel glad that I should have been able in spite of all these things to come out as a Wrangler and occupy such a good place in the midst of all the intense competition which exists in the Cambridge Mathematical Tripos ; and I hope now to be able to devote myself to law." (Amrita Bazar Patrika, Feb, 26, 1874.)

ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা আয়ত্ত করিতে আনন্দমোহনের বিস্তর সময় কাটিয়া যায়। 'ট্রাইপোস' পরীক্ষায় উচ্চতম স্থান লাভে ইহা বিশেষ প্রতিবন্ধক হইয়াছিল। অধ্যাপকগণ কিন্তু গণিতশাস্ত্রে তাঁহার আশ্চর্য ব্যুৎপত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং কেহ কেহ ভাবিয়াছিলেন, আর

সংবাদপত্রেও প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল যে, আনন্দমোহনই ঐ বৎসর শীর্ষস্থান অধিকার করিবেন। যাহা হউক, তিনি ইহার পর আইন অধ্যয়নে মন দিলেন। উদ্দেশ্য, ব্যারিস্টারী সনদ লইয়া শীঘ্রই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন।

কেম্ব্রিজে অধ্যয়নকালে আনন্দমোহন শরীরচর্চার দিকেও বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছিলেন। তিনি উচ্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভলান্টিয়ার সৈন্যদলে প্রবেশ করেন। 'মার্কসম্যান' হওয়া এখানকার সর্বোচ্চ গৌরবের পদ। আনন্দমোহন এই পদ লাভ করিয়াছিলেন।

আনন্দমোহন বিলাতে একাদিক্রমে চার বৎসর আট মাস অবস্থান করেন। এইসময়ে অধ্যয়নে তিনি যেমন তৎপর ছিলেন, স্বদেশের উন্নতি চিন্তাও তেমনি তাঁহাকে বিশেষভাবে উদ্বেলিত করে। বিলাতে পেঁ ৗছিয়াই তিনি ভারতহিতৈষিণী একেশ্বরবাদিনী কুমারী সোফিয়া ডবসন কলেটের সঙ্গে পরিচিত হন। কলেট রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী লিখিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি ক্রমান্বয়ে সাত খণ্ড Brahmo Year Book বা ব্রাহ্ম বর্ষলিপি সঙ্কলন করেন। সেযুগের প্রগতিশীল আন্দোলনসমূহের কথা জানিবার পক্ষে এই বর্ষলিপি অত্যাবশ্যক। আনন্দমোহন কুমারী কলেটকে ভারতবর্ষ সংক্রান্ত বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া দিতেন এবং কলেট তৎসমুদয়ের ভিত্তিতে প্রবন্ধ রচনা করিয়া বিলাতের বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতেন।

বিলাতের ছাত্রসম্প্রদায় রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান না করিলেও শিক্ষাগারের বিবিধ সভা-সমিতিতে তাহাদের রাজনীতি আলোচনার বিশেষ সুযোগ দেওয়া হইত। কেম্ব্রিজ ইউনিয়ন সোসাইটিতে আনন্দমোহন ভারত সংক্রান্ত আলোচনায় বিশেষভাবে যোগদান করিতেন। বিলাতের অন্যান্য স্থলেও তখন ভারতবর্ষ সম্পর্কে সভাদি অনুষ্ঠিত হইত, তিনি তাহাতে যোগ দিতেও ত্রুটি করিতেন না। তাহাতে যোগদান তিনি একটি কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজে তাঁহার একজন প্রধান অধ্যাপক ছিলেন সি, বি, ক্লার্ক। ক্লার্কের সহপাঠী ও বিশিষ্ট বন্ধু অধ্যাপক হেনরি ফসেটের সঙ্গে শীঘ্রই আনন্দমোহনের পরিচয় হইল। ফসেট ভারতবাসীর প্রতি বিশেষ প্রীতিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি ছিলেন অর্থনীতিতে সুপণ্ডিত। পার্লামেণ্টের সদস্যরূপে তাঁহার এই বিদ্যা ভারতবর্ষের বিশেষ কাজে লাগাইতেন। তিনি পার্লামেণ্টে ভারতবর্ষের রাজস্ব সংক্রান্ত অনাচার ও অবিচার সম্পর্কে যুক্তিপ্রমাণসহ এরূপ বক্তৃতা করিতেন যে ভারতের প্রতি মমতাবিহীন কর্তৃপক্ষও বিশেষ চঞ্চল হইয়া উঠিতেন। অধ্যাপক ফসেটের বক্তৃতার ফলে ভারতবর্ষ বহু অযথা করভার ও আর্থিক দায়িত্ব হইতে মুক্তি পায়।

ভারতবাসীর পক্ষ হইতে কলিকাতার ভারতবর্ষীয় সভা ফসেটের প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার নির্বাচনকেন্দ্র ব্রাইটনের মেয়রকে একখানি অভিনন্দনপত্র প্রেরণ করেন। এই অভিনন্দনপত্র ১৮৭৩ সনের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী অধ্যাপক ফসেটকে আনুষ্ঠানিকভাবে অর্পণ করা হয়। এই উদ্দেশ্যে যে জনসভার অধিবেশন হয় তাহাতে আনন্দমোহন উপস্থিত হইয়া ভারতবাসীর অবস্থা ও বৃটিশ শাসনের রীতিপদ্ধতি সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। তাঁহার বাগ্মিতায় জনমণ্ডলী মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং উপস্থিত জনৈক পার্লামেণ্ট সদস্য বলিয়াছিলেন যে, হাউস অব্ কমন্স ও হাউস অব্ লর্ডসেও এরূপ বক্তৃতা কদাচিৎ শোনা যায়। বিলাতের হ্যাকনি সহরে আনন্দমোহন যে বক্তৃতা দেন তাহা শুনিয়া একখানি সংবাদপত্র বলিয়াছিলেন, বর্ণ ও স্বরের কিঞ্চিৎ স্বাতন্ত্র্য না থাকিলে কেহ বুঝিতে পারিত না যে, তাঁহার জন্মস্থান ইংলণ্ডে নহে। এই সকল বক্তৃতায় আনন্দমোহনের স্বদেশপ্রীতি উছলিয়া উঠিত। আনন্দমোহন তখনই বলিয়াছিলেন, ভারতবাসীর প্রতি অনাচার অনুষ্ঠিত হইতে থাকিলে আয়ার্লণ্ডের অপেক্ষাও বহুগুণ সঙ্গীন অবস্থার উদ্ভব হইবে।

আত্মশক্তির উপরও কিন্তু তিনি বিশেষ জোর দেন। তিনি ব্রাইটনের বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন,

"A nation, in order to be recognised as of importance, must depend on its own efforts."

জাতিপদবাচ্য হইতে হইলে প্রত্যেককেই নিজের পায়ে দাঁড়াইতে হইবে।

বিলাত-প্রবাসকালে আনন্দমোহনের আর একটি প্রয়াসের কথাও এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তখন ভারতবর্ষ হইতে যে সকল লোক বিলাতে যাইতেন তাঁহারা বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করিতেন। পরস্পরের মধ্যে মিলন দূরে থাকুক, আলাপ-পরিচয়েরও বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না। এই সকল লক্ষ্য করিয়া কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে আনন্দমোহন পরস্পরের মধ্যে একতা ও আত্মীয়তা বিধানের নিমিত্ত একটি সভা স্থাপনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। ইহার ফলস্বরূপ তাঁহার গৃহে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি নামে একটি নূতন সভা স্থাপিত হইল। "বিদেশে থাকিয়া ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকেরা এইরূপ একজাতিত্ব-জ্ঞান ও একতা বিধান হইলে তাঁহারা স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াও সেই জাতিত্ব বন্ধন রক্ষা করিতে ও সমবেত হইয়া কার্য্য করিতে যাত্নিক হইবেন, এই সভা স্থাপনের ইহাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমতঃ বাঙ্গালীরা ভিন্ন আর কেহ ইহাতে যোগ দেন নাই। কিন্তু ক্রমে অন্যান্য প্রদেশের লোকেরাও যোগ দিলেন। ইহারা কতিপয় বন্ধুতে একত্রিত হইয়া এই সময়ে একটি বাঙ্গলা পুস্তকালয়ও খুলিয়াছিলেন। এখানে নানাপ্রকার বাঙ্গলা পুস্তক ও পত্রিকা পাঠার্থে সংগৃহীত হইত।" ('নববার্ষিকী,' ১৮৭৭, পৃঃ ১৯৪)।

বিলাত হইতে ব্যারিষ্টারী সনদ লইবার পর আনন্দমোহন যাহাতে ১৮৭৪ সনের শেষভাগেই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে পারেন তাহার

আয়োজন করিতে লাগিলেন। এই সংবাদে 'সাধারণী' ৩০ আগষ্ট ১৮৭৪ তারিখে লিখিলেন ঃ "কেম্ব্রিজ ইউনিভারসিটির র‍্যাঙ্গলার এবং ব্যারিষ্টার বাবু আনন্দমোহন বসু আগামী মাসের শেষভাগে এদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। তিনি নিরাপদে স্বদেশে আসিয়া দুঃখিনী বঙ্গমাতার মুখোজ্জ্বল করুন, দেশহিতকর কার্য্যসকল সম্পন্ন করিতে থাকুন। যেন অপদেবতার দলে না মিশাইয়া যান ; ঈশ্বর তাঁহার মঙ্গল করিবেন।"

দীর্ঘকাল বিলাত-প্রবাসেও তাঁহার স্বদেশীয় ভাব বদলাইয়া যায় নাই, বরং বিশেষভাবে উহা বাড়িয়া গিয়াছিল তাহা আমরা ক্রমশঃ দেখিতে পাইব।

আনন্দমোহন ১৮৭৪, ১২ই অক্টোবর কলিকাতায় পৌঁছিলেন। দীর্ঘকাল বিলাত-প্রবাসেও তাঁহার পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরণ, কথাবার্তায় স্বদেশীয় ভাব আদৌ বিসর্জিত হয় নাই। বিলাত গমনের চারি মাসের মধ্যেই 'অমৃতবাজার পত্রিকা' (১৩ই জুন ১৮৭০) আনন্দমোহনের একখানি প্রতিকৃতি পাইয়া তাঁহার স্বদেশীয় পোশাকের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। এবারেও তাঁহাকে অভিনন্দনকালে 'পত্রিকা' অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এ বিষয়টি উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। 'পত্রিকা' লিখিলেন ঃ

"He is the same frank, genial and unostentatious young man that he was when he left India. Of course, he was neither coated nor hatted, for Ananda Mohan is above imitation." (October 15, 1874).

স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অল্পকাল পরে, ১৮৭৫ সনের জানুয়ারী মাসে আনন্দমোহন হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তখনকার জনহিতকর বিবিধ আন্দোলনের সহিত তাঁহার সংযোগ স্থাপিত হইল। এই সময়ে হিন্দু মেলা বেশ জাঁকিয়া উঠিয়াছিল।

আমরা প্রায় সকল বিষয়েই পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িতেছিলাম। হিন্দু মেলা পরমুখাপেক্ষিতার মোড় ফিরাইয়া আমাদিগকে স্বাবলম্বী হইতে উদ্বুদ্ধ করে। কবিতা, গান, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রভৃতির ভিতর দিয়া তখন যে আত্মনির্ভরশক্তি তথা নবজাতীয়তার বাণী উৎসারিত হইতে থাকে তাহার মূলে হিন্দু মেলার প্রেরণা সর্বাপেক্ষা অধিক। হিন্দু মেলার একটি প্রধান অঙ্গ ছিল—কিশোর ও যুবকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ব্যায়ামচর্চার প্রবর্তন। এ বিষয়েও মেলা বিশেষ সাফল্য লাভ করে। ১৮৭৫ সনের ১১ই ফেব্রুয়ারী মনস্বী রাজনারায়ণ বসুর সভাপতিত্বে হিন্দু মেলার যে বার্ষিক অধিবেশন হয় তাহার ব্যায়ামচর্চা বিভাগে সদ্য বিলাত প্রত্যাগত আনন্দমোহন ব্যায়ামের উপকারিতা সম্বন্ধে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। আমরা দেখিয়াছি, কেম্ব্রিজে অধ্যয়নকালে তিনি শরীরচর্চা সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত ছিলেন। স্বদেশে ফিরিয়া প্রকাশ্য জনসভায় আনন্দমোহনের আবির্ভাব এই প্রথম।

জাতির সত্যকার সম্পদ তাহার যুবকগণ। বিলাতের অভিজ্ঞতা হইতে আনন্দমোহন বুঝিতে পারেন, যুবশক্তিকে সুপথে চালনা করিতে পারিলেই দেশের সত্যকার উন্নতি সম্ভব ও সহজসাধ্য। তিনি এই উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রদের লইয়া ১৮৭৫, এপ্রিল মাসে একটি ছাত্রসভা বা ষ্টুডেন্টস্ এসোসিয়েশন গঠন করিলেন। 'পত্রিকা' সভা প্রতিষ্ঠার কথা বিজ্ঞাপিত করিয়া লেখেন যে, "মানসিক, শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন করা এ সভার উদ্দেশ্য।" (২৯ এপ্রিল, ১৮৭৫) আনন্দমোহনের সভাপতিত্বে এসোসিয়েশনের অধিবেশন হইতে লাগিল। বাহির হইতে বিভিন্ন বক্তা এখানে বক্তৃতা করিবার জন্য আহূত হইতেন। বিলাতে অবস্থানকালে দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে আনন্দমোহন পরিচিত হইয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ সিবিলিয়ানী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে আপীল করিবার জন্য দ্বিতীয়বার বিলাত গেলে, আনন্দ-

মোহন আপীল-মোকদ্দমায় মূল ব্যবহারজীবীর জুনিয়র ছিলেন। ১৮৭৫ সনের জুন মাসে সুরেন্দ্রনাথ বিফল হইয়া বিলাত হইতে স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। তিনি যেভাবে ব্রিটিশ সরকারের হস্তে নির্যাতিত হইয়াছিলেন, তখনকার নব্যশিক্ষিত বাঙ্গালীদের মধ্যে এমনটি আর কেহই হন নাই। কলিকাতায় ফিরিবার পর পিতৃবন্ধু বিদ্যাসাগর মহাশয় মেট্রোপলিটান (অধুনা বিদ্যাসাগর) কলেজে সুরেন্দ্রনাথকে অধ্যাপকপদে নিযুক্ত করেন। তিনি ক্রমশঃ যুব-ছাত্রদের সংস্পর্শে আসিতে লাগিলেন। আনন্দমোহন প্রতিষ্ঠিত ষ্টুডেণ্টস্ এসোসিয়েশনে তাঁহার আমন্ত্রণ আসিল। এই এসোসিয়েশনকে কেন্দ্র করিয়াই তিনি বাংলার যুবশক্তির উদ্বোধন কার্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। সুরেন্দ্রনাথের ম্যাটসিনি, নব্য-ইটালী, শিখজাতির ইতিহাস প্রভৃতি বিখ্যাত বক্তৃতাগুলি এই ছাত্রসভায় প্রদত্ত হয়। তখনকার যুবসমাজে এই সকল বক্তৃতা বিশেষ উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়াছিল। বিপিনচন্দ্র পাল লিখিয়াছেন ঃ তাঁহারা সেই সময়ে নূতন স্বদেশপ্রেম মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করেন। কার্যতঃ না হইলেও, মনোজগতে তখন বিপ্লবের হাওয়া বহিতে শুরু করে।

ষ্টুডেণ্টস্ এসোসিয়েশন বা ছাত্রসভা সংগঠনেই আনন্দমোহনের কার্য নিবদ্ধ রহিল না, স্বদেশে, বিশেষ করিয়া বঙ্গভূমিতে তখন যে নূতন ভাবধারা লক্ষ্য করিলেন তাহাকে সুষ্ঠু রাষ্ট্রীয় রূপ দানের উদ্দেশ্যে কলিকাতায় একটি কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক সভা স্থাপনেরও উদ্যোগী হইলেন। এ বিষয়ে তাহার বন্ধু শিশিরকুমার ঘোষও 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় বহুদিন পূর্ব হইতে লেখনী পরিচালনা করিতেছিলেন। কাজেই এ বিষয়ের আলাপ-আলোচনায় আনন্দমোহনের সঙ্গে তিনিও বিশেষভাবে যোগদান করেন। মনোমোহন ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শিবনাথ শাস্ত্রীও এ আলোচনার মধ্যে ছিলেন। আনন্দমোহন এই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে বাহির হইলে তাঁহার অনুপস্থিতিতে

শিশিরকুমার ঘোষ ১৮৭৫, ২৫শে সেপ্টেম্বর 'ইণ্ডিয়ান লীগ' নামে একটি কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক সভা স্থাপন করিলেন। লীগের কর্মকর্তৃসভায় আনন্দমোহনপ্রমুখ উক্ত নেতৃবর্গের কেহ কেহ গৃহীত হইলেও, ইহা লইয়া বিভিন্ন পত্রিকায় তখন বিরুদ্ধ সমালোচনা হইতে থাকে। যাহা হউক, লীগ প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পরে আনন্দমোহন, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ইহার সংস্রব ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ইহার পর তাঁহারা একটি সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুপরিকল্পিত রাষ্ট্রীয় সভা স্থাপনে প্রয়াসী হইলেন।

এ বিষয় বলিবার পূর্বে আর দুই-একটি বিষয়ও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে আনন্দমোহনের ঘনিষ্ঠতার কথা আমরা জানিতে পারিয়াছি। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যে যে-সব অন্তর্বিরোধ হইতেছিল তাহা আনন্দমোহন বিশেষভাবে অবগত ছিলেন। কিন্তু তিনি তখন পর্যন্ত পক্ষাপক্ষ গ্রহণ করেন নাই, কেশবচন্দ্রের সহিত সহযোগিতা রক্ষা করিয়াই চলিতেন। ১৮৭৬ সনের এপ্রিল মাসে কলিকাতায় কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে এলবার্ট ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হইলে আনন্দমোহন ইহার সহকারী সম্পাদক পদে বৃত হন; কেশবচন্দ্র স্বয়ং ছিলেন ইহার সম্পাদক। সভা-সমিতি, পাঠাগার, গীত-বাদ্য, খেলাধূলা প্রভৃতির মধ্য দিয়া শিক্ষিত সমাজের মধ্যে মিলন-ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার জন্যই এই ইনষ্টিটিউট বা হল স্থাপিত হইয়াছিল। বঙ্গবালাদের উচ্চ শিক্ষাদানের জন্য বালীগঞ্জেও ১৮৭৬ সনের ১লা জুন যে বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় (ইহার উল্লেখ পূর্বেই করিয়াছি) তাহার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা এবং পৃষ্ঠপোষক হইলেন আনন্দমোহন বসু মহাশয়। স্ত্রীশিক্ষার প্রতি তাঁহার অনুরাগ উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতে থাকে। ১৮৭৮ সনের ১লা আগষ্ট যে এই বিদ্যালয়টি বেথুন বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হইতে পারিয়াছিল এবং সম্মিলিত বিদ্যালয় হইতে প্রথম ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাহার মূলে আনন্দমোহনের

কৃতিত্ব ছিল অনেকখানি। ছাত্রীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার উন্মোচনে আনন্দমোহনের প্রয়াস কখনও ভুলিবার নয়।

৪

কিঞ্চিৎ পূর্বে যে সুনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রীয় সভার জন্য উদ্যোগের কথা বলিয়াছি, তাহা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৬ সনের ২৬শে জুলাই। সভার নামকরণ হইল 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' বা ভারত-সভা। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রচেষ্টার ইতিহাসে ভারত-সভা একটি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে। সঙ্ঘবদ্ধভাবে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন পরিচালনায় ভারত-সভা যতটা অগ্রসর হয় উহার পূর্বে অন্য কোন প্রতিষ্ঠান দ্বারা তাহা সম্ভব হয় নাই। ইহার কথা বহুজনে নানাভাবে বিবৃত করিয়াছেন। সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ A Nation in Making গ্রন্থে ইহার বিষয়ে অনেক কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু এতৎ সম্পর্কীয় আলোচনায় একটি বিষয় যেন আমরা না ভুলি—ভারত-সভা প্রতিষ্ঠার মূলে যেমন ছিলেন আনন্দমোহন, প্রথম দশ বৎসর মাতৃবৎ স্নেহে ইহাকে প্রতিপালনও তেমনি করিয়াছিলেন আনন্দমোহন। আনন্দমোহন ভারত-সভার প্রথম সম্পাদক পদে বৃত হন এবং ১৮৮৪ সন পর্যন্ত একাদিক্রমে আট বৎসরকাল ইহাকে পরিচালিত করিয়া দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। সিবিল সার্বিস, দেশীয় সংবাদপত্র আইন, অস্ত্র আইন প্রভৃতির মধ্যে শাসনের যে বজ্র-আঁটুনি ছিল ভারত-সভা তাহার বিরুদ্ধে ভারতব্যাপী তীব্র আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, কিন্তু এই সকল নেতিবাচক কর্মের মধ্যে আনন্দমোহন ভারত-সভার কার্য শেষ হইতে দেন নাই। দেশ-শাসনে আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় যে সর্বাগ্রে আত্মশুদ্ধি ও আত্মশিক্ষা প্রয়োজন সেবিষয়েও তিনি সম্যক অবহিত ছিলেন। শিক্ষার

প্রসার, স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্তন, ভূমিতে প্রজার স্বত্ব নির্ধারণ, সুরাপানাদি দোষ পরিহার—প্রত্যেকটি বিষয়েই ভারত-সভা কর্মতৎপর হইয়াছিলেন, আর আনন্দমোহনের সম্পাদকত্বে এ-সমুদয়ের সূচনা হয়। ইল্‌বার্ট বিল আন্দোলন, সুরেন্দ্রনাথের কারাবরণ প্রভৃতির জন্য ১৮৮৩ সনে যে বিক্ষোভ উপস্থিত হয়, তাহাকে জাতীয় সম্মেলনের মধ্যে একটি সক্রিয় রূপ দিবার প্রচেষ্টাও আনন্দমোহনের সময় লক্ষ্য করি। আনন্দমোহন ১৮৮৩ সনের ভারত-সভার বার্ষিক কার্যবিবরণীতে সুরেন্দ্রনাথের কারাবরণ উপলক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন ঃ

"অশুভ হইতে শুভের উদ্ভব—বাক্যটির যাথার্থ্য। এই ঘটনায় যেমন সুষ্ঠুরূপে প্রমাণিত হইয়াছে এমনটি পূর্বে কখনও হয় নাই। এ ব্যাপারে সর্বত্র যতখানি গভীর বিক্ষোভ ও ক্রোধের উদ্রেক হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, বিভিন্ন প্রদেশের জনগণ পরস্পরের জন্য বেদনা বোধ করিতে শিখিয়াছে এবং ঐক্য ও প্রীতির বন্ধন অতি দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে।"

ভারত-সভা যে এই জন্য ক্ষেত্র তৈয়ার করিতেছিলেন তাহা বলাই বাহুল্য। আনন্দমোহন ইহার পর সহকারী সভাপতি এবং সভাপতিরূপে ভারত-সভার কার্য দীর্ঘ কাল যাবৎ পরিচালনা করিয়া ইহাকে জাতির মুক্তি-সাধনার উপযোগী করিয়া তুলিয়াছিলেন। পরবর্তী স্বদেশী আন্দোলনে ভারত-সভার নেতৃবৃন্দই বিশেষভাবে অগ্রণী হন। জন-সাধারণ যে এই সময় অতটা সাড়া দিয়াছিল তাহার জন্য ভারত-সভার কার্য বিশেষরূপে স্মরণীয়।

আনন্দমোহন গণতন্ত্রমূলক শাসন-পদ্ধতির একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। শুধু রাষ্ট্রীয় বিষয়ে নহে, সমাজ, শিক্ষা ও ধর্মবিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহেও ইহার প্রবর্তনে তিনি আগ্রহান্বিত হন। কিছুকাল হইতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে যে অন্তর্বিরোধ চলিতেছিল তাহার মূলে ছিল একনায়কত্বের

পরিবর্তে প্রতিনিধিমূলক পরিচালনা ব্যবস্থার প্রবর্তন। ১৮৭৮ সনের ৬ই মার্চের কুচবিহার-বিবাহ লইয়া উত্থিত আন্দোলনের মূলেও এই প্রয়াস দেখা যায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হইতে যখন কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ স্বতন্ত্র হইয়া আসিয়াছিলেন তাহারও মূলে ঐ একই কারণ বিদ্যমান ছিল। আনন্দমোহন গণতন্ত্রনীতির অপলাপ দেখিয়া এই সময় স্বীয় নেতা কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেও দ্বিধা করিলেন না। তিনি ব্যক্তিগতভাবে কেশবচন্দ্রকে স্বমতে আনয়ন করিতে চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থকাম হইলেন। তখন উপায়ান্তর না থাকায় ১৮৭৮, ১৫ই মে তারিখে টাউন হলে প্রকাশ্য সভায় সভাপতিরূপে পূর্বসমাজ হইতে স্বতন্ত্রভাবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের কথা ঘোষণা করিলেন। তিনি প্রথম বৎসর ইহার সভাপতি পদে আরূঢ় থাকিয়া নানা ঝড়ঝঞ্জার মধ্যেও ইহাকে চালাইয়া লইয়া যান। গণতন্ত্রের ভিত্তিতে নবজাত সমাজের নিয়মতন্ত্র রচিত ও গৃহীত হইল। ব্রাহ্ম-সমাজের ইতিহাসকার বলেন ইতিপূর্বে ভারতবর্ষের কোন সাধারণ প্রতিষ্ঠানেই গণতন্ত্রনীতি প্রবর্তিত হয় নাই, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেই ইহা প্রথম অনুসৃত হইল। কোন ধর্মসমাজে আধ্যাত্মিকতার দিক হইতে গণতন্ত্র নীতির প্রয়োজন কতখানি জানি না, তবে একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে সংহত ও সজীব রাখার পক্ষে ইহার প্রয়োজনীয়তা কম নহে।

স্ত্রীশিক্ষায় আনন্দমোহনের যোগাযোগের কথা বলিয়াছি। বেথুন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ-সভায় থাকিয়া তিনি দীর্ঘকাল ইহার পরিচালনার সহায়তা করিয়াছিলেন। কলিকাতাস্থ ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠায় অগ্রণীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। সাধারণের শিক্ষা ব্যাপারেও তাঁহার কৃতিত্ব সমধিক। শিক্ষানুরাগী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ও যশস্বী ছাত্র বলিয়া ভারত সরকার আনন্দমোহনকে ১৮৭৭ সনের ৯ই মার্চ এক আদেশ বলে সেনেটের 'ফেলো' বা সদস্য নিয়োগ করেন। এই

বৎসরে ৭ই এপ্রিলের সেনেট সভায় তিনি 'ফ্যাকাল্টী অব্ আর্টস্' ও 'ফ্যাকাল্টী অব্ ল'-এর সদস্য নির্বাচিত হইলেন। ২৫শে মার্চ ১৮৭৮ তারিখে 'ফ্যাকাল্টী অব্ আর্টস্-এর দ্বারা তিনি সিণ্ডিকেটের সদস্য নির্বাচিত হন। উভয় পদে দীর্ঘকাল নিযুক্ত থাকিয়া আনন্দমোহন নানাভাবে বঙ্গদেশে উচ্চশিক্ষা প্রসারে যত্নবান ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি পরীক্ষা গ্রহণের স্থান মাত্র না করিয়া উচ্চতম শিক্ষার কেন্দ্র করিয়া তোলার উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৯০ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল আইন সংশোধনেরও প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই সময়ে যে আলোচনা ও বিতর্ক শুরু হয়, তাহারই ফলে বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে একটি সুউচ্চ শিক্ষা-কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে।

আনন্দমোহনের অন্যতম প্রধান কীর্তি কলিকাতা সিটি কলেজ ও ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজ। ১৮৭৯ সনে সিটি কলেজ একটি স্কুলরূপে স্থাপিত হয়। পর বৎসর ইহার কলেজ বিভাগও খোলা হয়। বর্তমানে দুইটি স্বতন্ত্র ভবনে স্কুল ও কলেজের কার্য হইয়া থাকে। বিদ্যালয়টিকে শৈশব অবস্থা হইতে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আনন্দমোহনের অর্থ ও সময় বিস্তর ব্যয়িত হয়। পরে তিনি ইহার পরিচালনা ভার সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের হস্তে দিয়া যান। ময়মনসিংহের পিতৃভবন তথাকার কলেজের জন্য তিনি দান করিয়াছিলেন। প্রথমে সিটি কলেজ নামে পরিচিত হইলেও আনন্দমোহনের মৃত্যুর পর তাঁহার নামানুসারে উহার নামকরণ হয়। আজও উক্ত নামেই ঐ কলেজ আখ্যাত হইয়া থাকে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার তৎকালীন শিক্ষার অবস্থা পর্যালোচনা করিবার জন্য স্যার উইলিয়ম হাণ্টারের সভাপতিত্বে একটি শিক্ষা-কমিশন গঠন করেন। জনশিক্ষার প্রসারকল্পে ভারত-সভা যে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, আনন্দমোহন উহার সদস্যরূপে তাহার একটি সুস্পষ্ট পরিকল্পনা রচনায় বিশেষ সাহায্য করেন।

ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, লোক্যাল বোর্ড ও মিউনিসিপ্যাল বোর্ড দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের বিষয় কমিশনে লিপিবদ্ধ হইল।

৫

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় আন্দোলন ১৮৮৫ সন হইতে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের মধ্য দিয়া পরিচালিত হইবার অবকাশ পায়। বিভিন্ন প্রদেশে বিচ্ছিন্নভাবে যেসব রাজনৈতিক প্রচেষ্টা চলিতেছিল, কংগ্রেস ধীরে ধীরে তৎসমুদয়ই আত্মসাৎ করে। বাঙ্গলা তথা ভারত-সভার নেতৃবৃন্দও কংগ্রেসে যোগদান করিতে বাধ্য হইলেন। বাঙ্গলায় যে গণতন্ত্র নীতির প্রবর্তন শুরু হইয়াছিল, কংগ্রেসে ধনী-মানীর প্রাধান্য সত্ত্বেও তাহা অনুসৃত না হইয়া পারে নাই। আবার ইহার সঙ্গে সঙ্গে জনমতও ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। স্বদেশপ্রাণ আনন্দমোহন ক্রমেই কংগ্রেসের কার্যে বেশী করিয়া লিপ্ত হইয়া পড়িলেন।

অতিরিক্ত পরিশ্রম হেতু স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে আনন্দমোহন ১৮৯৪ সনের ৪ঠা এপ্রিল বিশ্রামলাভ ও চিকিৎসার জন্য বিদেশযাত্রা করেন। জার্মাণী হইতে এই বৎসরের ২২শে জুন সহধর্মিণী স্বর্ণপ্রভা বসুকে স্বদেশ-সেবার উপযুক্ত হইবার জন্য যে উপদেশ দেন, তাহাতে তাঁহার প্রগাঢ় স্বদেশপ্রীতির পরিচয় মিলে। জাতীয় সঙ্গীত জার্মাণ জাতি গঠনে কতখানি সাহায্য করিয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি লেখেন—

"Songs are of great importance. They often preach better than sermons, and find their way into the heart. Writing to you from Germany I may tell you that national songs and hymns have done more to unite this country and placed it in the proud position it occupies today than its armies. In fact

its armies have been the result of the spirit which these songs aroused in the whole community."

জাতীয় সঙ্গীত জার্মাণ জাতির মধ্যে ঐক্য স্থাপনে যতখানি সাহায্য করিয়াছে, এমনটি তাহার সৈন্যসামন্তও করে নাই। উহারাই বরং জাতীয় সঙ্গীত দ্বারা উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হইয়াছে। আনন্দমোহন সহধর্মিণীকে এই প্রকারের জাতীয় সঙ্গীত রচনায় মনোনিবেশ করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন।

আনন্দমোহন বিদেশ হইতে ১৮৯৪ সনের ১৩ই ডিসেম্বর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া পুনরায় কর্মের আবর্তে নিজেকে ঢালিয়া দিলেন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্বে ভারত-সভা দ্বিবিধ কার্যে লিপ্ত ছিল—একটি নিখিল ভারতীয় এবং অন্যটি নিছক বাঙ্গলা সম্পর্কিত। নিখিল ভারতীয় বিষয়-সমূহ আলোচনার ভার কংগ্রেস গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু বাঙ্গলার নিজস্ব সমস্যাগুলির সমাধানের নির্দেশ তো ইহার দ্বারা সম্ভবপর নহে। বাঙ্গলার নেতৃবৃন্দ এজন্য ১৮৮৮ সনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন গঠন করিলেন। ইহার প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার। মধ্যে ১৮৯২ সন বাদে ১৮৮৮ সন হইতে ১৮৯৪ সন পর্যন্ত কলিকাতায়ই এই সম্মেলনের অধিবেশন বসিয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ সেন, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ বঙ্গের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ ইহার সভাপতিত্ব করেন। ১৮৯৫ সন হইতে স্থির হয়, নিছক বাঙ্গলা সম্পর্কে যখন এই সম্মেলন, তখন বিভিন্ন জেলা সহরে প্রতি বৎসর ইহার অধিবেশন হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই অভিপ্রায় অনুযায়ী মফঃস্বল সহরে প্রথম সম্মেলন হয় ১৮৯৫ সনে—মুর্শিদাবাদ জেলার প্রধান সহর বহরমপুরে। আনন্দমোহন বসু এই প্রথম মফঃস্বল সম্মেলনের সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

উচ্চশিক্ষার ক্রমপ্রসার হেতু ভারতবাসীর মনে স্বভাবতঃই সরকারী

শিক্ষা বিভাগে প্রবেশের বাসনা জাগে। এই বাসনা অঙ্কুরেই যাহাতে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সরকার তাহার চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৮৯৬ সনে কলিকাতা কংগ্রেসে আনন্দমোহন ইহার প্রতিবাদে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ সহ যে মর্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন, তাহাতে উপস্থিত জনমণ্ডলী বিশেষভাবে বিচলিত হন। এই সময় রাজ-সরকারে রক্ষণশীল দলের প্রবল প্রতাপ। ভারতবাসীর নবোন্মেষিত জাতীয়তাবোধকে দাবাইয়া রাখিতে তাঁহারা বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করিতেন না। আনন্দমোহন তাঁহাদের উদ্দেশ করিয়া সাবধান বাণী উচ্চারণ করিলেন।

পুত্রদ্বয়ের বিলাতে শিক্ষাদানার্থ আনন্দমোহন ১৮৯৭ সনের ১৫ই সেপ্টেম্বর পুনরায় বিলাত যান। এবারে তিনি এক বৎসরকাল সেখানে অবস্থান করিয়াছিলেন। এ সময় কিন্তু তাঁহার এক মুহূর্তও অবসর ছিল না। পুত্রদের নির্দিষ্ট কলেজে ভর্তি করিয়া দিয়া তিনি স্বদেশের সেবায় সম্পূর্ণরূপে মন-প্রাণ সমর্পণ করিলেন। একটি বৎসরের মধ্যে এমন দিন বা সপ্তাহ খুব কমই অতিবাহিত হইয়াছে, যখন তিনি কোন-না-কোন জনসভায় ভারতকথা প্রচার করেন নাই। তিনি ইংলণ্ডের মফঃস্বল সহরগুলিতেই যাইতেন বেশীর ভাগ এবং বক্তৃতার দ্বারা সেই সেই অঞ্চলের জনসাধারণকে ভারতবর্ষের শোচনীয় অবস্থার কথা শুনাইতেন। পঁচিশ বৎসর পূর্বে যে কেম্ব্রিজ ইউনিয়ন সোসাইটি তাঁহার বক্তৃতায় সরগরম থাকিত, তিনি সেখানেও যাওয়ার সুযোগ ত্যাগ করিলেন না। ভারতবর্ষে তখন স্বৈরশাসন ভাল করিয়াই শুরু হইয়াছে। ফরোয়ার্ড পলিসি বা অগ্রসর নীতির নামে ভারত সরকার জলের মত টাকা খরচ করিতে লাগিলেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের উপজাতি অধ্যুষিত পার্বত্য অঞ্চল হস্তগত করা হইল সেই নীতির উদ্দেশ্যে। সোসাইটিতে এই নীতির সমর্থনে ১৮৯৭ সনের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে একটি প্রস্তাব আসিলে তাহা ভোটে বাতিল হইয়া যায়। আনন্দমোহন এই সভায় উপস্থিত থাকিলেও

বক্তৃতা করেন নাই। ইহার দুই দিন পরে কেম্ব্রিজ সহরে একটি প্রকাশ্য জনসভায় অগ্রসর নীতির বিরুদ্ধে তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে শ্রোতৃমণ্ডলী মুগ্ধ হইয়া যায় এবং এই নীতির বিরুদ্ধে তাঁহারা সর্ব-সম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। লেষ্টার, ওলড্হাম, ডারহাম, লাঙ্কাসায়ার, ম্যাঞ্চেষ্টার, লিভারপুল প্রভৃতি বিলাতের বহু স্থানে তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া ইহার অনুকূলে জনমত গঠন করিতে প্রয়াসী হইলেন। আনন্দমোহনের একনিষ্ঠ নিঃস্বার্থ স্বদেশসেবার কথা ভারতবর্ষে পৌঁছিতেও বিলম্ব হয় নাই। বৎসরেক কাল পরে ১৮৯৮ সনের ৩রা সেপ্টেম্বর বোম্বাই পৌঁছিলে তিনি বিশেষভাবে সম্বর্ধিত হন। ৫ই সেপ্টেম্বর তিনি কলিকাতায় আগমন করেন। এখানে শুধু নেতৃবৃন্দ নহে, সাধারণ জনগণও আনন্দমোহনকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইলেন। তাঁহার স্বদেশবাসীরা এ বৎসর তাঁহাকে একবাক্যে কংগ্রেসের সভাপতি পদে বরণ করিলেন। ১৮৯৮ সনের মাদ্রাজ কংগ্রেস শুধু কংগ্রেসের ইতিহাসে কেন, ভারতবাসীর মুক্তিসাধনার ইতিহাসেও অমর হইয়া আছে। আনন্দমোহন সভাপতির মঞ্চ হইতে মূল এবং উপসংহার বক্তৃতায় ভারতের যে শাশ্বত বাণী নূতন করিয়া ঘোষণা করিলেন, তাহাতে প্রত্যেকেই আশায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে দুইটি সার কথা থাকিয়া থাকিয়া অনুরণিত হইয়া উঠিয়াছে—Love and Service—প্রীতি ও সেবা। আনন্দমোহনের নিকটে হইতে মানব-প্রীতি ও মানব-সেবাকে মূলমন্ত্র করিয়া কংগ্রেস নূতন পথে চলিবার নির্দেশ পাইলেন।

৬

আনন্দমোহন কর্তৃপক্ষের মনোভাব প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ ইতিপূর্বেই পাইয়াছিলেন। ১৮৮৬-৮৭ সনে বঙ্গীয় আইন পরিষদে ছোটলাট কর্তৃক তিনি সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন। নূতন ভারত-শাসন আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৮৯৫-৯৬ এই দুই বৎসরের জন্য তিনি উহার সদস্য নির্বাচিত হন। বিলাতে রক্ষণশীল মন্ত্রিসভা গঠিত হইলে এখানকার কর্তৃপক্ষ ক্রমশঃ প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া উঠেন। আনন্দমোহন ১৮৯৬ সনে কংগ্রেসে শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবে এবং ১৮৯৮ সনে মাদ্রাজে সভাপতির বক্তৃতায় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপের প্রতি ভারতবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৮৯৮ সনে লর্ড কার্জন ভারতবর্ষের বড়লাট হইয়া আসিলেন। তাহার শাসনকালে (১৮৯৮-১৯০৫) ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা যে বিশেষ-ভাবে পদদলিত হইবে, কলিকাতা কর্পোরেশনের ক্ষমতা লাঘবের চেষ্টার মধ্যে প্রথমেই তাহার সূচনা দেখা গেল। আনন্দমোহন বরাবর গণতন্ত্রের একান্ত অনুরাগী ছিলেন। ১৮৭৬ সনে কলিকাতা কর্পোরেশনে 'ইলেকটিভ সিসটেম' বা নির্বাচন-প্রথা প্রবর্তিত হয়। আনন্দমোহন প্রথমে নির্বাচিত ৪৮ জন সদস্যের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। লর্ড কার্জনের এই নির্বাচন প্রথার সঙ্কোচসাধনের অপচেষ্টার মধ্যে গণতন্ত্র নীতির ব্যত্যয় দেখিয়া আনন্দমোহন বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি ঢাকা বিভাগের মিউনিসি-প্যালিটিসমূহ হইতে ১৯০০ সনে পুনরায় দুই বৎসরের জন্য সদস্য নির্বাচিত হন। এবারেও পরিষদের ভিতর হইতে কর্তৃপক্ষের মনোগত উদ্দেশ্যাদির পরিচয় পাওয়া আনন্দমোহনের পক্ষে সম্ভব হইল।

ভারতবর্ষের মত পরাধীন দেশে যে গণতন্ত্র নীতি অনুসৃত হইতে পারে, লর্ড কার্জন একথা আদৌ বিশ্বাস করিতেন না। ভারতবাসী নিজ বাসভূমে পরবাসী। দেশ-শাসন ব্যাপারে ভারতবাসীর অধিকার স্বীকৃত

হইবে এবং সরকারী উচ্চ পদসমূহে তাঁহাদের ক্রমশঃ নিয়োগ করা হইবে, এই উদ্দেশ্যে কংগ্রেস এতদিন আন্দোলন করিয়া আসিয়াছেন। কার্জন এতদুভয়কেই অগ্রাহ্য করিয়া কংগ্রেসের উচ্ছেদ সাধনেই বদ্ধপরিকর হইলেন। বিশ্ববিদ্যালয়-কমিশন বসাইয়া উচ্চশিক্ষার সঙ্কোচ-সাধনের তিনি ব্যবস্থা করেন। বাক্যে ও কর্মে ভারতবাসীর প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিতেও তিনি দ্বিধাবোধ করিতেন না। ১৯০৫ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে তিনি বাঙ্গালীদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়া আখ্যাত করিলেন। ইহার দুই বৎসর পূর্ব হইতেই শাসন কার্যের সুবিধার অজুহাতে তিনি বঙ্গবিভাগের প্রস্তাব জনসমক্ষে উপস্থিত করেন। তাঁহার মত স্বৈরাচারীর এরূপ প্রস্তাবে সকলেই শঙ্কিত হইলেন এবং ১৯০৩ সন হইতে কংগ্রেস ইহার প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ১৯০৫ সনের প্রথমেই বুঝা গেল, বঙ্গ-বিভাগ আসন্ন। বঙ্গদেশের সর্বত্র এজন্য বিক্ষোভ দেখা দিল।

এদিকে বাঙ্গালী তথা ভারতবাসী যাহাতে আত্মস্থ হইয়া উঠে, অন্ততঃ ভাবরাজ্যে, কিছুকাল যাবৎ তাহার আয়োজন চলিতেছিল। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবাসীর সম্মুখে যে ত্যাগ ও সেবার আদর্শ ধরিয়া দিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গলার শিক্ষিত সমাজ নিজ কর্তব্যের নির্দেশ পাইলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরলা দেবী, বিপিনচন্দ্র পাল, ভগিনী নিবেদিতা, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব প্রমুখ মনীষিবৃন্দ বক্তৃতায় ও রচনায় এই নূতন ভাবাদর্শ বা New Spirit স্বদেশবাসীর সম্মুখে ধরিয়া দিলেন। বঙ্গবিভাগ যখন আসন্ন, তখন বাঙ্গালী সমাজ একেবারে অলসভাবে বসিয়া থাকে নাই। কিভাবে ভাবী বিপদের সম্মুখীন হওয়া যায়, তাহার উপায় চিন্তা করিতে থাকে। স্বদেশগতপ্রাণ আনন্দমোহন বাঙ্গালী জাতির এই সমষ্টিগত ভাবনাকে একটি স্পষ্ট রূপ দিয়া সাধারণ্যে ব্যক্ত করিলেন। আসন্ন বঙ্গবিভাগকে সর্বপ্রকারে প্রতিরোধ

করিবার উদ্দেশ্যে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেনের সভাপতিত্বে ১৯০৫ সনের ৭ই আগষ্ট কলিকাতা টাউন হলে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিন প্রাতঃকালে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় ছদ্মনামে আনন্দমোহন যে পত্র প্রকাশিত করেন, তাহাতেই বাঙ্গালী জাতির কর্তব্যের সুস্পষ্ট নির্দেশ মিলিয়াছিল। আনন্দমোহন আরম্ভেই লিখিলেন :

"Let those amongst us who wish to do so, proceed with agitation in England, against the already declared question of the partition of Bengal, though I for one—I may be mistaken—do not believe that any good will result from it in thc existing state of affairs. The conservatives are past praying for, and the Liberals, when they come hereafter into power after the turmoil of a General Election, which will swallow up everything else, will probably plead the logic of 'accomplished fact' over an administrative question like this, as they have done beforc."

বিলাতে আন্দোলন করিয়া যে কোন লাভ হইবে না, বর্ষীয়ান নেতাদের মধ্যে আনন্দমোহনই সর্বপ্রথম স্পষ্ট ভাষায় একথা ব্যক্ত করিলেন। তাঁহার উক্তি সত্য সত্যই ভবিষ্যদ্বাণীর মর্যাদা লাভ করিয়াছিল। 'লিবারেল' ভারতসচিব জন মর্লে ১৯০৬ সনে বঙ্গবিভাগকে "settled fact" বলিয়াই নিজ কর্তব্য সমাধা করিয়াছিলেন। উক্ত পত্রে আনন্দমোহন আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে এই নির্দেশ দিলেন :

"Let us resolve, so far as may be done, by every means in our power to avoid all English goods, and to use those of Indian manufacture instead. Efforts should be made at the same time to make it possible

to use Indian goods by introducing manufactories and industries in our country."

বিলাতী বর্জন এবং স্বদেশী গ্রহণ—এই সংকল্প গ্রহণ করিয়া আমাদের কার্যে অগ্রসর হইতে হইবে। স্বদেশে বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের ব্যবস্থাও আমাদিগকে করিতে হইবে। আনন্দমোহন ইহার দুই দিন পরে 'পত্রিকা'য় লিখিত দ্বিতীয় পত্রে স্বদেশবাসীদের এই বলিয়া সাবধান করিয়া দেন যে কথা অনেক হইয়াছে, বাঙ্গালীদের যে বাক্‌শক্তি আছে, তাহাও সহস্র সভায় প্রমাণিত হইয়াছে। এখন কাজের সময়, কথা ছাড়িয়া তাঁহারা যেন কাজে অগ্রসর হন। বঙ্গবিভাগের কথা সরকারীভাবে ঘোষিত হইলে, দ্বিতীয় পত্রের প্রায় এক মাস পরে, 'পত্রিকা'য় শেষ পত্রখানি লিখিলেন। ইহাতে তিনি লর্ড কার্জনের কার্যকে এই বলিয়া 'অভিনন্দিত' করেন ঃ

"Lord Curzon has done us indeed a signal service and enabled us to lay the foundation of a new national life, if we are only true to ourselves and carry on the work which we have begun. During these weeks we have read in the papers reports of meetings full of grim determination, of immense and unprecedented enthusiasm, of fiery and burning eloquence. The time has fully come when we must translate all this into action and God helping so translate *we shall*. Take this vow and resolve, my friends. If the bolt has fallen on us, let us not forget that the grace, grandeur and beauty of the Lord is as manifest in the thunder as it is in the gentle dew."

এখানেও আনন্দমোহন স্বদেশবাসীকে কর্ম দ্বারা লর্ড কার্জনের

স্বৈরাচারের সমুচিত উত্তর দিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। বাঙ্গালী জাতির মনে যে অভূতপূর্ব সাড়া দেখা দিয়াছে, কর্মে তাহাকে রূপায়িত করা একান্ত প্রয়োজন। তাহা হইলেই লর্ড কার্জন যে আমাদিগকে নবজাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত হইবার সুযোগ দিয়াছেন, তাহা সাফল্যমণ্ডিত হইবে। তিনি আমাদের মস্তকে বজ্র হানিয়াছেন, কিন্তু এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, শিশিরবিন্দুতে যেমন, অশনিতেও তেমনি বিধাতার মঙ্গলহস্ত বিরাজিত। আনন্দমোহনের উপদেশ বিফলে যায় নাই, বাঙ্গালী জাতি কর্মে উদ্বুদ্ধ হইল। বাঙ্গলার নেতৃবৃন্দ অবিভক্ত বাঙ্গলার মূর্ত প্রতীক প্রতিষ্ঠারও আয়োজন করিলেন। সুরেন্দ্রনাথ, নিবেদিতা ও তারকনাথ পালিত এই উদ্দেশ্যে একটি ফেডারেশন হলের পরিকল্পনা করেন। ১৯০৫ সনের ১৬ই অক্টোবর—যেদিন বঙ্গবিভাগ কার্যকরী হইবে, সেই দিনে যুক্তবঙ্গের নিদর্শনস্বরূপ এই হলটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের উদ্যোগ করা হইল। এই দিন রাখীবন্ধন উৎসব পালনও স্থির হয়। আনন্দমোহন পূর্ব হইতেই কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন। এই অনুষ্ঠানে তাঁহাকেই সভাপতি করা ধার্য হইল। চিকিৎসকগণ সমভিব্যাহারে তাঁহাকে ষ্ট্রেচারে করিয়া সভাস্থলে লইয়া যাওয়া হয়। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। বিরাট জনসমাবেশের মধ্যে রুগ্ন আনন্দমোহন সভাপতির পদে বৃত হইলেন। তাঁহার লিখিত অভিভাষণ পাঠ করিলেন সুরেন্দ্রনাথ। আরম্ভেই আনন্দমোহন বলেন যে, মৃত্যুশয্যা হইতে আসিয়া তিনি এখানে একটি জাতির নবজন্ম লক্ষ্য করিতেছেন। তিনি বলেন ঃ

"I belong to the sundered province of East Bengal, and yet my brethern, never did my heart cling more dearly to you or your hearts cherish us more lovingly than at the present moment, and for

all the future that lies before us. The 'official' separation has drawn us indeed far closer together, and made us stronger in united brotherhood. Hindu, Mussalman and Christian, North, East and West, with the resounding sea beneath, all belong to one indivisible Bengal ; say again, my friends, from the depths of your hearts, to one indivisible Bengal, the common, the beloved, the ever-cherished Motherland of us all. In spite of every other separation of creed, this creed of the Common Motherland will bring us nearer heart to heart and brother to brother."

আনন্দমোহন—জগতে এই শেষবার দেশবাসীর উদ্দেশে নিজ বক্তব্য নিবেদন করিলেন। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার এই বক্তৃতাকে Swan Song বা 'শেষ সঙ্গীত' বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। স্বদেশী আন্দোলনে ছাত্রগণ যাহাতে যোগদান না করে, সে উদ্দেশ্যে একটি সরকারী সার্কুলার প্রচারিত হয়, কার্লাইল সাহেব দ্বারা ইহা বিজ্ঞাপিত হয় বলিয়া ইহা 'কার্লাইল সার্কুলার' নামে পরিচিত। বিপিনচন্দ্র পাল এই সার্কুলার সম্পর্কে আনন্দমোহনের অভিমত প্রার্থনা করিলে, একটিমাত্র কথায় আনন্দমোহন তাহার উত্তর দেন—'Defiance'! অর্থাৎ এই সার্কুলারকে অগ্রাহ্য করিয়া চল। আনন্দমোহন এক পূর্ণাঙ্গ বঙ্গজননীর মূর্তি দর্শন করিয়াছিলেন। অনবদ্য ভাষায় তাহারই তিনি রূপ দিয়াছেন। তাঁহারই স্বাক্ষরে ঐ দিন বাঙ্গালী জাতি বিভক্ত বঙ্গকে যুক্ত করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া একটি সঙ্কল্পবাক্য পাঠ করিলেন।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রসার ও পরিণতি আজ ইতিহাসের বস্তু।

বাঙ্গালী জাতি সেই যে আত্মশক্তির আস্বাদ পাইয়াছিল তাহা তাহারা কখনও ভুলে নাই ; নানা বিপদ আপদের মধ্যেও বঙ্গসন্তানেরা নিজেদের মাথা উঁচু করিয়া রাখিয়াছে। ইদানীন্তন বাঙ্গলার সম্মুখে যে সমস্যা দেখা দিয়াছে, আনন্দমোহনের উক্তির মধ্যে তাহার সন্ধান মিলিতে পারে কি না, ভাবিয়া দেখার বিষয়। আনন্দমোহনের স্বদেশভক্তি ও স্বজাতিপ্রীতি যুগে যুগে বাঙ্গালী জাতিকে আত্মশক্তিতে আস্থাবান করিয়া তুলুক এখন আমরা সেই কথাই অন্তরের সহিত কামনা করি।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১

সংস্কৃতি ও রাজনীতি-ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতার বাণী যখন আমরা শুনিতেছিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে কার্যেও কতকটা অগ্রসর হইতেছিলাম সেই সময় বঙ্গদেশে এমন এক ব্যক্তি আবির্ভূত হইলেন যিনি অদম্য হৃদয়াবেগ এবং অটুট কর্মশক্তি দ্বারা জাতীয়তামূলক জল্পনাকল্পনাকে একটি স্পষ্ট ও সার্থক রূপ দিতে সক্ষম হইলেন। দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জাতির রাষ্ট্রীয় জীবনে যে অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা চিরদিনই আমাদের স্মৃতি পথে জাগরূক থাকিবে। গত শতাব্দীর সপ্তম দশকে জাতীয়তামূলক ভাবধারা এবং কর্মপ্রবৃত্তিকে তিনি যুবসমাজের মনে এমন করিয়া দৃঢ়বদ্ধ করিয়া দিলেন যে, তাহা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল, কোন বাহিরের শক্তি তাহাকে দমাইয়া রাখিতে পারিল না। সুরেন্দ্রনাথ ইংরেজী ভাবধারা তথা পাশ্চাত্য পরিবেশের মধ্যে মানুষ। পিতা দুর্গাচরণ এককথায় বলিতে গেলে পশ্চিমেরই পূজারী ছিলেন। বিলাতের পার্লামেণ্টারী বা প্রতিনিধিমূলক শাসন আধুনিক গণতন্ত্রের মূল উপজীব্য। সুরেন্দ্রনাথ এরূপ শাসনব্যবস্থা ভারতবর্ষে প্রবর্তন করাইতে সবিশেষ উদ্যোগী হন। শেষ জীবনে ইহার কতকটা পরিপূর্তিও তিনি স্বয়ং দেখিয়া গিয়াছেন। শাসনে আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার যে-সব উপায় বিদ্যমান তাহার মধ্যে তিনি আইনানুগ পন্থাকেই বাছিয়া লইয়াছিলেন। প্রথম জীবনের উদ্দাম কর্ম-প্রণালী দেখিয়া কেহ কেহ সুরেন্দ্রনাথকে বিপ্লবপন্থী বলিয়া মনে করিতেন, হয়ত অবস্থার পরিবর্তন না ঘটিলে এইরূপই হইবার সম্ভাবনা বেশী ছিল।* কিন্তু বস্তুতঃ তাহা হয় নাই, তাঁহার ভিতরকার

* কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা এলান অক্টেভিয়ান হিউম ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতা কর্পোরেশন হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি

পাশ্চাত্য ভাবে গড়া মানুষটিই বিকশিত হইবার উপযুক্ত ক্ষেত্র লাভ করিয়াছিল।

সুরেন্দ্রনাথ ১৮৪৮ সালের নভেম্বর মাসে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা দুর্গাচরণ হিন্দু কলেজে শিক্ষিত, পাশ্চাত্যভাবাপন্ন, সুচিকিৎসক। পুত্রকেও তিনি মনোমত শিক্ষা দিতে ত্রুটি করেন নাই। পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর পুত্রকে তিনি পেরেণ্টাল একাডেমী নামক ফিরিঙ্গী-স্কুলে ভর্তি করিয়া দেন। সেখানকার পাঠ শেষ করিয়া ডাভটন কলেজে সুরেন্দ্রনাথ ভর্তি হইলেন। এখানে ফিরিঙ্গী এবং ইংরেজ অধ্যাপকদের নিকট ইংরেজী, লাটিন প্রভৃতি ভাল করিয়াই শিখেন। ১৮৬৮ সনে এখান হইতে তিনি বি-এ পাস করেন। এই বৎসরই ৩রা মার্চ তারিখে সুরেন্দ্রনাথ, রমেশচন্দ্র দত্ত এবং বিহারীলাল গুপ্ত তিন বন্ধুতে বিলাতযাত্রা করেন। উদ্দেশ্য, সিবিল সার্বিস পরীক্ষা দিয়া সিবিলিয়ান হওয়া। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সুরেন্দ্রনাথ পিতার অনুমতি এবং আশীর্বাদ লইয়া বিলাত রওনা হন, অন্য দুই জন গোপনে তাঁহার সঙ্গী হইলেন।

বৎসরখানেক অধ্যয়নের পর সুরেন্দ্রনাথ, বন্ধুদ্বয় এবং বোম্বাইয়ের শ্রীপদ বাবাজী ঠাকুর চারি জনে সিবিল সার্বিস পরীক্ষা দিলেন এবং চারি জনই উত্তীর্ণ হইলেন। কিন্তু ইহাতে শ্বেতাঙ্গ কর্তৃপক্ষ আনন্দিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং বিমর্ষ হইলেন। কেননা তাঁহারা ইতিমধ্যেই ভারতবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিবাদী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তখন সিবিল সার্বিস

নির্বাচিত হইলে বিলাতস্থ *India* মাসিকে লিখিয়াছিলেন, "The election of Babu Surendra Nath Banerjea by the Calcutta Corporation, to a seat on the Bengal Legislative Council, completes happily the first act of a drama of real life which at one time threatened to evolve in a painful tragedy."—*A Nation in Making*. P. 407.

পরীক্ষার্থীদের বয়স অন্যূন উনিশ এবং অনধিক একুশ ধার্য ছিল। সিবিল সার্বিস পরীক্ষকমণ্ডলী সুরেন্দ্রনাথ ও শ্রীপদ বাবাজী ঠাকুরকে বয়সাধিক্যের অজুহাতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেও ইহাতে প্রবেশের অনুপযুক্ত বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইহা লইয়া এদেশে ও বিলাতে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হয়। শেষ পর্যন্ত সুরেন্দ্রনাথকে বিলাতের আদালতের আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। বিচারে কিন্তু তাঁহার জিত হয়। তাঁহার বয়স অনধিক একুশ বলিয়াই বিচারকগণ রায় দিলেন। শ্রীপদ বাবাজী ঠাকুর আদালতে না গিয়াই সুরেন্দ্রনাথের সকল সুবিধা ভোগ করিতে পাইলেন। এই সংবাদ ভারতবর্ষে পেঁাছিবার মাত্র এক দিন পূর্বে দুর্গাচরণ মারা যান, তিনি পুত্রের সাফল্যের কথা আর শুনিয়া যাইতে পারেন নাই।

সুরেন্দ্রনাথ বন্ধুগণের সঙ্গে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। কলিকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়া তাঁহা-দিগকে দেশবাসীর পক্ষ হইতে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন। এই বৎসরই ২২শে নবেম্বর সুরেন্দ্রনাথ এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া শ্রীহট্টে চলিয়া যান। এদেশের শ্বেতাঙ্গ সিবিলিয়ানগণও চাহিত না যে, কোন ভারতবাসী তাহাদের গোষ্ঠীতে প্রবেশ করিয়া তাহাদের সমমর্যাদা লাভ করে। শ্রীহট্টেও ইহার অন্যথা ঘটে নাই। সেখানকার সিবিলিয়ানগণ, বিশেষতঃ সুরেন্দ্রনাথের উপরিতন কর্মচারী তাঁহার উপর প্রথমাবধি বিশেষ বিরূপ ভাব ধারণ করিলেন। তথাপি তিনি প্রায় দুই বৎসর কাল ভালরূপেই কার্য চালাইতেছিলেন। শেষে উক্ত উপরিতন সিবিলিয়ানটি একটি মাত্র ত্রুটি পাইয়া সুরেন্দ্রনাথের উপর খাপ্পা হইয়া উঠেন। যুধিষ্ঠির নামক এক আসামী ফেরার ছিল না, তথাপি তাহাকে ফেরার বলিয়া লেখা কাগজে স্বাক্ষর করায় সুরেন্দ্রনাথ তৎকর্তৃক সস্‌পেণ্ড হইলেন। এ বিষয়টি অনুসন্ধানের জন্য এই সিবিলিয়ান-পুঙ্গবের সুপারিশে ভারত-সরকার এক কমিশন বসাইলেন। কমিশনের বিচারে সুরেন্দ্রনাথ

দোষী সাব্যস্ত হন। ভারত গভর্ণমেণ্ট কমিশনের মত গ্রহণ করিয়া পঞ্চাশ টাকা মাত্র 'অনুকম্পা' ভাতা দিয়া সুরেন্দ্রনাথকে কার্য হইতে অপসৃত করিলেন। এই বিচার-প্রহসন তখন বাঙ্গালীর প্রাণে শেলের মত বাজিয়াছিল। সংবাদপত্রে ইহা লইয়া খুবই লেখালেখি হইল, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। সুরেন্দ্রনাথ অবশেষে সুবিচারের আশায় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে বিলাতে রওনা হন। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, সেখানকার কর্তৃপক্ষ ভারতবাসীর উপর বিশেষ বিরূপ ছিল। এ কারণ বিলাতে গেলেও কোন ফলোদয় হইল না। ইহার পর ব্যারিষ্টারী সনদ লইবার চেষ্টা করিয়াও তিনি বিফলমনোরথ হইলেন। কর্মচ্যুতির অজুহাতে ব্যারিষ্টারী সনদ হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করা হইল! সুরেন্দ্রনাথ নিঃস্ব অবস্থায় ১৮৭৫ সনের জুন মাসে স্বদেশে ফিরিলেন। তখন পিতৃবন্ধু পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁহার সহায় হন। তিনি তাঁহাকে মাসিক দুই শত টাকা বেতনে তদীয় মেট্রোপলিটন কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করিলেন। সুরেন্দ্রনাথের সত্যকার কর্মজীবন তথা দেশসেবা এইখানেই প্রথম আরম্ভ হয়।

২

বঙ্গজননীর আর একটি সুসন্তান, পরবর্তী কালে সুরেন্দ্রনাথের বিশিষ্ট বন্ধু ও সহকর্মী, ভারতবর্ষের প্রথম র‍্যাঙ্গলার আনন্দমোহন বসু ব্যারিষ্টারী সনদ লইয়া ইহার পূর্ব বৎসর (১৮৭৪, ১২ই অক্টোবর) কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। স্বদেশের উন্নতিসাধন তাঁহারও জীবনের মূলমন্ত্র। তিনি কলিকাতার যুব-ছাত্রগণকে একত্র করিয়া ১৮৭৫ সালের এপ্রিল মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজে একটি ষ্টুডেণ্টস্ এসোসিয়েশন বা ছাত্র-সভা স্থাপন করেন। বিশিষ্ট বাঙ্গালীগণ এখানে বক্তৃতাদানের জন্য আহূত হইতেন।

সুরেন্দ্রনাথ অধ্যাপনা কার্যে লিপ্ত হইবার পর ছাত্র-সভা তাঁহাকেও বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান করেন। তাঁহার বিখ্যাত 'শিখশক্তির অভ্যুদয়,' 'ম্যাটসিনি জীবন-কাহিনী ও নব্য ইটালী' শীর্ষক বক্তৃতাগুলি এখানে প্রদত্ত হয়। 'চৈতন্যদেব' সম্পর্কীয় বক্তৃতা তিনি ভবানীপুরে প্রদান করেন। তাঁহার এই সকল বক্তৃতা যুব-সমাজর মনে তড়িৎ প্রবাহের মত দেশপ্রেমের ভাববন্যা ছুটাইয়া দিল। স্বদেশের পূর্বতন ইতিহাস তাহাদের সম্মুখে সত্যভাবে দেখা দিল। বিদেশের, বিশেষ করিয়া ইটালীর নবলব্ধ স্বাধীনতার কথা যুবকদের মনে এক অপূর্ব চেতনার উদ্রেক করিল। বিপিনচন্দ্র পাল বলেন, তখন ইটালীয় কার্বোনারির আদর্শে বঙ্গদেশে বহু গোপন সভা স্থাপিত হয়। একটি সভার কথা অপর একটি সভার জানিবার উপায় ছিল না। সুরেন্দ্রনাথ যুবকদের মনে এতই শ্রদ্ধাপ্রীতির উদ্রেক করিয়াছিলেন যে, এইরূপ পরস্পর-বিচ্ছিন্ন একাধিক সভা তাঁহাকে সভাপতিপদে বরণ করিল। কার্বোনারির আদর্শে প্রতিষ্ঠিত এই সকল সভার সভ্যগণ তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা বক্ষস্থল ভেদ করিয়া রক্ত বাহির করিত এবং তাহা দিয়া দেশভক্তিসূচক প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিত।

জাগ্রত যুবকশক্তিকে সংহত করিয়া কিরূপে সত্যিকার দেশসেবায় তাহা প্রয়োগ করা যায় তদ্বিষয়েও সুরেন্দ্রনাথ চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই সময় দেশবাসী জনসাধারণকে এবং বিশেষ করিয়া তথাকথিত শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা আনিবার জন্য কলিকাতায় একটি কেন্দ্রীয় সভার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। শিশিরকুমার ঘোষের ইণ্ডিয়ান লীগের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ ইহার পরিচালনা ব্যাপারে নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লইতে না পারিয়া প্রারম্ভিক আলোচনান্তে ১৮৭৬ সনের ২৬শে জুলাই ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারত-সভা প্রতিষ্ঠা করিলেন। সুরেন্দ্রনাথ এই সভা প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। সভা প্রতিষ্ঠার জন্য যে

দিন সভা হয় সেইদিনই সভা বসিবার কিছুক্ষণ পূর্বে তাঁহার একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হয়। কিন্তু তিনি এমনি কর্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন যে, পুত্রের মৃত্যুও তাঁহাকে সভায় উপস্থিত হইতে বিরত করিতে পারিল না। সিবিল সার্বিসের অন্তর্ভুক্ত শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের দ্বারা ভারতের শাসন কার্য নির্বাহ করা হইত। ভারতবাসীরাও দুই এক জন করিয়া ইহাতে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। কর্তৃপক্ষের ইহা অভিপ্রেত না হওয়ায় উচ্চতম বয়স একেবারে একুশ হইতে কমাইয়া উনিশ করা হইল ; উদ্দেশ্য—ভারত-শাসন ব্যাপারে ভারতবাসীরা যাহাতে যোগ্য অংশ গ্রহণ করিতে না পারে। প্রতিষ্ঠার পরই ভারত-সভা কর্তৃপক্ষের এইরূপ কার্যের প্রতিবাদে অগ্রসর হইলেন। সুরেন্দ্রনাথ নিজে স্বার্থপর সিবিলিয়ান-মণ্ডলী এবং বিলাতের কর্তৃপক্ষের মনোভাব ভালভাবেই বুঝিয়াছেন। তিনি ইহার প্রতিবাদে ভারত-সভাকে কেন্দ্র করিয়া আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। এই সভা প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় বৎসরে তিনি সমগ্র উত্তর-ভারত পরিক্রমা করেন। ১৮৭৮ সালে বিধিবদ্ধ সংবাদপত্র আইন, অস্ত্র আইন প্রভৃতির বিরুদ্ধে ভারত-সভা আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। গঠনমূলক কার্যেও সভা হস্তক্ষেপ করেন। সর্বত্র স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠা, প্রজাস্বত্ব আইন, মাদকদ্রব্য নিবারণ, শিক্ষা-সংস্কার প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারত-সভা কার্য শুরু করিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন ভারত-সভার প্রাণ। স্বদেশে এবং বিদেশে দেশোন্নতিমূলক কার্য পরিচালনার জন্যও তিনি অগ্রণী হন। ১৮৭৯ সনের ১লা জানুয়ারী 'বেঙ্গলী' পত্রিকার স্বত্ব ক্রয় করিয়া তিনি ইহা সম্পাদন করিতে আরম্ভ করেন। 'বেঙ্গলী' ভারত-সভার মুখপত্র হইয়া উঠিল। ইহার পর ১৮৮৩ সনের একটি ঘটনায় সুরেন্দ্রনাথ জনচিত্ত একেবারে জয় করিয়া ফেলিলেন। বিচারপতি নরিস হাইকোর্টের এক মামলায় সাক্ষীস্বরূপ শালগ্রাম-শিলা আনয়ন করান। এই সংবাদ কাগজে বাহির হইলে সুরেন্দ্রনাথ "বেঙ্গলী"তে নরিসের এতাদৃশ আচরণের

তীব্র প্রতিবাদ করেন। আদালত অবমাননার দায়ে হাইকোর্টে তাঁহার নামে মামলা রুজু হইল। সুরেন্দ্রনাথের পক্ষে সওয়ালজবাব করেন সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চে বিচার হইল। বিচারে সুরেন্দ্রনাথ কারাগারে প্রেরিত হইলেন। ধর্ম বিষয় সমর্থন করিতে গিয়া সুরেন্দ্রনাথকে এইরূপ দণ্ডভোগ করিতে হওয়ায় ভারতবর্ষের সর্বত্র বিক্ষোভ উপস্থিত হইল। কলিকাতার ছাত্রসমাজ একেবারে ক্ষেপিয়া গেল। তাহারা আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে গিয়া নিজেদের বিক্ষোভ প্রদর্শন করিল।

সুরেন্দ্রনাথ যখন কারাগারে তখনই বঙ্গদেশে জাতীয় কার্য নির্বাহের জন্য একটি ন্যাশন্যাল ফাণ্ড বা জাতীয় ভাণ্ডার গঠনের প্রস্তাব হয়। সুরেন্দ্রনাথ ইংরেজী ৪ঠা জুলাই কারামুক্ত হইলেন। জাতীয় ভাণ্ডারকে কেন্দ্র করিয়া ভারত-সভা একটি ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্স বা জাতীয় সম্মেলনেরও আয়োজন করেন এবং সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন ইহাতে প্রধান উদ্যোগী। এই বৎসর ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় জাতীয় সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হয়। প্রতিনিধিমূলক শাসন-ব্যবস্থা, সিবিল সার্বিস এবং অন্যান্য বহু বিষয়ে আলোচনান্তে কতকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হইল। ইহার পর ১৮৮৪ সালে সুরেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় বার উত্তর-ভারত পরিক্রমায় বাহির হইলেন। ১৮৮৫ সনে পুনরায় কলিকাতায় জাতীয় সম্মেলনের অধিবেশন হইল। এবারে স্থানীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও ইহার সঙ্গে যোগ দান করে। সুরেন্দ্রনাথ ইহার সহিত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন এবং স্বয়ং একাধিক প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। জাতীয় সম্মেলন শেষ হইবার পর দিন বোম্বাইয়ে ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হইল। বঙ্গের জন-আন্দোলন এবং সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতৃবর্গকে এড়াইয়া চলিবার জন্যই যেন বোম্বাইয়ের এই পাল্টা অধিবেশন— লোকের মনে এইরূপ বিশ্বাস জন্মে,

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ইতিহাস যাঁহারা জানেন তাঁহাদের নিকট ইহা একেবারে অমূলক বলিয়া বিবেচিত হইবে না। বস্তুতঃ কংগ্রেস জনগণের মুখপাত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই। ইহার উদ্দেশ্য ছিল—গবর্ণমেণ্ট এবং নবজাগ্রত জনশক্তির মধ্যে ইণ্টার-প্রিটার বা দোভাষীর কাজ করা। ইহাকে উভয়ের মধ্যে মধ্যস্থের কাজ করাও বলা যাইতে পারে। কিন্তু ভারত-সভা তথা সদ্য-আরব্ধ জাতীয় সম্মেলন ছিল ভারতীয় জনশক্তির প্রতীক। সমগ্র উত্তর-ভারতে এবং বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ভারত সভার শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। জাতীয় সম্মেলনে শুধু উত্তর ভারতের নহে, দক্ষিণ ভারত হইতেও বিশিষ্ট প্রতিনিধিগণ আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন।

৩

কিন্তু সুরেন্দ্রনাথকে এড়াইয়া কংগ্রেসের কার্য বেশী দিন চলিতে পারিল না। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠাতা হিউম সাহেব ১৮৮৬ সনে কলিকাতায় আগমন করিবার পরই বুঝিতে পারিলেন এখানে কংগ্রেসের অধিবেশন করিতে হইলে জননায়ক সুরেন্দ্রনাথকে বাদ দিলে চলিবে না। অগত্যা সুরেন্দ্রনাথও কংগ্রেসে গৃহীত হইলেন। ইহার পর কংগ্রেসই তাঁহার রাজনৈতিক কার্যের প্রধান ক্ষেত্র হইয়া উঠিল। কংগ্রেস সুরেন্দ্রনাথ তথা জাতীয় সম্মেলনকে এইরূপে আত্মসাৎ করিয়া ফেলায় দেশের কতখানি লাভ-ক্ষতি হইয়াছে মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল তাহার একটি চমৎকার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি লিখিলেন,—

"কংগ্রেস যতটা রাতারাতি বাড়িয়া উঠিয়াছিল, সুরেন্দ্রনাথের কনফারেন্সের পক্ষে তাহা সম্ভব হইত না। অন্যদিকে সুরেন্দ্রনাথের এই কর্ম-চেষ্টা যদি কংগ্রেসের দ্বারা এইরূপে ব্যাহত না হইত, তাহা হইলে

দেশে আজ যে প্রভূত শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় জীবন ও লোকমত গড়িয়া উঠিত, কংগ্রেস যে তাহা কেবল গড়িয়া তুলিতে পারে নাই তাহা নহে, কিন্তু সাক্ষাৎভাবে তাহার ব্যাঘাতই জন্মাইয়াছে। কংগ্রেস দেশের অনেক কল্যাণ সাধন করিয়াছে সত্য, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ ভারতের জেলায় জেলায় লোকমত সংগঠনের জন্য যে সকল রাষ্ট্রীয় সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ও করিতেছিলেন সেগুলির শক্তি হরণ করিয়া কংগ্রেস প্রকৃত রাষ্ট্রীয় জীবনকে যে দুর্বল করিয়াছে তাহাও অস্বীকার করা সম্ভব নহে। কংগ্রেসের প্রধান কীর্তি দুটি—, লাট ক্রসের ১৮৯১ সালের ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল্‌স্ এ্যাক্ট, আর লাট মর্লের আধুনিক কাউন্সিল সংস্কার। কিন্তু দেশের জেলায় জেলায় যে সকল রাষ্ট্রীয় সভা গড়িয়া উঠিতেছিল তাহাকে নষ্ট করিয়া দেশের কংগ্রেস দেশের যে ক্ষতি করিয়াছে এ সকলের কিছুতেই সেই ক্ষতি পূরণ করিতে সমর্থ হয় নাই হইবেও না। ফলতঃ কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক রাষ্ট্রীয় কর্ম-চেষ্টায় সুরেন্দ্রনাথের অনন্য-প্রতিযোগী অধিনায়কত্ব লাভের পথ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। তখন হইতে সুরেন্দ্রনাথ কিয়ৎ পরিমাণে কংগ্রেসের অর্থশালী নেতৃবর্গের মুখাপেক্ষী হইয়া, আপনি যে পথে চলিয়া দেশের প্রজাশক্তিকে জাগাইয়া তুলিতেছিলেন, সে পথ অনেকটা পরিত্যাগ করিয়া বহুল পরিমাণে আপনার কর্ম-জীবনের সম্পূর্ণ সফলতারও ব্যাঘাত উৎপাদন করেন।"* মর্লে-মিণ্টো সংস্কার প্রবর্তনের (১৯০৯) অল্পকাল পরেই বিপিনচন্দ্র এইরূপ লিখিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস ১৯২০ সন হইতে প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতের প্রজাশক্তির সত্যিকার মুখপাত্র হইয়া দাঁড়ায় এবং সুরেন্দ্রনাথের প্রথম যুগের কর্মপ্রণালী অনুসরণ করিতে আরম্ভ করে। ইহার সুফল আমরা আজ প্রত্যক্ষ করিতেছি।

---

* চরিত-কথা—বিপিনচন্দ্র পাল, পৃঃ ৫৩-৪।

যাহা হউক, সুরেন্দ্রনাথ কংগ্রেসে কায়মনে যোগদান করিয়া নিজেকে ইহার মধ্যে একেবারে বিলাইয়া দিলেন। তিনি প্রচুর ত্যাগ স্বীকার করিয়া কংগ্রেসের পক্ষে প্রচার কার্য পরিচালনার জন্য ১৮৯০ সনে বিলাতেও গমন করেন। ১৮৮৬ সন হইতে ১৯১৮ সনে কংগ্রেস পরিত্যাগ করা পর্যন্ত প্রায় প্রতি বৎসরই তিনি কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দেন এবং নানা বিষয়ে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিয়া বাঞ্ছিত সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে ইহাকে সাহায্য করেন। তিনি দুই বার কংগ্রেসের সভাপতি পদে বৃত হন। প্রথম বার ১৮৯৫ সনে পুনা অধিবেশনে, দ্বিতীয় বার ১৯০২ সনে আমেদাবাদ কংগ্রেসে। এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, প্রথম বার সভাপতির অভিভাষণ পাঠের পরিবর্তে তিনি একাদিক্রমে চারি ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করিয়াছিলেন। লিখিত অভিভাষণের সঙ্গে তাঁহার হুবহু মিল দেখিয়া উপস্থিত জনমণ্ডলী অবাক হইয়া যান।

সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতা শক্তি প্রায় শেষ জীবন পর্যন্ত অটুট ছিল। রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনায় এই গুণটির একান্ত প্রয়োজন। ইদানীং বঙ্গদেশে সুবক্তার অভাব হইয়াছে। কিন্তু রাজনৈতিক অধিকার লাভের সঙ্গে সঙ্গে এর উপকারিতা আমাদের আরও বেশী করিয়া হৃদয়ঙ্গম হওয়া উচিত। সুরেন্দ্রনাথ ১৮৯৭ সনে বিলাতে ভারতবর্ষ ও বিলাতের আর্থিক সম্পর্ক সম্বন্ধে অনুসন্ধানের নিমিত্ত গঠিত ওয়েলবি কমিশনে সাক্ষ্য দিবার জন্য পুনরায় বিলাত গমন করেন। বিলাতের জনসাধারণের সদিচ্ছার উপরে সে-যুগের কংগ্রস নেতৃবৃন্দের বিশ্বাস ছিল। তাঁহারা বিলাতে গিয়া ভারতবাসীদের অবস্থা সেখানকার অধিবাসীদের জ্ঞাপন করাইবার জন্য জনসভায় বক্তৃতা দিতেন। সুরেন্দ্রনাথ এ সুযোগ ছাড়িলেন না। তিনি বিভিন্ন স্থলে বক্তৃতাদি দ্বারা ব্রিটেনের জনমতকে ভারতবাসীদের দিকে আকৃষ্ট করিতে প্রয়াসী হন।

৪

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই বাঙ্গালী তথা ভারতীয় মনীষীদের চিত্তে একটি নূতন ভাবধারা উপস্থিত হয়। এ বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ গত শতাব্দীর শেষ দশকেই নিজের বক্তব্য সর্বপ্রথম সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন। ভারতবাসীর রাজনৈতিক প্রচেষ্টার ইতিহাসে ইহা একটি নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিল। এতদিন কংগ্রেসের নেতৃবর্গ ইংরেজ এবং ভারতবাসীর মিলিত চেষ্টায় ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় উন্নতির প্রয়াস পাইতেছিলেন। ইংরেজের শুভেচ্ছার উপরই ইহা অধিক নির্ভর করে বলিয়া তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ভারতবাসী যতই সচেতন হইতে থাকে ইংরেজের শাসন-শৃঙ্খল ততই দৃঢ় হয়। বিলাতের অর্থ এদেশে ঢালিয়া এদেশবাসীদের আর্থিক দিক দিয়াও ইংরেজের অধীন করা হইতে লাগিল, আর ইহাতে ইংরেজের শাসন-ব্যবস্থাই তাহার সহায় হইল। ইংরেজ ধনিক এবং জনসাধারণ উভয়েরই স্বার্থ দাঁড়াইল ভারতবর্ষকে নিজ করায়ত্ত করিয়া রাখার মধ্যে। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের ইহা বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই, কংগ্রেসেও ইহার প্রতিষেধক কোন কোন প্রস্তাব পাস হইতে থাকে। কিন্তু ভারতবাসীর মধ্যে সক্রিয় রাষ্ট্রবুদ্ধি জাগ্রত করিবার পক্ষে উহা মোটেই যথেষ্ট ছিল না। যাহাতে ইংরেজ-নিরপেক্ষ হইয়া আমরা স্বদেশের সত্যিকার স্বাধীনতা-প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইতে পারি তদ্বিষয়েও কেহ কেহ চিন্তা করিতে লাগিলেন, আর বাঙ্গালীর মস্তিষ্কেই এই চিন্তা আগে উদিত হইল।

বাঙ্গালীর এই নবজাগ্রত চেতনাকে ব্যাহত করার জন্য শাসন-শৃঙ্খলা স্থাপনের অছিলায় লর্ড কার্জন ১৯০৫ সনের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গদেশকে দ্বিধা বিভক্ত করিলেন। কার্জন ইহার কিছুকাল পূর্ব হইতেই এইরূপ মতলব আঁটিতেছিলেন। ইহার আঁচ পাইয়া কংগ্রেসে এবং অন্যত্র প্রতিবাদও যথেষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু তিনি তাহাতে কোনরূপ কর্ণপাত

করেন নাই। ইহার প্রতিরোধ প্রচেষ্টায় শুধু বঙ্গদেশের জনগণ অভূতপূর্ব সাড়া দিল। আবালবৃদ্ধবনিতা রাখীবন্ধন এবং অরন্ধন দ্বারা ইহার সঙ্গে তাহাদের আন্তরিক সংযোগের কথা জানাইয়া দিল। স্বদেশী আন্দোলন বলিয়া ইহা সর্বত্র খ্যাতিলাভ করিয়াছে। বিলাতীবর্জন এবং স্বদেশীগ্রহণ ইহার মূলমন্ত্র হইল। সুরেন্দ্রনাথ এই আন্দোলনের পুরোভাগে আসিয়া পড়িলেন। তাঁহার অকৃত্রিম দেশপ্রেম অপূর্ব বাগ্মিতাশক্তির সঙ্গে মিশিয়া বঙ্গজনের তাপিত প্রাণে অমৃত বারি সিঞ্চন করিতে লাগিল।

বরিশালে স্বদেশী আন্দোলনের উন্মাদনা অপরূপ আকার ধারণ করে। ১৯০৬ সনের ১৩ই এপ্রিল সেখানে প্রাদেশিক সম্মেলন আহূত হয়। কিন্তু সরকারী আদেশ—'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি কেহ করিতে পারিবে না। ইহার প্রতিবাদে তত্রত্য রাজা বাহাদুরের হাবেলি হইতে সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করিতে করিতে শোভাযাত্রা বাহির হইল, কিন্তু পুলিশের লাঠির আঘাতে ইহা ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। অনেকে রক্তাক্তকলেবর হইলেন, সুরেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে তিনি আটক রহিলেন। ওদিকে প্রকাশ্য সম্মেলনকেও দ্বিতীয় দিনে স্বল্প কার্য পরিচালনার পর কর্তৃপক্ষ বন্ধ করিয়া দিলেন। সরাসরি বিচারে সুরেন্দ্রনাথের চারিশত টাকা জরিমানা হইল। প্রকাশ, জননেতা সুরেন্দ্রনাথকে দণ্ড দিয়া অন্যদের এ আন্দোলন হইতে নিরস্ত করাই কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু তাহা সম্ভব হইল না। আন্দোলন কোন কোন স্থলে যদি-বা পূর্বে কিছু কম ছিল, উহার পর তাহা সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় ফিরিয়া হাইকোর্টে আপীল করিলেন, তাঁহার বিচার বেআইনী হইয়াছে বলিয়া হাইকোর্ট রায় দিলেন। এই স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যেই বঙ্গদেশে দুইটি মতবাদ প্রবল হইয়া উঠে এবং ইহার ফলে রাজনৈতিকগণ মডারেট বা নরমপন্থী এবং একৃষ্ট্রিমিষ্ট বা চরমপন্থী বলিয়া পরিচিত হন। সুরেন্দ্রনাথ

প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়েন। সুরাট কংগ্রেসে এই দুই মতবাদের চরম সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, দুই দলের মধ্যে বিবাদ হেতু এ বারে কংগ্রেসের অধিবেশন আর হইতে পারিল না।

এই সময় বঙ্গে বিপ্লববাদ আত্মপ্রকাশ করে। পদস্থ শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের হত্যা করিয়া ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের পথ পরিষ্কার করিয়া লওয়া ছিল ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। ইহার মুখপত্রস্বরূপ 'যুগান্তর' বাহির হইল। সুরেন্দ্রনাথ নরমপন্থী দলভুক্ত হইলেও এই বিপ্লববাদীদের কোনও কোনও কার্যের সঙ্গে তাহার যোগ ছিল, 'যুগান্তর'-সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (অধুনা ডক্টর) এই কথা লিখিয়াছেন,—

"[প্রফুল্ল চাকীকে] পূর্ব বঙ্গের গবর্ণর [সার ব্যামফিল্ড] ফুলারকে মারিবার জন্য রঙ্গপুর হইতে আনান হইয়াছিল। এই ফুলার বধ চেষ্টা ৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রণোদিত হইয়াছিল। এইজন্য বোমার নির্মাণ সময় হইতে ফুলারের ভারতত্যাগ পর্য্যন্ত সমস্ত সংবাদ তাঁহাকে দেওয়া হইত।...বোমা নির্মাণকালে সিমুল-তলায় তাঁহাকে দেখান হইয়াছিল। ইহাই ভারতের প্রথম 'বোমা' নির্মাণ।*

৫

চরমপন্থী-বর্জিত খণ্ডিত কংগ্রেসের অধিবেশন যথারীতি প্রতি বৎসর হইতে লাগিল। সুরেন্দ্রনাথের আগ্রহাতিশয্যে প্রতিবারেই বঙ্গভঙ্গ রদ করার প্রস্তাব উত্থাপিত ও গৃহীত হইত। ইতিমধ্যে শাসন-সংস্কারমূলক আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হয়। ইহার ফল ১৯০৯ সনের মর্লে-মিণ্টো শাসন-সংস্কার। সুরেন্দ্রনাথ এই বৎসর লণ্ডনে অনুষ্ঠিত এম্পায়ার প্রেস সম্মেলনে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি রূপে যোগদান করেন। তিনি এই

* অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড—ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত পৃঃ ৪৮-৯।

সুযোগে ইংলণ্ডবাসীদের বঙ্গভঙ্গ ও তাহার দরুন দেশব্যাপী বিক্ষোভের কথা শুনাইলেন এবং ইহা রহিত করা যে একান্ত আবশ্যক কর্তৃপক্ষের নিকট একথা উত্থাপন করিতেও ত্রুটি করিলেন না। সুরেন্দ্রনাথ আইনানুগ আন্দোলনের পক্ষপাতী হইয়াও মর্লে-মিণ্টো শাসন-সংস্কারের ফলে নবগঠিত বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে সদস্যপদ-প্রার্থী হন নাই। কারণ বঙ্গভঙ্গ রহিত না হইলে তিনি ব্যক্তিগতভাবে সহযোগিতা করিবেন না বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ১৮৯৩ সনে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদে কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষে তিনি সদস্য নির্বাচিত হইয়া কয়েকবার পর পর আইন-সভায় প্রেরিত হইয়াছিলেন।

বঙ্গভঙ্গজনিত বিক্ষোভের কথায় অতঃপর বিলাতের কর্তৃপক্ষ কর্ণপাত না করিয়া পারিলেন না। মর্লের "settled fact" (স্থায়ী ব্যবস্থা) "unsettled" (বানচাল) হইল। পঞ্চম জর্জ বিলাতের রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর ১৯১১ সনে কলিকাতায় আগমন করেন। তাঁহার আগমন উপলক্ষে দিল্লীতে যে দরবার হয় তাহাতে তিনি বঙ্গভঙ্গ রহিত করিয়া পুনরায় ইহাকে একটি প্রদেশে পরিণত করিবার আদেশ দিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ইহাতে শুধু সন্তুষ্ট হইলেন না, আইনানুগ আন্দোলনের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস দৃঢ়তর হইল। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর কেন্দ্রীয় পরিষদে সদস্য-নির্বাচিত হইয়া তথায় গমন করিলেন।

এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটান কলেজে সুরেন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে অধ্যাপনাকার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহার পর বন্ধু আনন্দমোহন প্রতিষ্ঠিত সিটি কলেজেও কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। ১৮৮৪ সনে তিনি স্বয়ং রিপণ কলেজ স্থাপন করিলেন। তিনি পূর্বোক্ত দুই কলেজে এবং এখানে মোট সাঁইত্রিশ বৎসর একাদিক্রমে ছাত্রদের পড়াইয়াছিলেন। অধ্যাপনায় তিনি স্বভাবতঃই আনন্দ পাইতেন। অধ্যাপনা কালে তিনি যেসব বক্তৃতা করিতেন

তাহাতেও ছাত্রগণ বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হইত। ১৯১৩ সনে দিল্লী গমনের প্রাক্কালে তিনি অধ্যাপনাকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি কয়েক বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ে সেনেটের সভ্যও ছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপরিষদের সদস্য থাকা কালে ভারতবর্ষে নানারূপ আন্দোলন আরম্ভ হয়। ১৯১৪ সনে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হইবার পর বঙ্গের এবং অন্যান্য প্রদেশের বিপ্লবীদল আবার কর্মচঞ্চল হইয়া উঠে। শত্রু জার্মানীর পক্ষে যোগ দিয়া ভারতবর্ষ স্বাধীন করার পথ সুগম করা বিপ্লবীদের মনোগত বাসনা ছিল। এই সময় ভারতবর্ষের শাসন-কাঠামোতে যাহাতে সত্যিকার গণতন্ত্রের সূচনা হয় সে উদ্দেশ্যে মাদ্রাজে এ্যানি বেসাণ্ট হোমরুল লীগ স্থাপন করেন। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক ১৯০৮ সনে রাজদ্রোহ প্রচারের অভিযোগে ছয় বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া মান্দালয়ে বাস করিতেছিলেন। তিনি কারামুক্ত হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন এবং সোৎসাহে এই আন্দোলনে যোগদান করিলেন। ইতিমধ্যে নরমপন্থী ও চরমপন্থী দুই দলের মধ্যে ১৯১৬ সনে কংগ্রেসের লক্ষ্মৌ অধিবেশনে মিলন সংঘটিত হয়। কিন্তু এ মিলন বেশী দিন স্থায়ী হইল না। 'হোমরুল' আন্দোলন পরিচালনার জন্য এ্যানি বেসাণ্ট আটক হইলেন, তিলক এবং বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দের গতিবিধিও সরকার নিয়ন্ত্রিত করিলেন। ইহার পর ১৯১৭ সনে চরমপন্থী দল যখন স্বভাবতঃই জিদ ধরিলেন যে, বেসাণ্টকেই সভাপতির আসন দিতে হইবে তখন নরমপন্থী দল ইহাতে বাঁকিয়া বসেন। চরমপন্থী দল অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি পদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম প্রস্তাব করেন। শেষ পর্যন্ত আপোষ-রফা হইলে সভাপতি পদে এ্যানি বেসাণ্ট এবং অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি পদে বহরমপুরের রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেন বৃত হইলেন।

ইতিমধ্যে ১৯১৭ সনে ভারত-সচিব মণ্টেগু শাসনসংস্কারমূলক একটি

ঘোষণায় ভারতবাসীদের কতকটা শাসন-কর্তৃত্ব প্রদানের প্রস্তাব করেন। তিনি ইহার পর ভারতবর্ষে আসেন এবং তৎকালীন বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ডের সঙ্গে এক যোগে নেতৃবৃন্দ এবং ভারতীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মতামত গ্রহণ করেন। এই সময় অর্থাৎ ১৯১৮ সনে ভারতবর্ষে মডারেট বা নরমপন্থী দল কংগ্রেস হইতে আলাদা হইয়া লিবারেল পার্টি গঠন করেন এবং তাঁহাদের সম্মেলনের নামকরণ হয় অল-ইণ্ডিয়া লিবারেল ফেডারেশন বা নিখিল-ভারত উদারনৈতিক সঙ্ঘ।

সুরেন্দ্রনাথ মডারেট দলভুক্ত হইয়া ১৯১৯ সনে বিলাতে গমন করেন এবং সেখানকার কর্তৃপক্ষের নিকট শাসন-সংস্কার সম্পর্কে নিজ মতামত ব্যক্ত করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া শাসন-সংস্কার গ্রহণে তিনি স্বদেশবাসীদের পরামর্শ দিলেন। এই বৎসর বিপ্লব আন্দোলন দমনের অছিলায় নবজাতীয়তাকে পিষ্ট করিবার জন্য সরকার কর্তৃক রৌলট আইন বিধিবদ্ধ হয়। মহাত্মা গান্ধী ইহার প্রতিবাদে সত্যাগ্রহের প্রস্তাব করেন। প্রথম মহাসমরান্তে ভের্সাইয়ে যে সন্ধি হইল তাহাতে তুরস্ককে ইউরোপের মানচিত্র হইতে নিশ্চিহ্ন করিবার আয়োজন হয়। এই দুই কারণে ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান উভয়েই ব্রিটিশের উপর পুনরায় বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠে এবং মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনে সাগ্রহে যোগদান করে। প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কার গ্রহণ না করিয়া বরং বর্জন করাই তাহারা শ্রেয় বিবেচনা করিল। এক সময়ে যে সুরেন্দ্রনাথের কথা স্বদেশবাসীরা বেদবাক্য বলিয়া মনে করিত এই সময় সরকারের সঙ্গে তাঁহার সহযোগিতার প্রস্তাবে কেহ কর্ণপাতও করিল না।

৬

সুরেন্দ্রনাথ কিন্তু নিজ বিশ্বাসে দৃঢ় রহিলেন। ১৯২১ সনে নূতন শাসন-সংস্কার ('Diarchy' যাহার ইংরেজী নাম) অনুসারে বঙ্গে যে

নির্বাচন হয় তাহাতে সুরেন্দ্রনাথ এখানকার আইন-সভার সদস্য নির্বাচিত হইলেন। কংগ্রেস অসহযোগ প্রস্তাব গ্রহণ করায়, নির্বাচন-ক্ষেত্র হইতে কংগ্রেসীরা অবসর লইয়াছিলেন। নির্বাচনের পর বঙ্গের গবর্ণর লর্ড রোনাল্ডসের আহ্বানে সুরেন্দ্রনাথ মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিলেন। স্বায়ত্ত-শাসন ও স্বাস্থ্য-বিভাগের ভার তাঁহার উপর অর্পিত হইল। ইতিপূর্বে তিনি নাইট উপাধিতেও ভূষিত হইয়াছিলেন। প্রথম জীবনে সুরেন্দ্রনাথ সর্ববিষয়ে দেশবাসীর সহযোগিতা ও সমর্থন লাভ করিয়াছিলেন, তিন বৎসর মন্ত্রিত্বকালে (১৯২১-২৩) তিনি ততোধিক বাধাপ্রাপ্ত হন। তথাপি, স্বদেশসেবা ছিল সুরেন্দ্রনাথের জীবনের মূল কথা। নিজ জ্ঞানবিশ্বাস মতে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া, এতদিন শাসন-বিভাগের যেরূপ সংস্কার সাধনের জন্য আন্দোলন পরিচালনা করিয়াছেন তাহাই সাধ্যমত কার্যে পরিণত করিতে যত্নবান হইলেন। কলিকাতা কর্পোরেশনে ১৮৭৬ সনে নির্বাচনপ্রথা প্রবর্তিত হওয়া অবধি দীর্ঘকাল তিনি ইহার সদস্য রূপে পৌরসেবা করিয়াছিলেন। সরকার ১৮৯৯ সনে ইহার কর্তৃত্ব হ্রাস করিয়া দেওয়ায় প্রতিবাদ-স্বরূপ আটাশ জন সদস্যের সঙ্গে তিনিও পদত্যাগ করেন। এইবার ক্ষমতা হাতে পাইয়া সুরেন্দ্রনাথ কর্পোরেশনকে পুরাপুরি লোকায়ত্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার জন্য একটি আইন প্রণয়ন করিয়া নব-গঠিত ব্যবস্থা-পরিষদ দ্বারা পাস করাইয়া লইলেন। বর্তমান কলিকাতা কর্পোরেশন মূলতঃ তাঁহারই সৃষ্টি। চিকিৎসা-বিভাগেও তিনি কতকগুলি পরিবর্তন সাধন করিলেন। ভারতীয়দের উচ্চপদে নিয়োগের সকল বাধা তিনি তুলিয়া দিলেন।

তিন বৎসর পরে পুনরায় নির্বাচন আরম্ভ হইল। অসহযোগ আন্দোলনের মরশুমে তাঁহার কার্যের প্রশংসা অপেক্ষা মন্ত্রীপদ গ্রহণ করার জন্য নিন্দাই হইল বেশী। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে স্বরাজ্য দল দ্বিতীয় বারের সাধারণ নির্বাচনে যোগদান করিলেন। তাঁহারা

সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে সমর্থন করিতে লাগিলেন। নির্বাচনে বিধানচন্দ্রই জয়যুক্ত হন। সুরেন্দ্রনাথ ইহার পর রাজনীতি হইতে অবসর লইলেন। তিনি আর অধিকদিন জীবিত ছিলেন না। ১৯২৫ সনের ৭ই আগষ্ট সুরেন্দ্রনাথ ইহধাম ত্যাগ করেন। কর্মজীবনের আরম্ভে তাঁহাকে যেরূপ সংগ্রাম করিতে হয়, সায়াহ্নেও তিনি তদনুরূপ সংগ্রামের সম্মুখীন হন। তিনি নিজেকে নূতনের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া লইয়া জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে মোটেই আগ্রাহান্বিত ছিলেন না। নিজ মতে কতখানি নিষ্ঠা এবং দৃঢ়তা থাকিলে ইহা সম্ভব তাহা সহজেই অনুমেয়। বিপিনচন্দ্র পাল ১৯১০ সনে সুরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি। বিপিনচন্দ্র লেখেন,—

"যাঁহারা ক্রমে ক্রমে নূতন পথ ধরিয়া, নূতন মন্ত্র সাধন করিয়া, দেশের জন-মণ্ডলীর চিত্তে এক নবশক্তির সঞ্চার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সাক্ষাৎভাবে বা পরোক্ষভাবে স্বাদেশিক উদ্দীপনার জন্য সুরেন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের শিক্ষা-দীক্ষার নিকট চিরঋণী রহিয়াছেন। আজ দেশে যে নূতন আদর্শ ফুটিয়া উঠিতেছে ও জনগণের চিত্তে যে নূতন শক্তির সঞ্চার হইতেছে তাহা কোনো কোনো দিকে সুরেন্দ্রনাথের আদর্শের এবং কর্ম্মপ্রচেষ্টার বিরোধী হইলেও যে সুরেন্দ্রনাথের শিক্ষা-দীক্ষার শ্রেষ্ঠতম ফল, ইহা অস্বীকার করা যায় না। সুরেন্দ্রনাথের অশেষ প্রকার ত্রুটি দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও তিনি যে কাজটি করিয়াছেন তাহা না করিলে আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় জীবন যে ভাবে গড়িয়া উঠিতেছে, কখনই সে ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারিত না। তিনি এই জাতীয় জীবনের গঠনে যে কাজটি করিয়াছেন, সে কাজ অপর কেহ করেন নাই, এবং করিতে পারিতেনও না। আর এইজন্যই আধুনিক ভারতের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি এমন অক্ষয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।"*

*চরিত-কথা পৃঃ ৫৬-৭।

অম্বিকাচরণ মজুমদার

ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাবের পূর্বে যেসকল দেশভক্ত জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অম্বিকাচরণ মজুমদার অন্যতম। পেট্রিয়ট বা স্বদেশপ্রেমিক বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহার মূর্ত প্রতীক ছিলেন অম্বিকাচরণ। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জনকল্যাণ, আর্তসেবা, রাজনীতি—সকল দিকেই অম্বিকাচরণ স্বীয় বৈশিষ্ট্যের ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন।

অম্বিকাচরণের জন্ম ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমার অন্তর্গত সেনদিয়া গ্রামে, ৬ই জানুয়ারী ১৮৫১ সনে। পিতার নাম রাধামাধব মজুমদার, মাতা সুভদ্রা দেবী। ঐ অঞ্চলে মজুমদার পরিবার পাণ্ডিত্য ও দেশসেবার জন্য প্রখ্যাত। অম্বিকাচরণ শৈশবে পাঠশালায় এবং পরে পার্শ্ববর্তী খালিয়া গ্রামে ইংরেজী-বাংলা বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করেন। নবম বৎসরে (১৮৫৯) তিনি বরিশাল জেলা স্কুলে ভর্তি হইলেন। বরিশালে অম্বিকাচরণের কৈশোর কাটে। এই সময় সংশিক্ষাগুণে একদিকে যেমন তাঁহার অধ্যয়ন-স্পৃহা বর্ধিত হয়, অন্যদিকে তেমনি মানবপ্রেম এবং সেবাপরায়ণতার আদর্শেও তিনি উদ্বুদ্ধ হন। ১৮৬৯ সনে তিনি প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করিলেন।

তাহার পর অম্বিকাচরণ কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু দীর্ঘকাল চক্ষুঃপীড়া-হেতু তেমন পড়াশুনা করিতে পারেন নাই ; ফলে এফ-এ পরীক্ষায় তিনি তৃতীয় বিভাগে পাস করেন। তিনি বি-এ অধ্যয়ন করেন জেনারেল অ্যাসেম্বলি ইনস্টিটিউশনে (বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ)। ১৮৭৪ সনে বি-এ পরীক্ষা দিলেন। এবারকার পরীক্ষার ফল ভাল হইল, তিনি প্রথম বিভাগে অষ্টম স্থান অধিকার করিলেন। ইহার পরই তাঁহার কর্ম-জীবন আরম্ভ হইল।

তখনকার দিনে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন বাঙ্গালীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একমাত্র কলেজ। ভারতীয় শিক্ষক দ্বারা যে উৎকৃষ্ট শিক্ষাদান সম্ভব—বিদ্যাসাগর মহাশয় এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান দ্বারা তাহাই সপ্রমাণ করিতেছিলেন। বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরই অম্বিকাচরণ উক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কার্যে ব্রতী হইলেন। তিনি স্কুল বিভাগের প্রধান শিক্ষক এবং কলেজ শ্রেণীর অধ্যাপক। তাঁহার অধ্যক্ষতায় স্কুলটির বিশেষ উন্নতি হয়। কলেজ বিভাগে তিনি এই সময় বিশিষ্ট সহকর্মিরূপে পাইয়াছিলেন দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। উভয়ের মধ্যে এই সময়ে যে হৃদ্যতা জন্মে স্বদেশ-সেবার বৃহত্তর ক্ষেত্রেও তাহা বরাবর অক্ষুণ্ণ ছিল। ভারত-সভা, কংগ্রেস, রাষ্ট্রীয় সম্মেলন এবং বিভিন্ন জাতীয় আন্দোলনে তাঁহারা উভয়ে হাতে হাত মিলাইয়া চলিতেন। এরূপ বন্ধুত্ব কদাচিৎ দেখা যায়।

অম্বিকাচরণ ক্রমে এম-এ ও বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। শেষ পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আশীর্বাদ লইয়া তিনি ফরিদপুর শহরে ওকালতি করিতে যান ১৮৭৯ সনে। ১৯২২ সনে মৃত্যুকাল পর্যন্ত প্রায় অর্ধ-শতাব্দী তিনি ফরিদপুরকেই স্বীয় কর্মক্ষেত্র করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি ছিলেন যেন কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের চাতক পক্ষী। আদর্শ বিরাট—ভারতের মুক্তি সাধন, কিন্তু কর্মক্ষেত্র ছিল ফরিদপুর জেলা। আদর্শ ও কর্ম তাঁহার ভিতর মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বাহিরের সঙ্গে পুরাপুরি যোগ রাখিয়াও তিনি ফরিদপুরের উন্নতির জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন।

অম্বিকারচণ ওকালতি ব্যবসায়ে উত্তরোত্তর উন্নতি করিতেছিলেন। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি জনকল্যাণেও অভিনিবিষ্ট হইলেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ফরিদপুর পিপলস এ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন। সে যুগে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন পরিচালনার জন্য বিভিন্ন জেলায়, মহকুমায় ও

গঞ্জে সভাসমিতি স্থাপিত হয়। আর এই সবের অধিকাংশই কলিকাতার কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় সমিতি ভারত-সভার সঙ্গে যুক্ত হয়। অম্বিকাচরণ ফরিদপুরের সভাকেও ভারত-সভার সঙ্গে যুক্ত করিয়া লইলেন। ফরিদপুর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড এবং মিউনিসিপ্যালিটি লর্ড রিপনের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইনবলে পুনর্গঠিত হইলে অম্বিকাচরণ এ সকলের সহিতও যোগদান করিলেন। এই দুইটি প্রতিষ্ঠান মারফত শহর এবং পল্লী অঞ্চলে রাস্তাঘাট নির্মাণ, পুষ্করিণী খনন, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, প্রভৃতি বিবিধ জনহিতকর কার্যেরও সুযোগ পাইলেন। তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ ঐ দুইটি প্রতিষ্ঠানের সদস্য ও সভাপতি ছিলেন। আদর্শ চরিত্র, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং প্রচুর কর্মশক্তির গুণে তিনি দেশের সরকারী-বেসরকারী পদস্থ ব্যক্তিদের এবং জনসাধারণের শ্রদ্ধা-প্রীতি আকর্ষণে সমর্থ হন।

শিক্ষা প্রচারে অম্বিকাচরণের বিশেষ আগ্রহ ছিল। শিক্ষকতায়ই তাঁহার কর্মজীবনের আরম্ভ। ফরিদপুরের বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁহার গভীর যোগ ছিল। কিন্তু তাঁহার জীবনের অন্যতম প্রধান কার্য ফরিদপুরে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ স্থাপন। নানারূপ উদ্যোগ আয়োজনের পর ১৯১৮ সনে ফরিদপুরে 'রাজেন্দ্র কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হইল। আর ইহার মূলে ছিলেন অম্বিকাচরণ। তিনি কলেজের অধ্যক্ষ-সভার সভাপতি ছিলেন। কলেজটিকে একটি আদর্শ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়া তোলা তাঁহার আমরণ কামনা ছিল। কিন্তু কলেজ প্রতিষ্ঠার অল্প দিন পরে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং নানা কারণে তাঁহার আশা সম্পূর্ণ ফলবতী হইতে পারে নাই। ইহার পরে ফরিদপুর জেলায় আরও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু অম্বিকাচরণই যে এ-বিষয়ে পথিকৃৎ, তাহা বলাই বাহুল্য।

নিছক রাজনীতি তথা জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে অম্বিকাচরণের কৃতিত্ব এখন আলোচ্য। তিনি দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথকে সহকর্মিরূপে

পাইয়াছিলেন। স্বদেশপ্রেমের আদর্শে অম্বিকাচরণ সুরেন্দ্রনাথের মতই অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। গত শতাব্দীর সপ্তম দশকে স্বদেশপ্রেমের এই যে অভ্যুত্থান তাহা অল্পকাল মধ্যেই দেশময় ছড়াইয়া পড়ে। শহরে ও গঞ্জে বিভিন্ন সভা-সমিতি হইতে এই আদর্শ ক্রমশঃ জনসমাজে দৃঢ়বদ্ধ হইতে থাকে। অম্বিকাচরণ ফরিদপুরে এই আদর্শ বজায় রাখিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। এইরূপ ব্যাপক অথচ গভীর প্রচেষ্টার ফলেই ১৮৮৩ ও ১৮৮৫ সনে কলিকাতায় ন্যাশনাল কনফারেন্স বা জাতীয় সম্মেলন সম্ভব হইয়াছিল। অম্বিকাচরণ ফরিদপুর হইতে প্রতিনিধিরূপে এই দুইটি সম্মেলনেই যোগদান করেন। দ্বিতীয় সম্মেলনের কার্য বিবরণীতে 'ডেলিগেট ফ্রম ফরিদপুর' বা ফরিদপুরের প্রতিনিধির একাধিক বক্তৃতা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই প্রতিনিধি যে অম্বিকাচরণ সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। অম্বিকাচরণ নিজেই ইহার একটি সম্মেলন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ

"It was a unique spectacle and the writer of these pages still retains a vivid impression of the immense enthusiasm which throughout characterised the three days' session of the conference and at the end of which everyone present seemed to have received a new light and a novel inspiration." (*Indian National Evolution*. Page 45.)

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার (১৮৮৫) এক বৎসর পর হইতেই বঙ্গের তৎকালীন নেতৃবৃন্দ ইহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হন। সুরেন্দ্রনাথ-আনন্দমোহনের সঙ্গে অম্বিকাচরণও এই কংগ্রেসের মধ্যেই জাতীয় আন্দোলন সাফল্য-মণ্ডিত করিবার প্রকৃষ্টতর উপায় খুঁজিয়া পাইলেন। অম্বিকাচরণ সে-যুগের কংগ্রেসে অল্পকালের ভিতরেই একটি উচ্চ স্থান লাভ করিলেন।

ভারতে প্রতিনিধিমূলক শাসন প্রতিষ্ঠা, অস্ত্র আইন প্রত্যাহার, শাসন ও বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রস্তাবের উত্থাপক বা সমর্থক হিসাবে অম্বিকাচরণ কংগ্রেসের নানা অধিবেশনে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সুবক্তা বলিয়া তখন হইতেই তিনি খ্যাতিলাভ করেন।

বাংলার ঘরোয়া সমস্যাগুলির আলোচনার নিমিত্ত ১৮৮৮ সনে কলিকাতায় প্রথম বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনেরও অম্বিকাচরণ একজন উৎসাহী নেতা ছিলেন। তিনি ১৮৯৯ সনে বর্ধমান অধিবেশনে এবং ১৯১০ সনে কলিকাতা অধিবেশনে ইহার সভাপতিত্ব করেন। ১৯১১ সনে ফরিদপুরে প্রাদেশিক সম্মেলন হইয়াছিল। অম্বিকাচরণ ইহাকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিবার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ইহার পরেও ফরিদপুরে ১৯২৫ সনে দ্বিতীয়বার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু অম্বিকাচরণ তখন পরলোকে।

স্বদেশী আন্দোলনে অম্বিকাচরণ কায়মনে যোগদান করিয়াছিলেন। লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের সংবাদেই বাংলা দেশের সর্বত্র বিশেষ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। ১৯০৫ সনের জানুয়ারী মাসেই কলিকাতায় কংগ্রেস-প্রেসিডেণ্ট কটনের নেতৃত্বে একটি সম্মেলন আহূত হয়। অম্বিকাচরণ এই সম্মেলনে উহার বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাবের স্বপক্ষে বক্তৃতা করেন। ১৯০৫, ১৯শে জুলাই বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত যখন কার্জন-সরকার গ্রহণ করিলেন, তখন বাংলার সর্বত্র বয়কট আন্দোলন শুরু হয়। এই উদ্দেশ্যে প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে একটি বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয় ঐ সনের ৭ই আগস্ট কলিকাতা টাউন হলে। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। এই উপলক্ষে এত জনসমাগম হইয়াছিল যে, মূল সভা ব্যতিরেকে টাউন হলের সন্নিকটে আরও দুইটি বাড়তি সভা করিতে

হইয়াছিল। ইহার একটিতে সভাপতি হইয়াছিলেন অম্বিকাচরণ মজুমদার। তাঁহার চেষ্টা-উদ্যোগে ফরিদপুর স্বদেশী আন্দোলনের একটি প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে। বরিশালে যেমন অশ্বিনীকুমার, ফরিদপুরে তেমনি অম্বিকাচরণ একরূপ আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশী আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে সবিশেষ প্রয়াসী হন। দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ *A Nation in Making* পুস্তকে অম্বিকাচরণের কৃতিত্বের কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

স্বদেশীর সময়ে রাজনৈতিক কর্মপন্থা লইয়া ভারতের রাষ্ট্রীয় কর্মীদের মধ্যে দুই দল দেখা দেয়—(১) এক্সট্রিমিস্ট বা জাতীয়তাবাদী এবং (২) মডারেট বা উদারপন্থী। এই দুই দলের ভীষণ মতবিরোধ হেতু ১৯০৭ সনের সুরাট কংগ্রেস পণ্ড হইয়া যায়। ইহার পর কংগ্রেস মডারেটদের হাতে আসে। ১৯১৬ সনে লখ্‌নউ কংগ্রেসে এই দুই দল পুনরায় মিলিত হইলেন। অম্বিকাচরণ এই দুই দলেরই বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। এবারকার সম্মিলিত কংগ্রেসের তিনিই সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। তাঁহার সভাপতির বক্তৃতা যেমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ, তেমনি সুদৃঢ় জাতীয় ভাব-মূলক। এই লখ্‌নউ কংগ্রেসে হিন্দু-মুসলমানে প্রথম চুক্তি হয়, এই চুক্তি পরে 'লখ্‌নউ প্যাক্ট' নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহার পর আবার ১৯১৮ সনে উভয় দলের মধ্যে মণ্টফোর্ড শাসন সংস্কার লইয়া মতভেদ উপস্থিত হয়। কিন্তু অম্বিকাচরণ নিজে প্রাচীন-পন্থী বা উদারনৈতিক হইয়াও জাতীয় মুক্তিকল্পে বরাবর সম্মিলিত আন্দোলনের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। এই সময়ে তিনি দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ এবং পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়কে যেসব পত্র লেখেন, তাহা পাঠে তাঁহার এইরূপ মনোভাব সম্যক্ উপলব্ধি হয়। অম্বিকাচরণের শরীরও ইহার পর ভাঙ্গিয়া পড়ে। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন তিনি সমর্থন করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার স্বদেশগত প্রাণ ত্যাগী দেশকর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধায়

ভরিয়া উঠিত। নিরাশ্রয় দেশকর্মীরা তখনও তাঁহার গৃহে আশ্রয় পাইয়াছে।

অম্বিকাচরণ কলিকাতাস্থ ভারত-সভার সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯১৩-১৬ এই চারি বৎসর তিনি ইহার সভাপতি ছিলেন। সভার বার্ষিক অধিবেশনগুলিতে তিনি যে সকল ভাষণ দিতেন, তাহা স্বদেশপ্রেমে ভরপুর থাকিত। তিনি বিপ্লব আন্দোলন সমর্থন করিতেন না, বিপ্লবীদের সম্পর্কে তিনি কঠোর মন্তব্যও করিয়াছেন। কিন্তু বিপ্লব-প্রচেষ্টার জন্য মূলত দায়ী যে ব্রিটিশ শাসন-নীতি—ইহা তিনি বরাবর অকপটভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। বিপ্লবীদের উপরে যে সকল অনাচার অনুষ্ঠিত হইত, তাহার বিরুদ্ধেও তিনি তাঁহার মতামত সহজভাবে ব্যক্ত করিতেন। এই সকল অনাচারের প্রতিকারকল্পে চেষ্টা করিতে তিনি কখনও বিরত হন নাই। তিনি *Indian National Evolution* নামে সমসাময়িক জাতীয় আন্দোলনের একখানি ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। বঙ্গীয় আইন-সভার সদস্য হিসাবে জনহিতকর কার্যের প্রতি সরকারী অমনোযোগের নিন্দাবাদ করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। অম্বিকাচরণ স্বয়ং ১৮৮৬ এবং ১৯০৬ সনের দুর্ভিক্ষে ফরিদপুর জেলায় আর্তসেবায় ও সঙ্কটত্রাণে নিযুক্ত ছিলেন।

অম্বিকাচরণ ১৯২২, ২৯শে ডিসেম্বর ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার সম্বন্ধে সম্প্রতি শ্রুত দুইটি কাহিনী সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করিব। ১৯১০ সনে এলাহাবাদ কংগ্রেসে গিয়া অম্বিকাচরণ অসুস্থ হইয়া শয্যাশায়ী ; সুরেন্দ্রনাথ পার্শ্বে একটি চেয়ারে উপবিষ্ট। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক পুত্রসহ (পুত্রটি অল্পবয়স্ক হইলেও তখনই পদস্থ ব্যক্তি) আসিয়াছিলেন। তিনি বলেন, দু-তিন জন গোরা সৈনিক বাঙালী মেয়েদের প্রতি অসৌজন্য প্রকাশ করায় তাঁহার পুত্র তাহাদের উত্তম-মধ্যম দিয়াছেন। পুলিশও ডায়েরী লইয়াছে, এখন কি করা যায়, ইত্যাদি। অমনি অম্বিকা-

চরণ শয্যা হইতে উঠিয়া অসুস্থ শরীরে বৃদ্ধের পুত্রকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলেন—'বেশ বাবা, বেশ করেছ, ভাল করেছ।'

অম্বিকাচরণ তখন মৃত্যুপথযাত্রী। হরিধ্বনি উঠিল। অম্বিকাচরণ তখনও সংজ্ঞা হারান নাই। তিনি কাছের লোকজন ডাকিয়া বলিলেন, 'তোমরা হরিধ্বনি করিও না, পরাধীন ভারতে ঈশ্বর কোথায়?'

অম্বিকাচরণ ছিলেন স্বদেশের অন্যতম সত্যকার মুক্তিসাধক। ভারতের মুক্তিসাধনায় তাঁহার স্মৃতি সর্বদা স্মরণীয়।

অশ্বিনীকুমার দত্ত

১

বিগত ১৯২৩ সনের ৭ই নবেম্বর কৃষ্ণাচতুর্দশী তিথিতে অশ্বিনীকুমার দত্ত কলিকাতায় পরলোকগমন করেন। তদবধি এই দিনটিতে প্রতি বৎসর তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের জন্য সভাসমিতি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বহু বৎসর যাবৎ অশ্বিনীকুমারের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বরিশাল হইতে প্রকাশিত 'বরিশাল' সাপ্তাহিকের বিশেষ সংখ্যা বাহির হইত। এই সংখ্যাসমূহে অশ্বিনীকুমারের গুণমুগ্ধ ও প্রীতিবদ্ধ বহু বন্ধু, সহকর্মী ও ছাত্রদের তথ্যমূলক রচনা স্থান পাইত। তাঁহার জীবনী গ্রন্থও ছোট বড় কয়েকখানি বাহির হইয়াছে। ইহাদেরও কোন কোনখানি খুবই তথ্যপূর্ণ। এ সকল রচনা ও পুস্তক পাঠে উপলব্ধি হয়, অশ্বিনীকুমারের প্রতিভা কিরূপ বহুমুখী ছিল। তাঁহার সম্বন্ধে জানিবার আগ্রহ এতদ্দ্বারা নিবৃত্ত না হইয়া আরও পরিবর্ধিত হয়। যিনি এত বড়, তাঁহার বিষয় আরও কত যেন অ-জানা ও অ-বলা রহিয়া গিয়াছে মনে হয়। অশ্বিনীকুমারের সমসাময়িক কেহ হয়ত এখন আর জীবিত নাই। তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যদের মধ্যে যাঁহারা তাঁহার সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন, এরূপ অনেকে এখনও বাঁচিয়া আছেন। তাঁহারা বর্তমান যুগের বঙ্গসন্তানদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য অগ্রসর হইলে ভাল হয়।

অশ্বিনীকুমারের পিতা ব্রজমোহন দত্ত (১৮২৬-৮৬) বরিশালের অন্তর্গত বাটাজোড় গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার জীবনও খুব বৈচিত্র্যপূর্ণ। সে যুগে যখন রেল ষ্টিমার হয় নাই, ব্রজমোহন তখন সুদূর কলিকাতায় গমন করিয়া ভবানীপুরস্থ লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির স্কুলে

ইংরেজী শিক্ষা করেন। বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের নির্দেশে ১৮৪৫ সনে যখন বঙ্গ প্রদেশে ১০১টি বঙ্গবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় তখন বরিশাল জেলার ভাগে তিনটি পড়িয়াছিল। ইহার একটি স্থাপিত হয় বানারীপাড়া গ্রামে। ব্রজমোহন এই বিদ্যালয়ে ১৫৲ টাকা বেতনে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। ইহাতে সন্তুষ্ট না থাকিয়া তিনি পুনরায় ১৮৪৮ সনে কলিকাতায় যান। এবারে তিনি আইন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ১৮৪৯ সনের ২৫শে ডিসেম্বর বরিশাল সহরে মুন্সেফের কাজে নিযুক্ত হইলেন। ইহার পর ক্রমোন্নতি হইয়া মাসিক হাজার টাকা বেতনে তিনি ছোট আদালতের জজ পর্যন্ত হইয়াছিলেন। ১৮৮৩ সনে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি বরিশালেই স্থায়িভাবে বসবাস করিতে থাকেন। এই বৎসরই 'মানব' নামে তাঁহার একখানি উপদেশমূলক পুস্তক প্রকাশিত হয়। ধর্মে তিনি বেদান্তের অনুগামী ছিলেন। রাজকর্মচারী হইয়াও ব্রজমোহন স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন এবং নানা সুযোগ-সুবিধা সত্ত্বেও পুত্রদের সরকারী চাকুরী গ্রহণে অনুরোধ করেন নাই। তিনি অবসর জীবনের অধিকাংশ সময়ই তীর্থ-পর্যটনে কাটান। অশ্বিনীকুমারের মাতা প্রসন্নময়ী মনোমোহন ঘোষ ও লালমোহন ঘোষের ভাগিনেয়ী। তিনিও ছিলেন তেজস্বিনী মহিলা। বড়লাট মিণ্টো দ্বারা ১৯০৬ সনে কলিকাতার কংগ্রেস প্রদর্শনী উদ্‌বোধনের কথা হইলে তিনি অশ্বিনীকুমারকে বলিয়াছিলেন, দেশে কি লোক নাই যে, সাদাচামড়া দিয়া প্রদর্শনী খোলাইতে হইবে? তখন তিনি সপ্ততি বৎসরের বৃদ্ধা।

২

এ হেন পিতামাতার সন্তান অশ্বিনীকুমার। পিতার স্বাধীন চিন্তা ও মাতার তেজস্বিতা তাঁহাতে যেন পূর্ণ মাত্রায়ই বর্তাইয়াছিল।

ব্রজমোহনের পুত্রকন্যা পাঁচজন। তিন পুত্রের মধ্যে অশ্বিনীকুমার জ্যেষ্ঠ। ব্রজমোহন ১৮৫৬ সনে বরিশালে পটুয়াখালি মহকুমার মুন্সেফ ও ডেপুটি কলেক্টর ছিলেন। এখানে ২৫শে জানুয়ারী তারিখ অশ্বিনীকুমারের জন্ম হয়। বাল্যে কিছুকাল স্বগ্রামস্থ পাঠশালায় পড়িলেও, পিতা যখনই যেখানে বদলী হইয়া যাইতেন, প্রায়ই সেখানে তাঁহাকেও যাইতে হইত। এইরূপে চতুর্দশ বর্ষ বয়সে ১৮৭০ সনে অশ্বিনীকুমার রংপুর হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

পিতার সঙ্গে বঙ্গদেশের বিভিন্ন সহরে বসবাস হেতু তথাকার লোকজন, আচার-আচরণ, কথাবার্তা প্রভৃতি সম্বন্ধে অল্প বয়সেই তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়। বিভিন্ন অঞ্চলের কথ্যভাষা (dialects) তিনি এইরূপে আয়ত্ত করেন এবং ইহাতে অনর্গল কথা বলিয়া যাইতে পারিতেন। পরবর্তীকালে তিনি যে বহু ভাষাবিদ্ হইয়াছিলেন তাহার শিক্ষানবিশী এই প্রকারেই হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর পিতার নির্দেশে অশ্বিনীকুমার কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হইলেন। এইখানেই তাঁহার বৈচিত্র্যময় জীবনের সূচনা। এ সময় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা, প্রাণমাতানো প্রার্থনা এবং সামাজিক উন্নতি-মূলক কার্যাবলী দ্বারা যুবক সমাজের চিত্ত যেন হরণ করিয়া লইয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমারও প্রভাবিত হইলেন। স্বাভাবিক ঈশ্বর-প্রীতির সঙ্গে নীতি-নিষ্ঠা সংযোজিত হইয়া তাঁহাকে একটি আদর্শ সত্যপরায়ণ জীবন-যাপনে উদ্বুদ্ধ করিল। অশ্বিনীকুমার এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। বি. এ. পড়ার সময় মনে হইল, প্রবেশিকা পরীক্ষায় তাঁহার বয়স চৌদ্দ হইতে বাড়াইয়া ষোল করায় অসত্যের প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে, ইহার প্রতিকার চাই। কিন্তু কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মানুগভাবে প্রতিকারের উপায় না দেখিয়া একেবারে পড়াই ছাড়িয়া দিলেন! পিতা

ব্রজমোহন তখন যশোহরে। তিনি পুত্রকে ভর্ৎসনা করিলেন না, নিকটে রাখিয়া তাঁহার সঙ্গে প্রিয় বেদান্ত চর্চা সুরু করিয়া দিলেন।

ইহার পর অশ্বিনীকুমার এলাহাবাদে যান। প্লীডারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুকাল সেখানে আইন ব্যবসায় করিয়াছিলেন। কিন্তু মাতার অনুরোধে তিনি পুনরায় বঙ্গদেশে চলিয়া আসেন। ব্রজমোহন তখন কৃষ্ণনগরে স্থিত এবং সেখানকার সদর-আলা। কৃষ্ণনগর তখন নব্যবঙ্গের তীর্থক্ষেত্র, যেমন কলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যাপকবর্গ, তেমনি বাহিরে ঋষিকল্প রামতনু লাহিড়ী ও দেশপ্রসিদ্ধ মনোমোহন ও লালমোহন ঘোষের পুণ্য রজঃপুত। অশ্বিনীকুমারের ইংরেজী ভাষায় প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি অচিরেই অধ্যক্ষ রো সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। আদর্শচরিত্র রামতনু লাহিড়ীরও তিনি বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। তাঁহার কর্তব্যনিষ্ঠা অশ্বিনীকুমারে অনুক্রামিত হইল। কৃষ্ণনগর হইতে তিনি বি-এ, এম-এ ও বি-এল পরীক্ষা পাশ করেন। কৃষ্ণনগরে অধ্যয়নকালে বিংশতি বর্ষ বয়সে অশ্বিনীকুমার নয় বৎসর বয়স্কা বালিকা সরলাবালার সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। বিবাহিত হইয়াও আজীবন ব্রহ্মচারী থাকিয়া অশ্বিনীকুমার যে বিপুল কীর্তির অধিকারী হইয়াছিলেন তাহার মূলে রহিয়াছে সরলা-বালার অনন্যসাধারণ আত্মত্যাগ।

কৃষ্ণনগরে অধ্যয়নকালে অশ্বিনীকুমার অল্পকাল কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। শিক্ষকতা কার্যে এই তাঁহার হাতেখড়ি। এইখানেই তিনি জীবন-কর্মসঙ্গী ভক্ত জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং ব্রজমোহন কলেজের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে প্রাপ্ত হন। সদর-আলার পুত্র হইয়াও দরিদ্র শিক্ষাব্রতীর জীবনই অশ্বিনীকুমারের নিকট অধিকতর প্রিয় ছিল। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাত্র ত্রয়োবিংশ বর্ষ বয়সে শ্রীরামপুরের নিকটবর্তী চাতরা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হইয়া আসিলেন। শুধু বিদ্যালয়ে

নহে, অন্যান্য ক্ষেত্রেও—খেলাধূলায়, আমোদ-প্রমোদে সকল বিষয়ে অশ্বিনীকুমার ছাত্রদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কার্য করিয়া ছাত্র ও অভিভাবকদের মধ্যে এক নূতন পরিবেশের সৃষ্টি করিলেন। স্থানীয় অধিবাসীদের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য তাহাদেরই সহায়তায় শ্রীরামপুর এসোসিয়েশন স্থাপিত হইল। বিদ্যালয় পরিত্যাগকালে ১৮৮০, ৭ই জানুয়ারী ছাত্রদের প্রদত্ত অভিনন্দন-পত্রে এই সকল বিষয় সবিশেষ উল্লিখিত হইয়াছিল। ভাবী কর্মবহুল অশ্বিনী-জীবনের বীজ এইখানেই উপ্ত হয়।

ছোটলাট সার এসলি ইডেন অশ্বিনীকুমারের বিদ্যাবত্তার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তিনি স্বয়ং তাঁহাকে সরকারী কর্মে নিয়োগের প্রস্তাব করিলে সদর-আলা ব্রজমোহন তাহাতে অসম্মত হন। তাঁহারই ইচ্ছা অনুসারে অশ্বিনীকুমার ১৮৮০ সনে স্বাধীন ওকালতী ব্যবসা আরম্ভ করিবার জন্য বরিশালে আগমন করেন। এইবার স্বদেশসেবায় আত্মনিয়োগের সুযোগ ঘটিল। অশ্বিনীকুমার একাদিক্রমে নয় বৎসর কাল আইন ব্যবসা করিয়া পরে ইহাও ছাড়িয়া দিলেন। কারণ ইহাতে দেহের স্বাধীনতা থাকিলেও মনের স্বাধীনতা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। যাহা হউক, ইহা কিঞ্চিৎ পরবর্তীকালের কথা।

এই সময়ের মধ্যে তাঁহার প্রতিভা নানা কার্যের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিল। অশ্বিনীকুমার, রামতনু লাহিড়ী ও বিশেষ করিয়া কেশবচন্দ্র সেন দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত। মনীষী ঋষি-প্রতিম রাজনারায়ণ বসুর সহিতও তাঁহার বেশ মেলা-মেশা ছিল। রাজনারায়ণ ছিলেন হাস্যরসের প্রস্রবণ। তিনি অশ্বিনীকুমারকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, 'যদি নেতা হইতে চাও কলিকাতায় যাইও আর যদি কাজ করিতে চাও বরিশালে থাকিও।' রাজনারায়ণের বাণীকে অশ্বিনীকুমার বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। কর্তব্য, নীতি ও রসমন্ত্রে তিনি উজ্জীবিত; কিন্তু কলিকাতায় অবস্থানকালে তিনি এ তিনের সমন্বয় সাধন করিলেন

আর একজনের সংস্পর্শে আসিয়া। তিনি হইলেন দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংস। অশ্বিনীকুমার চার পাঁচবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি ইতিমধ্যে বহু সাধুসন্তর দর্শনলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঠাকুর রামকৃষ্ণই যেন সকলের অপেক্ষা পূর্ণতর ঐশ্বরিক শক্তি-সম্পন্ন। আনন্দ ও রস রামকৃষ্ণের দেহ, মন, কথাবার্তা, হাবভাব সকলই জুড়িয়া ছিল। তাঁহার নিকট এই যে স্ফূর্তির পরিচয় পাইলেন, তাহা অশ্বিনীকুমারের মধ্যেও অনুপ্রবিষ্ট হইল। মৃত্যুতেই এই স্ফূর্তির অবসান ঘটে। উচ্চশিক্ষিত, আইনজ্ঞ, সাধুসন্ত দ্বারা প্রভাবিত, স্ফূর্তি-মন্ত্রে উদ্দীপিত অশ্বিনীকুমার বরিশালে অবতীর্ণ হইলেন। ইহার পরই তাঁহার কর্মজীবনের প্রকৃত পক্ষে সূচনা।

৩

তাঁহার ওকালতীতে নাম হইতে অধিক বিলম্ব হইল না, কিন্তু তাহার চেয়েও বেশী নাম হইল অন্য কারণে। অশ্বিনীকুমার ভক্ত, ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠযোগ ; অশ্বিনীকুমার সঙ্গীত রচয়িতা, গানের দ্বারা সাধারণকে উজ্জীবিত করিতেছেন ; অশ্বিনীকুমার বক্তা, বক্তৃতায় তিনি সকলকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত বক্তৃতা দ্বারা তিনি এমনভাবে সকলকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন যে, তিনি 'বরিশালের কেশবচন্দ্র' বলিয়া তখন আখ্যাত হইতে লাগিলেন। অশ্বিনীকুমারের আবির্ভাবে বরিশালের নৈতিক আবহাওয়াও ফিরিয়া গেল। শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলের মধ্যেই যে সব দুর্নীতির প্রাবল্য দেখা যাইতেছিল, তাঁহার উপস্থিতিতে তাহা যেন স্তব্ধ হইয়া গেল। স্বদেশবাসীদের নিজ কর্তব্যে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তিনি সঙ্গীতের আশ্রয় লইলেন। এই সময় তিনি যে সব গান রচনা করিলেন 'ভারত-গীতি' নামক পুস্তকে ১৮৮৪

সনে তাহা প্রকাশিত হয়। আদালতে অশ্বিনীকুমার বিচিত্র রকমের লোকের সংস্পর্শে আসেন। উহার বাহিরে মাঝি মাল্লা, দোকানদার, তাঁতি জোলা, নমঃশূদ্র চাষী প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিয়া তিনি বক্তৃতা ও সঙ্গীতের সাহায্যে তাহাদের মধ্যে নীতি ও কর্তব্য-বোধ জাগ্রত করিতে চেষ্টা করিলেন।

ভারতবর্ষে ১৮৮৪ সনে স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্তনকল্পে বিধিমত আয়োজন হয়। বরিশালে কিন্তু প্রথমেই ইহা আরম্ভ হয় নাই। বরিশালবাসী ইহা আশু প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে আন্দোলন উপস্থিত করিল। বারশালে রাজ-নৈতিক আন্দোলন পরিচালনার জন্য 'People's Association' বা জনসাধারণ-সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। অশ্বিনীকুমার ইহার দ্বিতীয় সম্পাদক হন। জিলার জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন ছিল ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। বরিশালবাসীর পক্ষে অন্যান্যদের সঙ্গে অশ্বিনীকুমারও লাট দরবারে স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হইলেন। ইহাতে ফল হইল। ১৮৮৭ সনে বরিশালে স্বায়ত্তশাসন আইন অনুযায়ী ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড লোকালবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হয়। প্রতিনিধিমূলক শাসন ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয় এই সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। অশ্বিনীকুমার এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই যুক্ত হইয়া পড়িলেন। কোনটির সদস্য, কোনটির সহকারী সভাপতি এবং কোনটির সভাপতি হইলেন। তিনি এই সকল প্রতিষ্ঠানের সদস্য নির্বাচনের মধ্য দিয়াও জনগণের সংস্পর্শে আসিতে লাগিলেন। 'দেশ-জন-ধর্ম' তিন দিকেই অশ্বিনীকুমার কর্মতৎপর হইয়া উঠেন।

কিন্তু আর একটি বিষয়ের সূচনা হইতেই তাঁহার সত্যকার জীবনব্রত আরম্ভ হইল। বরিশালে একটি মাত্র 'জিলা স্কুল' নামে সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় ছিল। বাঙ্গলা সরকারের ১৮৫৩, অক্টোবরের আদেশ বলে ঐ সনের ১৬ই ডিসেম্বর বরিশালে জিলা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮৪ সনে

ইহার ছাত্রসংখ্যা ছয়শতের উপর উঠিল। কিন্তু সরকার প্রয়োজনানুরূপ গৃহ বাড়াইতে রাজী হইলেন না। তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট রমেশচন্দ্র দত্তের পরামর্শে অশ্বিনীকুমার ১৮৮৪ সনের ২৭শে জুন ব্রজমোহন স্কুল প্রতিষ্ঠা করিলেন। ব্রজমোহন তখনও জীবিত, তাঁহার ইচ্ছা ছিল ইহার নাম দেওয়া হয় 'ন্যাশন্যাল স্কুল'। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উক্ত নামই থাকিয়া যায়। ইহার পর এই বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়াই অশ্বিনীকুমারের সকল কার্য পরিচালিত হইতে লাগিল।

ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের মূল মন্ত্র—সত্য, প্রেম, পবিত্রতা; নিজস্ব পতাকায় এই মন্ত্রটি লিখিত হয়। বিদ্যালয়ের একটি নিজস্ব সঙ্গীতও ছিল। এখানে ভর্তি হইবার সময় প্রত্যেক ছাত্রের হাতে কুড়িটি উপদেশ সম্বলিত এক লিপি দেওয়া হইত। ইহার হেতুবাদের প্রথমে ছিল—"আমরা বিদ্যালয়ে ও গৃহে উভয় স্থলেই তোমার ব্যবহার সমভাবে পর্যবেক্ষণ করিব। তোমার প্রতি আমাদের তত্ত্বাবধান বিদ্যালয়ের ছুটি হওয়ার সঙ্গে শেষ হইবে না।" অশ্বিনীকুমারের নেতৃত্বে বিদ্যালয় পরিচালনা এমন সুষ্ঠুরূপে হইত যে, ইহার ছাত্রসংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া চলিল। শিক্ষা দান কার্যেও যোগ্য এবং নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের নিয়োগ করিলেন। তাঁহার পূর্বপরিচিত বন্ধু ও ছাত্রদের নিয়োগেও পশ্চাৎপদ হইলেন না। অশ্বিনীকুমার বিদ্যালয়ে যে আদর্শ স্থির করিলেন, তাঁহার সহকর্মীগণ প্রাণপণে তদনুযায়ী কার্য করিতে যত্নবান্ হন।

বিদ্যালয়ের আদর্শ অনুযায়ী অশ্বিনীকুমার সহকর্মীদের লইয়া ইহার বাহিরেও ছাত্রগণের উন্নতির জন্য সবিশেষ অবহিত হইলেন। খেলার মাঠে, ভ্রমণে, সভাসমিতিতে, আমোদ-প্রমোদে ইহারা সকলে মিলিত হইতেন। ক্রমে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানও গড়িয়া উঠিল। 'Little Brothers of the Poor' (দরিদ্র লোকের ছোট ছোট ভাই) প্রতিষ্ঠিত হইল রোগী ও দরিদ্রের সেবার জন্য। অশ্বিনীকুমার স্বয়ং কলেরা ব্যাধিগ্রস্ত মুসলমান ও

তথাকথিত অন্ত্যজ রোগীদের সেবা করিয়াছেন। তখন বরিশালে কলেরার খুব প্রকোপ ছিল। অশ্বিনীকুমার নিজের সেবার আদর্শ ছাত্রদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করাইবার জন্য এই প্রতিষ্ঠানটি গঠন করিলেন। পণ্ডিত কালীশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদের নাম এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে বিজড়িত হইয়া আছে। এই সেবা-প্রতিষ্ঠানটির এরূপ সুনাম ছিল যে, এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার দশম সংস্করণে (১৯০২) বরিশাল নামক নিবন্ধে এইরূপ উল্লেখ আছে ঃ

"It contains two first grade colleges, opened without Government aid......there are..a Public Library established by subscription in 1858, and a Students' Union for helping the sick and poor and promoting the intellectual and physical improvement of boys."

'Band of Hope' (আশা দল), 'Fire Brigade' (অগ্নি-নির্বাপক দল), 'Friends' Union' (বান্ধব সমিতি) প্রভৃতিও প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহাদের প্রায় প্রত্যেকটিই অশ্বিনীকুমারের নেতৃত্বে পরিচালিত হইত। শেষোক্ত সমিতিতে অশ্বিনীকুমার সময় সময় পৌরোহিত্য করিতেন। এই সব কার্য ছেলেদের পাঠ ও স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই করিতে হইত।

ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে অশ্বিনীকুমারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা উল্লেখ করিয়াছি। এখানে প্রদত্ত দুইটি প্রসিদ্ধ ইংরেজী বক্তৃতা (১) Rejoicings in Brahmo Somaj এবং (২) The Silver Wedding of the East and the West পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। অশ্বিনীকুমার ব্রাহ্মসমাজের সংস্কারমূলক কার্যের পক্ষপাতী হইলেও প্রাচীন সমাজ হইতে নিজেকে ছিন্ন করিতে চাহেন নাই। অষ্টম দশকেই কতকগুলি কার্যের জন্য ব্রাহ্মসমাজ-কর্তৃপক্ষ তাঁহার প্রতি রুষ্ট হন। তিনি ইহা

হইতে ক্রমশঃ দূরে সরিয়া পড়েন। ১২৯৩ (১৮৮৬ ইং) বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে তিনি সন্ত-প্রধান বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। ১২৯৪ বঙ্গাব্দে 'ভক্তিযোগ' গ্রন্থের বিখ্যাত বক্তৃতাগুলি অশ্বিনীকুমার কর্তৃক ব্রজমোহন বিদ্যালয়-গৃহে প্রদত্ত হয়। এই বক্তৃতাসমূহই আচার্য জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় পরে উক্ত নামে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি এতই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে যে, ইহা ইংরেজী এবং কয়েকটি ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়।

এই দশকের প্রথম হইতে আরব্ধ আশ্বনীকুমারের রাজনৈতিক কার্যের কথা আলোচনা করিয়াছি। ১৮৮৫ সনে যখন বোম্বাইয়ে ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় তখন বাঙ্গলার প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দের পক্ষে ইহাতে যোগ দেওয়া সম্ভব হয় নাই। ১৮৮৬ সনে কলিকাতা অধিবেশন হইতেই বাঙ্গালী নেতৃবৃন্দ প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাতে যোগ দিলেন। অশ্বিনী-কুমারের রাজনৈতিক কার্যের মধ্যে বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইত। শিক্ষিত সমাজ জনসাধারণ হইতে আলাদা ইহা তিনি কল্পনাও করিতে পারিতেন না। তিনি কংগ্রেসের পরবর্তী মাদ্রাজ অধিবেশনে (১৮৮৭) বরিশাল জেলার পঁয়তাল্লিশ সহস্রেরও অধিক হিন্দু-মুসলমান কৃষকের স্বাক্ষরযুক্ত একখানি আবেদন উপস্থিত করিলেন। আবেদনের মর্ম—আমরা যাহাকে স্বরাজ বলি তাহারই আদর্শে এদেশে প্রতিনিধি-মূলক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন। তিনি এই আবেদনখানি ইহার পূর্বে পার্লামেন্টেও পাঠাইয়াছিলেন। কংগ্রেস ইহার বহু পরে জনগণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

৪

অষ্টম দশকের শেষ বৎসর হইতেই অশ্বিনীকুমার আর একটি গুরুতর বিষয়ে হাত দিলেন। তাঁহার পিতৃদেব এই শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া-

ছিলেন যে, বিদ্যালয়টি যেন অদূর ভবিষ্যতে কলেজে উন্নীত হয়। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পাঁচ বৎসর পরে, ১৮৮৯ সনে, অশ্বিনীকুমারের অক্লান্ত চেষ্টায় ও পরিশ্রমে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ খোলা হইল। এই বৎসরই লাখুটিয়ার জমিদার বিহারীলাল রায় রাজচন্দ্র কলেজ স্থাপন করিলেন। পরবর্তী সনে ইহা প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত হইল, সঙ্গে সঙ্গে আইনের ক্লাশও খোলা হইল। তখন বরিশাল সহর এত প্রসারিত হয় নাই, ইংরেজী শিক্ষাও ব্যাপকতা লাভ করে নাই। এইরূপ ক্ষেত্রে দুইটি কলেজ পরিচালনা কিরূপ কষ্টসাধ্য তাহা সহজেই অনুমেয়।

কিন্তু অশ্বিনীকুমার দমিবার পাত্র নহেন। তাঁহার আদর্শে বরিশাল-বাসী অনুপ্রাণিত। নিজ গৃহপ্রাঙ্গণে স্কুলের সঙ্গে কলেজ ক্লাশ খুলিয়া দিয়া শত কৃচ্ছ্রতার মধ্যেও ইহাকে চালাইতে লাগিলেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রপ্রতিষ্ঠানগুলি অধিকতর সুগঠিত হইল। ছাত্রগণ নিজ চরিত্র গঠনেই শুধু অবহিত হইলেন না, পারিবারিক কলহাদি নিবৃত্ত করায়ও তাঁহারা অগ্রসর হইলেন। অশ্বিনীকুমার এই সকল কার্যে সহকর্মীদের প্রচুর সহায়তা পাইতে লাগিলেন। তখন আচার্য জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্কুল ও কলেজে পাঠনায় রত, কর্তব্যনিষ্ঠ কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, অশ্বিনীকুমারের গুণমুগ্ধ কৃতী ছাত্র ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কলেজ বিভাগের অধ্যক্ষ। সেবাপরায়ণ কালীশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদের কথা আগেই বলিয়াছি। যেমন অশ্বিনীকুমার তেমনি তাঁহার সহকর্মীবৃন্দ! একই স্থানে এমন সমাবেশ কদাচিৎ দৃষ্ট হয়।

জমিদারপুষ্ট রাজচন্দ্র কলেজের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ছিল, কিন্তু তাহা লইয়া কখনও কলহ বাধে নাই বা উভয়ের মধ্যে মনকষাকষিও ঘটে নাই। ব্রজমোহন কলেজ অন্তর্নিহিত শক্তিতেই সমস্ত বিপদ আপদ কাটাইয়া উঠিয়াছিল। রাজচন্দ্র কলেজ প্রথম শ্রেণীতে পরিণত হইবার আট বৎসর পরে ১৮৯৮ সনে ব্রজমোহন কলেজ বি-এ ক্লাস

খুলিবার অনুমোদন লাভ করে। সঙ্গে সঙ্গে এখান হইতে আইন পরীক্ষা দিবারও ব্যবস্থা হয়। ব্রজমোহন স্কুল এবং কলেজের সুনাম তখন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ছাত্রদের নীতিজ্ঞান কত দৃঢ়মূল ছিল তাহার অনেক কাহিনী আমরা শুনিয়াছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার বিখ্যাত রেভাঃ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্রদের পরীক্ষার সময় কোন 'গার্ড' না দেখিয়া বিস্মিত হন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছেলেরা কখনও উত্তর নকল করে না বা এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করে না! সরকারের নিকটও বিদ্যালয়টি একটি উৎকৃষ্ট আদর্শ প্রতিষ্ঠান বলিয়া গণ্য হইল। ছোটলাট সার জন উডবার্ণ ইহাকে "A remarkable monument of private enterprise" বলিয়া অভিনন্দিত করিলেন। অধ্যাপক কানিংহামও বলিয়াছিলেন, 'বরিশাল থাকিতে কেন ভারতীয় যুবকেরা কেম্ব্রিজে যায় তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না।'

বলা বাহুল্য, অশ্বিনীকুমার ছিলেন এ সকল প্রচেষ্টারই মূলে। তিনি কলেজে ইংরেজী অধ্যাপনা করিতেন। কিন্তু আগেই আমরা দেখিয়াছি, ছাত্র সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার যাবতীয় উপায় তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন। খেলাধূলা, রাস্তায় বেড়ানো, নৌভ্রমণ, বাড়িতে বসিয়া ছাত্রদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা তো ছিলই, ইহা ছাড়া অতিরিক্ত আরও কিছু ছিল। আমাদের জাতীয় উন্নতির মূলে চরিত্র গঠন। যুবক সমাজকে শুষ্ক উপদেশ দিয়া তিনি ক্ষান্ত হইতেন না, নিজের জীবন দিয়া, নানাজনের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তিনি তাঁহাদের চরিত্রবান্ হইতে অনুপ্রাণিত করিতেন। বিদ্যালয়ের বান্ধব সমিতিতে এই উদ্দেশ্যে তিনি যে সব বক্তৃতা করিয়াছেন তাহা ভাষার পারিপাট্যে এবং জ্ঞানের গভীরতায় অমূল্য। এইরূপ দুই প্রস্থ বক্তৃতা পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ হইয়া "প্রেম" ও "দুর্গোৎসবতত্ত্ব" নামে প্রকাশিত হইয়াছে। 'কর্মযোগ' নামে বহু পরে (১৯১৪) প্রকাশিত আর একখানি বইও যুবক সমাজকে লক্ষ্য করিয়াই রচিত।

অশ্বিনীকুমারের প্রত্যেকটি কার্যই ছিল গঠনমূলক, যাহাকে বর্তমান পরিভাষায় "রচনাত্মক" বলা হয়। এ সময়কার কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনমূলক কার্যপ্রণালীর তীব্র সমালোচনা করিতে তিনি ক্ষান্ত হন নাই। চিত্তুরশঙ্করণ নায়ারের সভাপতিত্বে ১৮৯৭ সনে অমরাবতীতে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় সেখানে একটি বক্তৃতায় আশ্বিনীকুমার ইহাকে 'তিনদিনের তামাসা' বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় অশ্বিনীকুমার সম্বন্ধে বলেন, "কংগ্রেসের এক অধি-বেশনে—কোথায় তাহা মনে পড়িতেছে না, তিনি অনেক 'স্বদেশভক্ত'কে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নন্দদুলালের সহিত তুলনা করিয়া যে বক্তৃতা করিয়া-ছিলেন, তাহা এখনও আমাদের মনে আছে। তিনি স্বয়ং নন্দদুলাল জাতীয় স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন না।" (প্রবাসী—অগ্রহায়ণ ১৩৩০, পৃঃ ২৭৪।) এইরূপ কঠোর সমালোচনা করিলেও অশ্বিনীকুমার কংগ্রেসকে জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়াই গণ্য করিতেন, প্রায় প্রতিটি অধিবেশনেই তিনি উপস্থিত থাকিতেন এবং ইহার কার্যে যথাসাধ্য যোগ দিতেন। নিজ জিলায় ফিরিয়া কংগ্রেসের কথা জনসভায় প্রচার করিতেও তিনি ত্রুটি করিতেন না।

অধ্যক্ষ ব্রজেন্দ্রনাথের উপর কুষ্টিয়ায় নীলকরের লোকজন কর্তৃক যে অত্যাচার হয়, তাহার প্রতিকারকল্পে বরিশালে অশ্বিনীকুমার বিশেষ তৎপর হইয়াছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথের মোকদ্দমা হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়ায় এবং শেষ পর্যন্ত তিনিই জয়লাভ করেন। ইহার পর নীলকরদের অত্যাচার ঐ অঞ্চলে একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। অশ্বিনীকুমার প্রবর্তিত আন্দোলনের ফলেই তখন ইহা সম্ভব হয়। বিবিধ জনহিতকর কার্যের মধ্যে মাদকদ্রব্য নিবারণ সম্বন্ধেও তিনি বিশেষ তৎপর ছিলেন। পার্লামেণ্ট সদস্য ডবলিউ, এস, কেন্ এই বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন। অশ্বিনীকুমারের এই সকল কার্যকলাপ তিনি নিজ পত্রিকায় প্রকাশ করিতেন। ১৮৯৭ সনে আলমোড়ায় স্বামী

বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ এবং জনশিক্ষার ("mass education") প্রতি তাঁহার আগ্রহ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। পরাধীন স্বামীজীর বুটজুতা স্বাধীন ইংরেজ ও আমেরিকানদের দিয়া খোলানো ও তাহাদের দিয়া তাঁহাকে চামর ব্যজন করানো দেখিয়া অশ্বিনীকুমারের কি আনন্দ !

৫

অশ্বিনীকুমারের কীর্তিসূর্য যখন প্রায় মধ্য গগনে, তখন উনবিংশ শতাব্দী পরিসমাপ্ত হইল। বাঙ্গলা ও মহারাষ্ট্রে এক শ্রেণীর চিন্তাশীল নেতার উদ্ভব হইল, যাঁহারা কংগ্রেসের 'ভিক্ষা'-নীতির পরিবর্তে আত্মশক্তির উপরেই অধিকতর নির্ভর করিতে চাহিলেন। লর্ড কার্জন (১৮৯৮–১৯০৫) ভারতের বড়লাট হইয়া আসিয়া ব্রিটিশের স্বার্থান্ধ সাম্রাজ্যনীতি পূর্ণ মাত্রায় প্রবর্তন করিতে প্রয়াসী হইলেন ; তখন এই আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী দল নিজ প্রতিজ্ঞায় আরও অটল ও দৃঢ় হইলেন। ১৯০৩ সনের ৩রা ডিসেম্বর ভারত সরকার সর্বপ্রথম ঘোষণা করিলেন যে শাসন কার্যের সুবিধার জন্য বাঙ্গলা ও মাদ্রাজকে বিভক্ত করা হইবে। এই বৎসর লালমোহন ঘোষের সভাপতিত্বে মাদ্রাজে কংগ্রেসের অধিবেশনে এই প্রস্তাবের ঘোর প্রতিবাদ করা হয়। কার্জন একগুঁয়ে ও স্বৈরাচারী ; তাঁহার প্রস্তাব যেমন ক্রমশঃ সংশোধিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছিল, প্রতিবাদও তেমনি দানা বাঁধিতেছিল। অবশেষে ১৯০৫ সনের ২০শে জুলাই সরকারের চরম সিদ্ধান্ত প্রকাশ পাইল—বাঙ্গলাকে ভাগ করিতেই হইবে। তবে স্থির হইল বঙ্গভঙ্গ আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হইবে পরবর্তী ১৬ই অক্টোবর।

ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের স্কুল ও কলেজ বিভাগে ইহার আদর্শের প্রতি

শ্রদ্ধাশীল তাঁহার বিশ্বস্ত সহকর্মীরা আসিয়া যোগ দিলেন। কলেজ বিভাগে প্রথমে অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ রজনীকান্ত গুহ (১৯০১—১১), অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং স্কুল 'বিভাগে' ভবরঞ্জন মজুমদার, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ) প্রমুখ কর্মীবৃন্দ অশ্বিনীকুমারের সহযোগী হইলেন। বিদ্যালয়ের ভিতরে ও বাহিরে আদর্শানুগ কার্য সমানে চলিতে লাগিল। অশ্বিনীকুমার এতদিনে প্রকৃত লোক-শিক্ষক হইয়াছেন। জনসাধারণের সঙ্গে তাঁহার যোগসূত্র দৃঢ়। সেবা ও প্রেম দ্বারা দূরদূরান্তের লোককেও তিনি আপন করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার এক একটি ছাত্রের মধ্যে তাঁহার কর্মনৈপুণ্য এবং আদর্শ চরিত্রের ছাপ প্রতিভাত হইত। তাঁহাদের কার্য ও আচরণ অশ্বিনীকুমারের মহিমা ঘোষণা করিত। যখন বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব সরকারীভাবে প্রচারিত হইল, তখন বরিশাল জেলাবাসী ব্যক্তিগত বাদবিসম্বাদের কথা ভুলিয়া এককভাবে স্বদেশগতপ্রাণ অশ্বিনীকুমারের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। বুঝা গেল, তিনি সত্যই লোকনেতা।

বঙ্গভঙ্গজনিত স্বদেশী আন্দোলনের কথা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রচেষ্টার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। অশ্বিনীকুমারের নেতৃত্বে বরিশাল জেলা ইহার বিরুদ্ধে কিরূপ আন্দোলন করিয়াছিল, তাহা লিখিতে গেলেও একখানি বড় বই হইয়া যায়। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাজনীতিতে আবর্তে না জড়াইয়া ইহার কর্মীদের দ্বারাই তিনি ১৯০৫ সনের ৬ই আগষ্ট স্বদেশ-বান্ধব সমিতি গঠন করিলেন। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হইলেন ইহার সম্পাদক, আর সভাপতি হইলেন অশ্বিনীকুমার স্বয়ং। বাখরগঞ্জের পল্লীতে পল্লীতে স্বদেশীর বার্তা পৌঁছাইয়া দিবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক ও প্রচারক নিযুক্ত হইলেন। এই উদ্দেশ্যে অশ্বিনীকুমারের আনুকূল্যে প্রিয়নাথ গুহের সম্পাদনায় 'বিকাশ' নামক একখানি পত্রিকাও বাহির হইল। জাতীয়তাবাদের

পরিপোষক 'বরিশাল হিতৈষী' প্রতিষ্ঠার মূলেও তিনি ছিলেন। বরিশালে অশ্বিনীকুমারের নেতৃত্বে পাঁচজন স্থানীয় নেতার স্বাক্ষরযুক্ত বিলাতী দ্রব্য বর্জনের ইস্তাহার বাহির হইল। বিলাতী জিনিস আর বিক্রয় হয় না। সরকারী কর্মচারীরা প্রমাদ গণিল। ম্যাজিস্ট্রেট শত চেষ্টায়ও বিলাতী জিনিস কিনিতে পান না। দোকানদাররা বলিল, ঐসব পাইতে হইলে 'বাবু'র (অশ্বিনীকুমার) আদেশপত্র চাই। সহরে যখন এই রকম অবস্থা, তখন ভাঙ্গা বাঙ্গলার ছোটলাট স্যার ব্যামফীল্ড ফুলার আসিয়া অশ্বিনীকুমারের সহিত ইস্তাহারে স্বাক্ষরকারী নেতাদের নিজ ষ্টীমারে ডাকাইয়া উহা প্রত্যাহার করিতে বাধ্য করিলেন। তখন বরিশালের সর্বত্র পুলিশ ও গুর্খা সৈন্য ছাইয়া গিয়াছে।

ইস্তাহার প্রত্যাহৃত হইল ; কিন্তু জনসাধারণ বিলাতী বর্জন আন্দোলন শুরু করিয়া দিল। ৭ই আগষ্ট ও ১৬ই অক্টোবর (১৯০৫) বঙ্গভঙ্গ দিনে বরিশালেও রাখীবন্ধন ও সভাসমিতির অনুষ্ঠান হইল। স্বদেশ-বান্ধব সমিতির সভ্য ও প্রচারকগণ জেলার সর্বত্র নির্দিষ্ট কার্যক্রম অনুসারে কাজ করিয়া চলিলেন। বিভিন্ন পল্লীতে দেড়-শতেরও অধিক শাখা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার এক বৎসরের কার্যকলাপ দেখিয়া ১৯০৬, ১৬ই আগষ্ট The Bengalee লেখেন,—

"The Swadesh Bandhab Samity of Barisal has within a year worked miracles. Who is there amongst us who will not be proud to belong to such an organisation? The Barisal Swadesh Bandhab Samity has made every Bengali proud of his nation".

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্বদেশী ও সালিশী—এই চারিটি অশ্বিনীকুমারের গঠন-মূলক কার্যের অঙ্গ। প্রচারক দ্বারা শুধু নহে, তিনি এই সকল বিষয়ের

মর্ম জনসাধারণের হৃদয়ে গাঁথিয়া দিবার জন্য কথকতা, যাত্রা ও জারির আশ্রয় লইলেন এবং হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে গায়ক নিযুক্ত করিলেন। 'স্বদেশী' যাত্রা গানের গায়ক মুকুন্দ দাস এবং কথক হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম বাঙ্গালীমাত্রেই অবগত আছেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে অশ্বিনীকুমার মুকুন্দ দাসের স্বদেশী যাত্রা-গান দ্বারা নিজ জেলাবাসীদের স্বদেশী মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেন। অশ্বিনীকুমার স্বয়ং, কবি মনোমোহন চক্রবর্তী এবং আরও অনেকে যাত্রার জন্য স্বদেশী-গান রচনা করিয়া দিতেন।

ইহার পর আসিল ১৯০৫ সনের বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলন। সরকার হুকুম দিলেন—প্রকাশ্য রাজপথে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করা হইবে না, এই সর্তে রাজী হইলে প্রাদেশিক সম্মেলন হইতে দিবেন, নতুবা নহে। সম্মেলন পণ্ড হওয়া সমীচীন নয় ভাবিয়া অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অশ্বিনীকুমার উক্ত হীন সর্তেও সম্মত হন। কিন্তু এই বন্দে-মাতরম্ ধ্বনি লইয়াই যত গণ্ডগোল বাধিল। সম্মেলন ১৩ই ও ১৪ই এপ্রিল হইবার কথা। নেতৃবৃন্দ সমবেত হইয়া স্থির করিলেন, সভাপতি আব্দুল রসুলকে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি সহযোগে শোভাযাত্রা করিয়া লইয়া যাওয়া হইবে। ১৩ই এপ্রিল পুলিশ আরব্ধ শোভাযাত্রার উপর লাঠি-চালনা করিল এবং অনেকে আহত হইলেন। তখনকার বঙ্গের অবিসংবাদী নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলাতে লইয়া যাওয়া হইল। সরাসরি বিচারে তাঁহার চারিশত টাকা জরিমানা হয়। আশ্বনীকুমার ধুতি-চাদর-পরা ছিলেন বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক অপমানিত হন। তিনি তখন প্রতিজ্ঞা করেন ধুতি-চাদর-ছাড়া আর কিছু পরিবেন না। পরবর্তীকালে লাট-বেলাটের সঙ্গে সাক্ষাৎকালেও এই প্রতিজ্ঞায় তিনি অটল ছিলেন। প্রথম দিনের সম্মেলন কোনমতে সমাধা হইল, কিন্তু দ্বিতীয় দিনে অধিবেশন আরম্ভ হইবার অল্প পরেই পুলিশের আদেশে ইহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। সুরেন্দ্রনাথ হাইকোর্টের

আপীলে জিতিয়া যান এবং পরবর্তী আগষ্ট মাসে বরিশালবাসীর আহ্বানে পুনরায় বরিশালে গিয়া বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন।

বরিশালের বিলাতী দ্রব্য বর্জন ভারত-সচিব মর্লেকেও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি ১৯০৬, ১১ই মে Recollections-এ লেখেন যে, সীমান্ত, সমর-ব্যয় এবং বরিশাল এই তিনটি বিষয় ভাবিয়া তিনি বিনিদ্র রজনী কাটাইতেছেন। বস্তুতঃ বরিশাল স্বদেশী আন্দোলনে সমগ্র দেশে প্রথম স্থান অধিকার করিল। ব্রহ্মবান্ধব-অরবিন্দ-বিপিনচন্দ্র প্রমুখ প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দ কর্তৃক অনুষ্ঠিত এবং লোকমান্য তিলকের উপস্থিতি-পূত কলিকাতার শিবাজী উৎসবে মূল উৎসব দিনের (১৯০৬, ৫ই জুন) সভাপতি পদে জননায়ক অশ্বিনীকুমারকে বরণ করিয়া বরিশালকে সম্মানিত করা হইল। বরিশাল নিজ গুণে তখন 'পুণ্যে বিশাল' হইয়াছে।

যে ফুলার সাহেবের অনাচারে সমগ্র পূর্ববঙ্গ প্রকম্পিত হইয়াছিল, পূর্ববঙ্গ শাসনে অতিরিক্ত কর্মতৎপরতা দেখাইতে গিয়া তিনিও শীঘ্রই পদত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। যাইবার পূর্বে ১৯০৬, ১৪ই আগষ্ট অশ্বিনীকুমারকে যে পত্রখানি লেখেন, তাহাতে তাঁহার কর্মশক্তির উপর ফুলারের অগাধ বিশ্বাসই সূচিত হয়। তিনি সরকারের বিরুদ্ধে যাইতে নিষেধ করিবার হেতুস্বরূপ তাঁহাকে লেখেন,—

"For you are, I am aware, not one of those who render to their country lip-service only. To the cause of education you have devoted practical and successful efforts, realising that philanthropy is shown by deeds." (সন্ধ্যা ২৫শে আগষ্ট, ১৯০৬)

৬

সরকারী অনাচার ও নির্যাতন ছাড়া আর একটি আকস্মিক বিপদও বাখরগঞ্জে ঘনাইয়া আসিল। তাহা হইল ব্যাপক দুর্ভিক্ষ। স্বদেশ-বান্ধব সমিতি তথা রাজনৈতিক কার্যের ভার সমিতির সম্পাদক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হস্তে সম্পূর্ণ ন্যস্ত করিয়া অশ্বিনীকুমার দরিদ্র নারায়ণের সেবায় লাগিয়া গেলেন। সাহায্য সমিতি গঠিত হইল। ১৯০৬ সনে ১১ই মে হইতে ২২শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৬০টি কেন্দ্রে চার লক্ষ নব্বই হাজার বুভুক্ষুর মুখে অন্ন দান করিয়া তাহাদের বাঁচাইয়া তোলা হইল। অথচ সরকার বলিয়াছিলেন, বরিশালে দুর্ভিক্ষ নাই। ভগিনী নিবেদিতা দুর্ভিক্ষকালে 'স্কুল মাষ্টার' অশ্বিনীকুমারের কর্মকুশলতার বিষয় এইরূপ বলিয়াছেন,—

"Among voluntary organisations, unrecognised by State or Government, and taking place spontaneously in face of the need with which they were to deal, this, for rapidity of formation, loyalty to its leaders, cohesion and efficiency, might well, I think, claim to be unprecedented in any country."

"It was a school-master and his students, then, who organised the relief of Backergunge. For Aswini Kumar Dutt is nothing after all, but the Barisal school-master."

—*The Modern Review* for May, 1907. Pp. 431-433

তখন রাজনীতিক্ষেত্রে চরমপন্থী ও নরমপন্থী দুই দল দেখা দিয়াছে। অশ্বিনীকুমার প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বিপ্লবীদের কর্মপন্থা অনুমোদন করিতেন না। ১৯০৬, ডিসেম্বরে কলিকাতায় দাদাভাই

নৌরজীর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন হইল। কংগ্রেস প্রদর্শনী লইয়া কিন্তু গোল বাধিল। চরমপন্থীরা বিলাতী দ্রব্যের বিজ্ঞাপন দেওয়া এবং লর্ড মিণ্টো কর্তৃক প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সভায় প্রতিবাদ করিলেন। কালীঘাট মন্দিরে যে সভা হইল তাহার সভাপতি হন অশ্বিনীকুমার। তাঁহারা প্রদর্শনী বর্জন করিলেন। অশ্বিনীকুমার এবারকার কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সহকারী সভাপতি হইয়াছিলেন। কংগ্রেসে স্বদেশীর অনুকূলে প্রস্তাব পাস হইলেও বুঝা গেল, চরমপন্থী ও নরমপন্থী দলের বিরোধ চরমে উঠিতে বেশী বিলম্ব নাই।

সরকারী চক্রান্তে ১৯০৭ সনে কুমিল্লা ও ময়মনসিংহে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বাঁধিল। কিন্তু বরিশালে শত চেষ্টা করিয়াও, এমন কি ঢাকার নবাবের সাহায্য লইয়াও কুচক্রীরা দাঙ্গা বাধাইতে পারিল না। মুসলমানেরা একবাক্যে বলিল, যে 'বাবু' রোগে সেবা ও দুর্ভিক্ষে অন্নদান করেন তাঁহার আদেশ অমান্য করিয়া তাহারা দাঙ্গা বাধাইতে পারিবে না। বরিশালে অশ্বিনীকুমারের অখণ্ড প্রতাপ, ম্যাজিষ্ট্রেটকে তাঁহার অনুমতি লইয়া বিলাতী জিনিস কিনিতে হয়! ইহা সরকারের পক্ষে অসহ্য হইল। অবশেষে ১৯০৭ সনে সুরাট কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া গিয়া যখন চরমপন্থী ও নরমপন্থীরা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেন তখন সরকার রুদ্রমূর্তি ধারণ করিলেন। সংবাদপত্র নিরোধ আইন, সভাবন্ধ আইন পাস হইয়া গেল। বরিশাল সভাবন্ধ আইনের কবলে পড়িল। অশ্বিনীকুমার ও সতীশচন্দ্র বিভিন্ন স্থানের অন্য সাতজন দেশবিশ্রুত কর্মীর সঙ্গে ১৯০৮ সনের ১৩ই ডিসেম্বর ১৮১৮ সালের তিন আইনবলে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্দী হইলেন। আশ্চর্য সংগঠন শক্তিই অশ্বিনীকুমারের নির্বাসনের কারণ বলিয়া পরে জানা গিয়াছে। স্বদেশ-বান্ধব সমিতি বে-আইনী ঘোষিত হইল। মুকুন্দ দাস, ভবরঞ্জন মজুমদার প্রমুখ কর্মীগণ কারাবরণ করিলেন। দমননীতি পুরাদমে আরম্ভ হইল।

এতক্ষণ ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের (স্কুল ও কলেজ) কথা আলোচনা হয় নাই। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্রতী ও শিক্ষার্থীগণ ছিলেন অশ্বিনীকুমারের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ। ছোটলাট হইতে বহু পদস্থ রাজকর্মচারী একদা যে বিদ্যালয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন, কর্তৃপক্ষ তাঁহার টুঁটি চাপিয়া মারিতে উদ্যত হইলেন। কলেজের অধ্যক্ষ সুপণ্ডিত ও সুবক্তা রজনীকান্ত গুহ সমস্ত বিপদের মধ্যেও কলেজটিকে পরিচালনা করিতেছিলেন। ১৯০৭ সনের ৪ঠা মার্চ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মুষ্টিবদ্ধ বাহু নাড়িয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আমি না থাকিলে আপনাদিগকে মারিয়া কাটিয়া পুঁতিয়া ছাড়িত।" অর্থাৎ গবর্ণমেন্ট তখন এই বিদ্যালয়ের উপর ভীষণ খাপ্পা হইয়া পড়িয়াছিলেন। বস্তুতঃ আশুতোষের সহায়তায় বহু বিপদ-আপদের মধ্যেও,—এমন কি সরকার যখন এখান হইতে প্রেরিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎকৃষ্টতম ছাত্রকেও বৃত্তি হইতে বঞ্চিত ও উত্তীর্ণ ছাত্রদের সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ নিষিদ্ধ করিয়া দেন—রজনীকান্তের চেষ্টা-যত্নে বিদ্যালয়টি আত্মরক্ষা করে।

৭

অশ্বিনীকুমার নির্বাসনকাল লক্ষ্ণৌ জেলে কাটান। কারাগার দেহের উপর আঘাত হানিল বটে, কিন্তু তাঁহার মন আগের মতই স্ফূর্তি-পারা রহিয়া গেল। এখানে তিনি বহু সঙ্গীত রচনা করেন। গুরুমুখী শিখিয়া তিনি গ্রন্থসাহেব অধ্যয়ন করিলেন। ভারতীয় ও বিদেশীয় বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের রসাস্বাদনের জন্য তিনি বহু ভাষা শিখিয়াছিলেন। বাঙ্গালা, ইংরেজী, সংস্কৃত ছাড়া ফার্সী, হিন্দী, মারাঠি, উড়িয়া ও গুরুমুখীও তিনি আয়ত্ত করেন। দীর্ঘ চৌদ্দ মাস কারাবাসের পর ১৯১০ সনের ৮ই ফেব্রুয়ারী অন্যান্য বন্দী নেতাদের সঙ্গে তিনিও কারামুক্ত হইলেন।

ইহার পরেই তিনি বরিশালে আগমন করেন। তখন তাঁহার সম্মুখে প্রধান সমস্যা—ব্রজমোহন বিদ্যালয় কি করিয়া রক্ষা করা যায়। সরকারের বিরোধিতায় ইহা মৃতপ্রায় হইয়াছিল। অধ্যক্ষ রজনীকান্ত ও অন্যান্য শিক্ষাব্রতীগণ নামমাত্র বেতন লইয়া ইহাকে কোনমতে জিয়াইয়া রাখিতেছিলেন।

সরকার ভাবিলেন, বরিশালে যত নষ্টের গোড়া এই বিদ্যালয়। ইহাকে হাত করিবার জন্য তলে তলে চেষ্টাও চলিতেছিল। অশ্বিনী-কুমারের সম্মুখে দুইটি মাত্র পথ—বিদ্যালয় তুলিয়া দেওয়া, অথবা সরকারী সাহায্য গ্রহণ করিয়া কলেজ পরিচালনার কর্তৃত্ব সরকারের হস্তে অর্পণ করা। শেষোক্ত পথ অবলম্বনই তিনি তখন শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। কিন্তু সরকারী সর্ত বড়ই নির্মম, অধ্যক্ষ রজনীকান্ত, অধ্যাপক সতীশচন্দ্র প্রমুখ কয়েকজন শিক্ষাব্রতীকে চিরতরে কলেজ ত্যাগ করিতে হইবে! অশ্বিনীকুমার স্কুলটি আলাদা করিয়া স্বহস্তে রাখিলেন। সরকারী প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর স্থির হইল, তিনি সর্ত মানিয়া চলিবেন, কিন্তু উক্ত শিক্ষাব্রতিগণকে অন্যত্র নিয়োগে সরকার বাধা দিতে পারিবেন না। ইহাতে কাহারও আপত্তি হইল না। ১৯১১ সনের ১লা জুন হইতে ব্রজমোহন কলেজ সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজে পরিণত হইল। বড় সাধের ব্রজমোহন কলেজের এই পরিণতিতে অশ্বিনীকুমার মনে যে আঘাত পাইলেন মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাহা ভুলিতে পারেন নাই। অধ্যক্ষ রজনীকান্ত গুহের আত্মচরিতে স্বদেশী আন্দোলনকালে ব্রজমোহন বিদ্যালয়সংক্রান্ত বহু তথ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

পূর্বোদ্যম ফিরিয়া না পাইলেও অশ্বিনীকুমারের কর্মচঞ্চল মন নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিল না। তিনি ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশনের সভাপতি পদ গ্রহণ করেন। স্বদেশ-বান্ধব সমিতি বেআইনী। ইহার পরিবর্তে 'শিক্ষা স্বাস্থ্য বিধায়িনী সমিতি' গঠন করিয়া জেলার জনসেবার কার্যে

অগ্রসর হইলেন। ইহার মূলধন স্বরূপ তিনি বার্ষিক তিনশত টাকা দান করেন। ১৯১১ সনের ডিসেম্বর মাসে বঙ্গভঙ্গ রদ হইল। সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল। ইহার পর ১৯১৩ সনের ২২ ও ২৩শে মার্চ অশ্বিনীকুমার ঢাকায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। তাঁহার অভিভাষণে সরকারী অন্যায় অনাচারের প্রতিবাদ ও প্রতিকার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের শিক্ষাস্বাস্থ্যের উন্নতি ও সম্পদ বৃদ্ধির আয়োজন করিতেও দেশবাসীকে অনুরোধ জানান।

ইহার পর বহু বৎসর অশ্বিনীকুমার রাজনীতিতে বড় একটা যোগদান করেন নাই। শারীরিক অসুস্থতা ইহার প্রধানতম কারণ। দেশ পর্যটন তাঁহার বড়ই প্রিয় ছিল। তিনি সস্ত্রীক ভারতের বহু তীর্থ ও দ্রষ্টব্য স্থান দর্শন করেন। বাঙ্গলার বাহিরে নানাস্থানে দীর্ঘকাল কাটান। ১৯১৬ সনে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে চরমপন্থী ও নরমপন্থী দল মিলিত হয় এবং ইহার পর হইতে ইহাতে চরমপন্থীদেরই প্রাধান্য হয়। যখনই কোন বিশেষ সমস্যার সমাধান প্রয়োজন হইত তখনই অশ্বিনীকুমারের ডাক পড়িত। অসুস্থ শরীরেও ১৯১৮ সনে বোম্বাই স্পেশাল কংগ্রেসে তিনি উপস্থিত ছিলেন। ১৯১৯ সনের ভীষণ ঝড়ে বিপন্ন দেশবাসীর জন্যও তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি তাহাদের সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। অসহযোগ প্রস্তাব আলোচনার জন্য আহূত ১৯২০ সনের স্পেশাল কংগ্রেসে তিনি যোগ দিয়াছিলেন। ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ বাঙ্গলার চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ অশ্বিনীকুমারের নির্দেশে কংগ্রেসগৃহীত কাউন্সিল বর্জন প্রস্তাব মানিয়া লন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন অশ্বিনীকুমারকে 'গুরু' বলিয়া স্বীকার করিতেন। ধুতি-পরা সম্পর্কে একবার আশুতোষও অশ্বিনীকুমারকে বলিয়াছিলেন, স্যাডলার কমিশনের সদস্যরূপে তিনি যে সমগ্র ভারত ধুতি-চাদর পরিয়া ঘুরিয়াছিলেন, তাহার পথ দেখাইয়াছেন তিনি, অশ্বিনীকুমার তাঁহার গুরু।

৮

সমগ্র ভারতের আকাশ-বাতাস ১৯২১ সনের প্রারম্ভ হইতে অসহযোগ আন্দোলনে মথিত হইয়া উঠিতেছিল। এ বৎসর ১৯২১ সনের ২৪শে মার্চ বরিশালে বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের সভাপতিত্বে পুনরায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন হইল। ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া এবারেও অশ্বিনীকুমার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি যে তথ্যপূর্ণ অথচ 'রচনাত্মক' অভিভাষণ পাঠ করেন তাহা সকলেরই প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। এই অভিভাষণখানি পরে "আত্মপ্রতিষ্ঠা" নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গলা যে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে মাতিয়া উঠিয়াছে এই অধিবেশনে তাহা সম্যক্ বুঝা গেল।

এই বৎসরই ১২ই এপ্রিল অশ্বিনীকুমার ব্রজমোহন স্কুলটিকে জাতীয় বিদ্যালয়ে পরিণত করিলেন। তাঁহার আশীর্বাদ লইয়া কংগ্রেসের বাণী প্রচারের জন্য 'বরিশাল' পত্রিকাও প্রকাশিত হইল। রুগ্ন দেহ সত্ত্বেও এই সময়কার অন্যান্য আন্দোলনেও তিনি যোগ না দিয়া পারেন নাই। চাঁদপুরে কুলি নিগ্রহহেতু ষ্টিমার ধর্মঘট হইল। ধর্মঘটীদের সাহায্যের জন্যও তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রুগ্ন শরীর এবারে আরও ভাঙ্গিয়া যায়। চিকিৎসার্থ কলিকাতায় তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইল। দীর্ঘকাল রোগভোগের পর এখানেই তিনি ৬৮ বৎসর বয়সে মারা যান। অশ্বিনীকুমারের মৃত্যুতে সর্বত্র বিষাদের ছায়া পড়িল। দেশ-বিদেশের সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রে এবং জনসভাসমূহে তাঁহার গুণাবলী আলোচিত হইতে লাগিল। 'জননায়কে' অশ্বিনীকুমার সম্পর্কে মৃত্যুর বহু পূর্বে মনস্বী বিপিন পাল লিখিয়াছিলেন,—

"দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের সময়, হিন্দু ও মুসলমান দুঃস্থ ব্যক্তিগণ তুল্যভাবে অশ্বিনীকুমারের সেবা পাইয়া আসিয়াছে। বহু বৎসরের নিঃস্বার্থ

সামাজিক সেবাই জনসাধারণের হৃদয়মন্দিরে তাঁহার জন্য এক অক্ষয় স্বর্ণ-সিংহাসনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। তাহাদের কাছে তিনি একজন প্রধান বাগ্মী, ম্যাজিষ্ট্রেটের সহচর বা কমিশনারের বিশ্বস্ত বন্ধু নহেন; তাহারা তাঁহাকে তাহাদেরই একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু, দুর্দিনের সহায় এবং দুঃখকষ্টে একান্ত প্রিয়জন বলিয়াই জানে। অগাধ অর্থ দিয়া নহে, বাগ্মিতার মোহিনী শক্তিবলেও নহে, জ্ঞানগরিমার প্রভাবেও নহে, কিন্তু জনসাধারণের সহিত চিন্তায়, ভাবে, ও কার্যে সম্পূর্ণ এক হইয়া যাওয়াই যথার্থ জননায়কের বিশেষত্ব। আমরা এদেশে অধুনা একমাত্র অশ্বিনীকুমারে এই লোকনায়কত্বের কতকটা আভাস পাই।"

(চরিতকথা)

অশ্বিনীকুমার সত্য সত্যই এ যুগের অন্যতম লোক-নায়ক ছিলেন।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

১

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু প্রসঙ্গে একটি কথা আমাদের মনে বার বার উদিত হয়। নেতাজীর জীবন একটি ক্রমবর্ধমান ভাবধারার পরিণতি। বিদেশী রাজশক্তির বিরুদ্ধে আপোষ-রফার মনোভাব পরিহার পূর্বক ইহার মূলোচ্ছেদকল্পে সর্বশক্তি প্রয়োগ করিতে তিনি উদ্যোগী হইয়াছিলেন। যে ভাবধারার পরিণতি আমরা সুভাষচন্দ্রের মধ্যে লক্ষ্য করি, তাহার উদ্ভব ও অনুশীলনের ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত সচেতন নহেন। ব্রিটিশ আমলের প্রথম যুগে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে অজ্ঞ বা অপরিপক্ব প্রজাশক্তি মাঝে মাঝে বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছে। কিন্তু যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহায়ে প্রজাশক্তি সংহত এবং জাতীয় জীবন সুগঠিত হইতে পারে, তাহার অভাব ছিল বলিয়া তখন ইহাতে সাফল্যলাভ সম্ভব হয় নাই। বস্তুতঃ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসীরা ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণকে সে যুগে অন্যায় বলিয়াই মনে করিতেন। কিন্তু সিপাহী যুদ্ধের পর হইতে ইংরেজ শাসন যখন ভারতীয় সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া ইহাকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিতে উদ্যত হয়, তখনই একদল মনস্বী দূরদৃষ্টি বলে ইহার ভাবী অপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারিয়া জাতিকে সতর্ক থাকিতে উপদেশ দেন। ক্রমে ভারতবর্ষে, বিশেষ করিয়া বঙ্গদেশে এমন এক শ্রেণীর তেজস্বী চিন্তাশীল কর্মনায়কের আবির্ভাব হইল যাঁহারা এই উপদেশের সারবত্তা মর্মে ও কর্মে অনুভব করিলেন এবং সর্বগ্রাসী রাজশক্তির সঙ্গে আপোষ-রফার মনোভাব পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশীয়দের মধ্যে ক্ষাত্রশক্তির

উন্মেষে তৎপর হইলেন। এই সকল কর্মনায়ক ও চিন্তানায়কের শীর্ষস্থানে ছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় একটি আশ্চর্য পরিবেশের মধ্যে দেহত্যাগ করেন। এই বিষয়টি আমাদের অনেকেরই স্মরণ আছে, আর ইহা লইয়া আমরা গর্বও অনুভব করিয়া থাকি। কিন্তু যিনি একনিষ্ঠভাবে দেশমাতৃকার সেবাই করিয়া গেলেন, স্বদেশী মন্ত্রের ধারক ও বাহকরূপে বঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কর্মে লিপ্ত রহিলেন, তাঁহার বিষয় আলোচনার আয়োজন কোথায়? ব্রহ্মবান্ধবের সমসাময়িক এবং স্বদেশী আন্দোলনে সহকর্মী ও সমভাবুক মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, "আমাদের বর্তমান স্বাদেশিকতার আদর্শ কতকটা পরিমাণে যে আমরা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছি, দেশের লোকে যেন সে কথা ক্রমে ভুলিয়া যাইতেছে। নতুবা এত লোকের স্মৃতিকে জাগাইয়া রাখিবার জন্য কত আয়োজন হইতেছে, কিন্তু উপাধ্যায় মহাশয়ের নামে একটা বাৎসরিক স্মৃতিসভার আয়োজন পর্যন্ত হয় না কেন?" এতদিন হয়ত ব্রহ্মবান্ধবের জীবনকথা সম্যকরূপে আলোচনায় বাধা ছিল, কিন্তু দেশের নূতন পরিবেশে এখন আর তাহা নাই। উপাধ্যায় মহাশয় সম্বন্ধে সকল দিক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিলে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের অজ্ঞাত অধ্যায়গুলির উপর যথেষ্ট আলোকপাত হইতে পারে। তাহার সঙ্গে যাঁহারা সাক্ষাৎভাবে পরিচিত ছিলেন, এমন কেহ কেহ এখনও জীবিত আছেন। তাঁহারা উপাধ্যায় মহাশয় সম্বন্ধে কিছু লিখিলে বড়ই ভাল হয়। এযাবৎ ব্রহ্মবান্ধবের দুইখানি জীবনী রচিত হইয়াছে, একখানি বাঙ্গলায় ও একখানি ইংরেজীতে। জার্মান ভাষায়ও তাঁহার একখানি জীবনচরিত বহু পূর্বে রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। বাঙ্গলা ও ইংরেজী উভয় গ্রন্থেরই লেখকদ্বয় কোন-না-কোন সময়ে উপাধ্যায়ের সহকর্মী ছিলেন, আর

ইংরেজী গ্রন্থখানি খুবই তথ্যমূলক। তথাপি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে রচিত বলিয়া আসল মানুষটির স্বরূপ যেন আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। তবে তাঁহার কথা আলোচনায় এই দু'খানি গ্রন্থই বর্তমানে আমাদের সম্বল। "সন্ধ্যা" দৈনিকের ফাইল আবিষ্কৃত হইলে তাঁহার কৃতি সম্বন্ধে আরও অনেক কথা হয়ত জানা যাইবে।

২

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের পূর্বাশ্রমের নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন এবং কখন তিনি এই নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন পরে আমরা তাহা জানিতে পারিব। ভবানীচরণের পিতা দেবীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার দুই খুল্লতাত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কালীচরণ সে যুগের একজন প্রসিদ্ধ বাগ্মী এবং ইণ্ডিয়ান লীগ, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ও ইণ্ডিয়ান নেশন্যাল কংগ্রেসের অন্যতম নেতা। তাঁহার জনহিতব্রতের সম্পূর্ণরূপে উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন ভবানীচরণ। পিতা সরকারী কর্মে লিপ্ত ছিলেন। কৈশোরে তিনি পিতার সঙ্গে নানা জায়গায় গমন করেন। শৈশবে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। পিতামহী মাতার আসন গ্রহণ করিলেন। সেকালের রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, কথাবার্তা-আলাপ-আলোচনা, পাল-পার্বণ প্রভৃতির প্রতি ভবানীচরণের যে আন্তরিক শ্রদ্ধা—যাহার পরিচয় আমরা তাঁহার জীবনেই "সন্ধ্যা"-যুগে পাই, তৎসমুদয়ই পিতামহীর নিকট হইতে পাওয়া। গুরুর পাঠশালায় যথারীতি শিক্ষালাভ করিয়া তিনি ইংরেজী স্কুলে ভর্তি হইলেন। চুঁচুড়া হিন্দু স্কুল, হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল, কলিকাতার জেনারেল এসেম্বলি ইনিষ্টিটিউশন ঘুরিয়া শেষে হুগলী কলেজিয়েট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ছাত্র হিসাবেও ভবানীচরণের

বিশেষ সুনাম ছিল। অধ্যায়নই এসময় ছিল তাঁহার তপস্যা। আবৃত্তিতেও তিনি ছিলেন সুপটু। বহুবার প্রথম হইয়া তিনি উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হন। ত্রয়োদশ বৎসরে উপনয়ন সমাপনান্তে তিনি একদিকে যেমন মৎস্য মাংস পরিত্যাগ করিলেন, অন্যদিকে হুগলীর অপর পারে ভট্টপল্লীতে সংস্কৃত অধ্যায়নেও মন দিয়াছিলেন। এইখানেই তাঁহার পরজীবনের সংস্কৃত সাহিত্য দর্শন অনুশীলনের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি হুগলী কলেজে প্রবেশ করেন। এই সময়কার কয়েকটি ঘটনা তাঁহার জীবনীকারগণ যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে ভবিষ্যতে তিনি যে ক্ষাত্রশক্তির উপাসক হইবেন তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। আর্মানী ও ফিরিঙ্গিদের অত্যাচারে জর্জরিত প্রতিবেশীদের রক্ষার উদ্দেশ্যে তিমি কয়েকজন বন্ধুর সহযোগে অভিভাবকগণের অগোচরে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতে গোয়ালিয়র রওনা হন। দুই দুইবার রওনা হইয়া একবার পথিমধ্যে এবং অন্যবার গোয়ালিয়রে ধৃত হইলেন এবং স্ব-গৃহে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। ইহার মধ্যে তিনি কলিকাতায় জ্যেষ্ঠ হরিচরণের সঙ্গে থাকিয়া জেনারেল এসেম্বলি কলেজে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়বার ফিরিয়া বিদ্যাসাগর (তখন মেট্রোপলিটান) কলেজে ভর্তি হন। তখন দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই কলেজের অধ্যাপক। তিনি ক্লাশে অধ্যাপনাকালে ইটালীর উদ্ধারকর্তা ম্যাট্‌সিনি ও গ্যারিবল্ডীর আদর্শ যেরূপভাবে ব্যাখ্যা করিতেন তাহাতে যুব-ছাত্রগণ অনুপ্রাণিত হইয়া পড়িতেন। ভবানীচরণ এই সময়ই দেশোদ্ধারের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। এইরূপ প্রকাশ, তিনি সুরেন্দ্রনাথের তৎকালীন উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতাদি শুনিয়া সুপ্রসিদ্ধ আনন্দমোহন বসুর নিকট এই মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লেখনীর মারফত আসিবে না। ইহা লব্ধ হইবে অসির দ্বারা ("not through pen, but

through sword")। ইহা সত্ত্বেও উপরের ঘটনাবলীতে প্রমাণিত হয়, সুরেন্দ্রনাথের অধ্যাপনায় তিনি বিশেষ অনুপ্রেরণা লাভ করেন।

নূতন প্রেরণা পাইয়া ভবানীচরণের বহির্মুখী মন আর স্বগৃহের প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে চাহিল না। তারপর সত্য সত্যই তিনি যুদ্ধবিদ্যা শিখিবেন এইরূপ মনস্থ করিয়া গোয়ালিয়র যাত্রা করিলেন। কিন্তু সেখানে গিয়া যে পরিবেশের মধ্যে পড়িলেন তাহাতে তাঁহার আর সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন ঘটিয়া উঠিল না। তিনি তথাকার এক সর্দারের পুত্রের গৃহশিক্ষক হইলেন। অল্পদিন পরে তাঁহার কাজ ছাড়িয়া তিনি নিজে একটি স্কুল স্থাপন করেন। অতঃপর স্বদেশে ফিরিয়া প্রথমে বর্ধমানের মেমারী স্কুলে এবং পরে কলিকাতায় ফ্রি চার্চ স্কুলে শিক্ষকতা-কর্মে ব্রতী হন। ভবানীচরণের জীবনের গতি অন্যদিকে ফিরিল।

৩

তখন কেশবচন্দ্র সেন সকল ধর্মের সার লইয়া নববিধান সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পরমহংস রামকৃষ্ণের সাধনা এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের কর্মপ্রয়াস সেযুগে নব্য শিক্ষিত যুবমনে এক নূতন ভাবের সঞ্চার করিয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ দত্ত, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ যুবকবৃন্দ এই নূতন ভাবাদর্শের মধ্যে নিজ নিজ জীবন-পথের সন্ধান পাইলেন। নরেন্দ্রনাথ স্বামী বিবেকানন্দ নামে আজ সর্বত্র পরিচিত। তাঁহারই সতীর্থ ভবানীচরণ কেশবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন। তবে তাঁহাতেও যে পরমহংসদেবের প্রভাব সবিশেষ পড়িয়াছিল, একটু পরেই তাঁহার নিজের কথায় তাহা জানিতে পারিব। কেশবচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেনের গৃহে কয়েকজন যুবক ১৮৮৫ সনের জুলাই মাস হইতে সম্মিলিত হইয়া আত্মোন্নতি ও দেশোন্নতিমূলক আলোচনায় লিপ্ত হন। তাঁহারা

ইতিপূর্বেই ১৮৮৩ সনে একটি বিতর্ক সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রথমে তাঁহারা একখানি হাতে-লেখা কাগজ বাহির করেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নন্দলাল সেনের সম্পাদনায় 'ইয়ং ম্যান' নামে একখানি ইংরেজী পত্রিকাও প্রকাশিত হইল। কেশবচন্দ্রের সর্বধর্মের মিলন-প্রয়াস যুবকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। ভবানীচরণের চেষ্টা-উদ্যোগে তাঁহার প্রিয় ছাত্র কার্তিকচন্দ্র নানের গৃহে ১৮৮৬ সনে উক্ত আদর্শে "Concord Club" প্রতিষ্ঠিত হইল। অধ্যয়ন ও সমাজ-সেবা এই দুইটিই ইহার প্রধান কাজ। তখনকার দিনের ইংরেজ বাঙ্গালী বহু গণ্যমান্য লোককে ইহার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। স্যার উইলিয়ম হাণ্টার ইহার সভাপতি ছিলেন। ভবানীচরণের সহকর্মী বন্ধু নন্দলাল সেন হইলেন ইহার সম্পাদক। ক্লাবের মুখপত্র The Concord পত্রিকার সম্পাদক হন ভবানীচরণের পিতৃব্য কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। ভবানীচরণ অন্তরালে থাকিয়া কি ক্লাব পরিচালনা, কি পত্রিকা সম্পাদন সকল কাজেই কায়মনে যোগ দিয়াছিলেন।

ভবানীচরণ ১৮৮১ সনেই কেশবচন্দ্রের সংস্পর্শে আসেন। তাঁহার নববিধানের বাণী তাঁহার হৃদয় স্পর্শ না করিয়া পারিল না। কেশব ও তাঁহার সহকর্মীগণ হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ শাস্ত্র মন্থন করিয়া তৎসমুদয়ের ভিতর হইতে সার সংগ্রহে তখন রত। ইহার খৃষ্টান ভাগ অর্থাৎ বাইবেলের ভিত্তিতে খৃষ্টতত্ত্ব আলোচনায় ভবানীচরণের মন স্বতঃই উন্মুখ হইল। একদিকে কেশবচন্দ্রের খৃষ্টপ্রীতি ও খৃষ্টভজনা এবং অন্যদিকে পিতৃব্য কালীচরণের খৃষ্টধর্মে দীক্ষা তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া থাকিবে। কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পর হইতেই তিনি নববিধানের দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইলেন। কেশবচন্দ্রের আবাল্য-সুহৃদ ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার খৃষ্টতত্ত্ব চর্চায় জীবন সঁপিয়া দেন। ভবানীচরণ তাঁহার ভিতরে নিজ মনোমত মানুষটিকে যেন খুঁজিয়া পাইলেন। কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পর

নববিধান সমাজ পরিচালনায় প্রতাপচন্দ্রের দাবী যখন অগ্রগণ্য হইতেছিল তখন ভবানীচরণ তাঁহার দিকে আরও বেশী করিয়া আকৃষ্ট হইলেন। প্রতাপচন্দ্রের The Interpreter কাগজে তিনি নিয়মিতভাবে লিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি ১৮৮৭ সনের ৬ই জানুয়ারী আনুষ্ঠানিকভাবে নববিধান ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরে নানা বিষয়ে মতানৈক্য ঘটিলেও উভয়ের সৌহার্দ্য বরাবর অক্ষুণ্ণ ছিল।

ভবানীচরণ যখন কেশব সেনের সংস্পর্শে আসেন তাহার বহু পূর্ব হইতেই রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এবং কেশবপন্থিগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মে। কাজেই যে সকল নব্য-শিক্ষিত যুবক কেশবের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও কখনও তাঁহার সঙ্গে, কখনও বা একাকী পরমহংসদেবের নিকট গমন করিয়া তাঁহার মুখনিঃসৃত বাণী শ্রবণ করিতেন। ভবানীচরণও এইরূপ তাঁহার নিকট গমন করিতেন এবং তাঁহার উপর এই মহাসাধকের প্রীতিবারি বর্ষিত হইত। ভবানীচরণ পরবর্তীকালে তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

রামকৃষ্ণ কে, তিনি কি জন্য পৃথিবীতে আগমন করিয়াছিলেন? এই নীচাশয়ের সহিত ঐ মহামানুষের বিশেষ পরিচয় ছিল। পরিচয়ের কথায় একজন কবির উক্তি মনে উদয় হইতেছে। পরিচয়ের গর্ব করিও না—যে কীট সে কীট—যদিও সে রাজমহিষীর কেশগুচ্ছে বাস করে। ভগবান রামকৃষ্ণও সাধনাসিদ্ধ মহাপুরুষ। এরূপ সাধক ও সিদ্ধি বহুকাল অবধি পুণ্যভূমি ভারতে দৃষ্ট হয় নাই। তাঁহাকে লাভ করিয়া ভারত ধন্য হইয়াছে—বঙ্গদেশ পবিত্র হইয়াছে। তাঁহার কামিনীকাঞ্চনে বিরাগের কথা স্মরণ করিলে প্রাণ-মন উদাস হইয়া যায়। তাঁহার অদ্বৈত-সমাধি ভাবিলে সকল ভেদ-বিরোধ বিস্মৃত হইতে হয়। তাঁহার ভক্তিময় হুঙ্কার-মুখরিত নর্তন দৃশ্য চিত্তপটে উদিত হইলে পাপতনুও পুলক রোমাঞ্চে কদম্বাকৃতি ধারণ করে। তাঁহার পুণ্য সংস্পর্শে আমি ধন্য হইয়াছি।

তাঁহার শ্রীচরণযুগল আমার পাপ অঙ্গে তিনি অর্পণ করিয়াছিলেন—আমার গণ্ডদেশে করকমল সঞ্চালন করিয়া এই হতভাগ্যকে আদর করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন ও উপদেশ, বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, তিনি কোন নূতন যুগধর্ম প্রচার করিতে আসেন নাই। যে ব্রাহ্মীন-স্থিতির কথা গীতাতে বর্ণিত আছে—যে অহৈতুকী ভক্তিতত্ত্ব ভাগবতে গীত হইয়াছে, তাহাই তিনি জীবনে সিদ্ধ করিয়া পাপ পৃথিবীকে দেখাইতে আসিয়াছিলেন।"—"উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব"—প্রবোধচন্দ্র সিংহ, পৃ, ২২-৩।

হীরানন্দ নামে জনৈক সিন্ধুদেশবাসী কেশবচন্দ্র তথা নববিধানের বিশেষ অনুরক্ত হন। কলিকাতায় অধ্যয়নকালে তিনি ভবানীচরণ ও অন্যান্য কেশবপন্থীদের সংস্পর্শে আসেন। সিন্ধুর হায়দরাবাদে তাঁহার জন্ম। তিনি স্বস্থানে ফিরিয়া গিয়া একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিতে মনস্থ করেন। তাঁহারই আহ্বানে ভবানীচরণ এবং নন্দলাল ১৮৮৮ সালে হায়দরাবাদে যান। এই তিনজন মিলিয়া ঐ সনের ২৮শে অক্টোবর মাত্র ছয়জন ছাত্র লইয়া ইউনিয়ন একাডেমি নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করিলেন। ভবানীচরণ সংস্কৃত পড়াইবার ভার গ্রহণ করেন। ছাত্রদের খেলা-ধূলা শরীরচর্চারও বিশেষ ব্যবস্থা হইল। ভবানীচরণ ইহারও ভার লইলেন। অধ্যাপনা-গুণে এবং সহৃদয় ও অমায়িক ব্যবহারে ছাত্রেরা শীঘ্রই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। এই সময়ে তাঁহার পিতা মুলতানে কর্মে লিপ্ত ছিলেন। সেখানে রোগাক্রান্ত হইয়া তিনি মারা যান। ভবানীচরণ তাঁহার অসুখের সংবাদ শুনিয়া সেখানে গমন করিয়া সাধ্যমত তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করেন। পিতার দেহত্যাগের পর তিনি হায়দরাবাদে ফিরিয়া আসিলেন।

ইউনিয়ন একাডেমিতে শিক্ষকতাকালে ভবানীচরণ খ্রীষ্টতত্ত্বের আলোচনায় অভিনিবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার বন্ধুরা তাঁহার খ্রীষ্ট-প্রীতি

দেখিয়া অনেকেই সন্দেহ করিয়াছিলেন যে, কালে তিনি খ্রীষ্টান হইবেন। বন্ধুদের আশঙ্কা কার্যে পরিণত হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। কেশবপন্থী ব্রাহ্মগণ খ্রীষ্টান উৎসবগুলিও পালন করিতেন। ভবানীচরণ যে ইহা যথারীতি পালন করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য কি। তিনি ১৮৮৯ সনের বড়দিনে যীশুখ্রীষ্ট সম্বন্ধে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিলেন। অতি দ্রুত তাঁহার ভাব পরিবর্তন লক্ষিত হইল। পাছে খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করিলে বিদ্যালয়ের কোনরূপ ক্ষতি হয়, সেইজন্য তিনি ১৮৯০ সনের মে মাসে শিক্ষকের পদ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাসা ভাড়া করিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করিলেন। সেখানে রীতিমত খ্রীষ্টতত্ত্ব আলোচনার আয়োজন হইল। লেখরাজ, খেমচাঁদ, রেবাচাঁদ প্রমুখ কয়েকজন সিন্ধী যুবক তাঁহার শিক্ষায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শেষোক্ত রেবাচাঁদ দীর্ঘকাল তাঁহার সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া নানা কার্যে তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন। ইনিই পরে স্বামী অণিমানন্দ নামে পরিচিত হইয়াছেন।

ভবানীচরণ খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের সঙ্কল্পের কথা প্রকাশ করিলেও বস্তুতঃ ইহাতে দীক্ষা লইতে তাঁহার কয়েকমাস বিলম্ব হয়। ইতিমধ্যে ১৮৯০ সনের আগষ্ট হইতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত The Harmony নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করিয়া খ্রীষ্টতত্ত্বের আলোচনায় এবং এই সম্পর্কে স্বীয় মতবাদ প্রচারে মনঃসংযোগ করিলেন। কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে ভবানীচরণ কিরূপ উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন, এই সকল আলোচনা হইতে তাহা সবিশেষ প্রকাশ পায়। তিনি এক স্থানে বলেন যে, বর্তমান ভারতে কেশবচন্দ্রই সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ("Keshab must be the greatest man that modern India has produced.") পত্রিকাখানির প্রথম সংখ্যাতেই তিনি লেখেন—

"Our idea of reconciling Hinduism and Christianity is the direct fruit of the inspiration of that

great man, the man of God, Keshava Chandra Sen··· we believe that God raised up Keshava Chandra Sen to preach···harmony of all religions in spirit and truth. We believe also that it is our humble mission to preach and establish the principle of unity of all religions as laid down by Keshava."

কেশবচন্দ্র হিন্দু ধর্ম ও খ্রীষ্ট ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়া বিধাতৃ-নির্দিষ্ট কাজই করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ভবানীচরণের মতে এই প্রয়াসের স্থায়িত্ব লাভ ঘটিবে তখনই যখন আমরা যীশুখ্রীষ্টকে একমাত্র পরিত্রাতা বলিয়া গণ্য করিতে শিখিব। আর ইহার মধ্যেই কেশব-প্রবর্তিত প্রচেষ্টার পরিণতি লাভ ঘটিবে ("and thus fulfil the glorious mission of Keshava Chandra Sen")

(*The Blade*— Animananda, p,p. 38-9.)

ভবানীচরণ এইরূপ আলোচনায় কয়েকমাস লিপ্ত থাকিয়া শেষে কর্মস্থল হায়দরাবাদেই ১৮১৯, ২৬শে ফেব্রুয়ারী প্রোটেষ্টাণ্ট মতে খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হইলেন। সেখানকার সি, এম, এস স্কুলে শিক্ষকতা গ্রহণ করিয়া নিজের এবং যুবক বন্ধুদের ভরণ-পোষণের কথঞ্চিৎ ব্যবস্থা করিলেন। Sindh Times নামক একখানি সংবাদপত্র পরিচালনার ভারও লইলেন। কিন্তু খ্রীষ্টান ধর্মের এই শাখা তাঁহার মনের ক্ষুধা মিটাইতে পারিল না। তিনি এই বৎসরই ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে করাচীতে গিয়া রোম্যান ক্যাথলিক শাখায় দীক্ষিত হইলেন। তাঁহার অনুগামী সিন্ধী যুবকগণও একে একে খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

ইহার ফলে হায়দরাবাদে এবং করাচীতে তখন ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত হইল। স্থানীয় ব্রাহ্ম-সমাজ খৃষ্টানের বিরোধী হইলেন। ইহা দ্বারা কোনও কার্যকর পন্থা অবলম্বনের উপায় ছিল না। শিখদের গুরুদ্বার প্রতিষ্ঠিত হইল। স্বামী দয়ানন্দ প্রতিষ্ঠিত আর্য-সমাজ খৃষ্টানের

গতিরোধকল্পে এখানে শাখা-সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। এ্যানি বেসান্টের 'থিওসফি'র তরঙ্গও করাচীতে আঘাত হানিতে লাগিল। এইরূপে ভবানীচরণের খৃষ্টধর্ম গ্রহণে সমগ্র সিন্ধুদেশে জোর ধর্মান্দোলন আরম্ভ হইল।

৫

রোম্যান ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের পর ভবানীচরণ করাচীকেই তাঁহার প্রধান কর্মক্ষেত্র করিয়া লইলেন। এখানে তিনি একাদিক্রমে আট বৎসরকাল বসবাস করেন। অতঃপর তিনি ক্যাথলিক খৃষ্টধর্ম প্রচারে ঐকান্তিকভাবে আত্মনিয়োগ করিলেন। অধ্যয়ন ও আরাধনা এই দুইটি তাঁহার প্রধান কর্ম হইল। তিনি অন্য দশজনের মত হইলে অনায়াসে একটি পাদ্রীর পদ লইয়া স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করিতে পারিতেন। কিন্তু জীবনের সহজ পথ তাঁহার কাম্য ছিল না। এ ক্ষেত্রেও স্বকীয়তা তিনি পূর্ণ মাত্রায় বজায় রাখিয়া চলিলেন। তিনি দেখিলেন, ভারতবর্ষে ক্যাথলিক ধর্মের প্রচার করিতে হইলে ভারতীয় রীতি-পদ্ধতিতে প্রচারকদের জীবন গঠন করা একান্ত প্রয়োজন। এইজন্য তিনি স্বয়ং ১৮৯৪ সনে সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বন করিলেন। তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রমের নাম হইল ব্রহ্মবন্ধু (পরে, ব্রহ্মবান্ধব) উপাধ্যায়। ভারতবর্ষে বিভিন্ন অঞ্চলে মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া এই সন্ন্যাসী দল সেখানে অবস্থান করিবেন এবং অধ্যয়ন ও তপস্যায় রত থাকিয়া ধর্মপ্রচারকল্পে নিজেদের প্রস্তুত করিয়া তুলিবেন, এই উদ্দেশ্যের পথ-প্রদর্শকরূপেই তিনি সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মবান্ধব ১৮৯৪ সনের জানুয়ারী মাস হইতে Sophia (wisdom = জ্ঞান) নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। ১৮৯৯ সনের

মার্চ মাস পর্যন্ত পত্রিকাখানি চলিয়াছিল। এখানি ছিল মূলতঃ ধর্ম-বিষয়ক পত্রিকা, তবে সামাজিক ও নৈতিক বিষয়ের আলোচনা ও প্রবন্ধ ইহাতে বাহির হইত। রাজনীতি-বিষয়ক আলোচনা বর্জিত হইয়াছিল। ব্রহ্মবান্ধব পত্রিকায় আর্য-সমাজ ও 'থিওসফি'র বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন। তাঁহার মূল উদ্দেশ্য সন্ন্যাসীদল-গঠন ও মঠ স্থাপন সম্বন্ধেও তিনি ইহাতে আলোচনা করিতেন। তিনি করাচী বাদে আজমীর, বোম্বাই, ত্রিচিনপল্লী প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়া ক্যাথলিক ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। এ সকল বক্তৃতায় তাঁহার মূল উদ্দেশ্যও ব্যক্ত করিতেন। ক্রমে তাঁহার এই বিশ্বাস হয় যে, গ্রীক-দর্শনের ভিত্তিতে খৃষ্টধর্ম ব্যাখ্যাত হওয়ায় ইউরোপে উহা প্রচারিত হওয়া যেরূপ সম্ভব হইয়াছে, ভারতবর্ষেও বেদান্ত-দর্শনের ভিত্তিতেই ইহার বহুল প্রচার সম্ভব। তিনি সংস্কৃত-সাহিত্যচর্চায় পূর্বেই লিপ্ত হইয়াছিলেন। হিন্দু দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনায়ও অভিনিবিষ্ট হইলেন। ক্রমে তাঁহার এই বিশ্বাস দৃঢ় হইল এবং এই মর্মে বক্তৃতা দিতে ও লেখনী পরিচালনা করিতে শুরু করিলেন। ব্রহ্মবান্ধব ১৮৯৭ সনের শেষে কলিকাতায় আগমন করেন এবং বেদান্ত, কর্ম ও ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে তিনটি বক্তৃতা দেন। হিন্দু দর্শন-শাস্ত্রে তাঁহার জ্ঞান কত গভীর, এই সকল বক্তৃতা হইতে তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া গেল।

ব্রহ্মবান্ধব ক্যাথলিকদের দেশীয় ভাষায় নাম দিয়াছিলেন 'কাস্থলিক' অর্থাৎ সর্ব দেশ ও কালব্যাপী। এই একটি বিষয় হইতেই ক্যাথলিক ধর্মের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরক্তির পরিচয় মিলে। কিন্তু ইহার উন্নতি ও প্রসারকল্পে সন্ন্যাসী-দল-গঠন, মঠ স্থাপন, হিন্দু দর্শনের ভিত্তিতে খ্রীষ্টতত্ত্ব ব্যাখ্যান প্রভৃতি যে-সব উপায় তিনি অবলম্বন করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা এদেশীয় ক্যাথলিক কর্তৃপক্ষের মনঃপূত হয় নাই। তিনি ইতিমধ্যেই ইহার কোন কোনটি কার্যে পরিণত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন।

ইহাও তাঁহারা সন্দেহের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিলেন। কর্তৃপক্ষের সহায়তা ব্যতিরেকে এ সকল কার্য অসম্ভব। কাজেই ব্রহ্মবান্ধবকে এ সমুদয় প্রচেষ্টা একে একে পরিত্যাগ করিতে হইল। তিনি ১৯০০ সনে করাচী চিরতরে ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন। তাঁহার সঙ্গী হইলেন রেবাচাঁদ।

ব্রহ্মবান্ধব বসিয়া থাকিবার লোক ছিলেন না। তিনি কলিকাতায় আসিয়া পুরাতন বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হইয়া পুনরায় কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ছাত্র-বন্ধু কার্তিকচন্দ্র নানের বেথুন রো ভবন—যেখানে পূর্বে "Concord Club" প্রতিষ্ঠিত ছিল, ব্রহ্মবান্ধবের কর্মক্ষেত্র হইল। Sophia উঠিয়া গেলে ১৯০০ সনের ১৬ই জুন এখান হইতে Weekly Sophia নামে একখানি সাপ্তাহিক বাহির করিলেন। ইহার সম্পাদনার ভার লইলেন ব্রহ্মবান্ধব স্বয়ং। ইহা এখন আর নিছক খ্রীষ্টধর্মবিষয়ক পত্রিকা রহিল না। বেদান্ত সম্বন্ধেও ব্রহ্মবান্ধবের মত ক্রমশঃ বদলাইতেছিল। তিনি ইহার মুখবন্ধে লেখেন,—

"Our object is to represent faithfully, in a popular way the different systems of Religion, especially Hinduism in its Vedantic aspect and the religion of Christ."

অর্থাৎ, সকল ধর্ম সম্বন্ধেই ইহাতে সহজ-ভাবে আলোচনা করা হইবে, তবে বেদান্ত ও খ্রীষ্টতত্ত্বের আলোচনার উপরই বিশেষ জোর দেওয়া হইবে। ইহা আবার একেবারে ধর্মবিষয়ক পত্রিকা নহে। রাজনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য সকলই ইহার আলোচনার অঙ্গীভূত হইল। পত্রিকাখানির ধর্ম ও রাজনীতিবিষয়ক কঠোর ও উগ্র মতামত ক্যাথলিক কর্তৃপক্ষ অধিক দিন সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহারা ক্যাথলিক সমাজে কাগজখানির প্রচার বন্ধ করিয়া দিলেন। ১৯০০, ৮ই ডিসেম্বর ইহা উঠিয়া গেল।

স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে এবারেও তিনি বাধা পাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার উন্নত শিরকে অবনমিত করিতে পারিল না। ইহার পর কার্তিক নানের গৃহকে কেন্দ্র করিয়া দুই দিকে তাঁহার কার্য শুরু হইল। প্রারম্ভিক আয়োজনাদির পর ১৯০১ সনের ৩১শে জানুয়ারী তাঁহার ও তদীয় বন্ধু নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের যুগ্ম সম্পাদনায় Twentieth Century নামে একখানি মাসিক পত্র বাহির হইল। ইহাতে রমেশচন্দ্র দত্ত, মোহিতচন্দ্র সেন, ভিন্টারনিজ প্রমুখ খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের রচনা স্থান পাইত। ইহার জুলাই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের "নৈবেদ্য"র উপরে ব্রহ্মবান্ধবের একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ বাহির হয়। ক্যাথলিক কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এবারেও এড়াইল না। এই মাসিকখানি 'সাপ্তাহিক সোফিয়া'রই একটি অভিনব সংস্করণ—এই ওজুহাতে ইহার প্রচারও ক্যাথলিক সমাজে নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন। যুক্তি ও ন্যায় ব্রহ্মবান্ধবের পক্ষে থাকিলেও তিনি ক্যাথলিক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করা সমীচীন বোধ করেন নাই, তাই কাগজখানি তুলিয়া দিলেন। ইহার পরই তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কর্ম ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

৬

শিক্ষকতা এবং সংবাদপত্র সেবা তথা সাহিত্য ও দর্শন চর্চা এই দুইটি বিষয়ে ব্রহ্মবান্ধব ইতিমধ্যেই বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। হিন্দু দর্শন, বিশেষতঃ ইহার বেদান্তভাগ চর্চা দ্বারা তিনি ক্রমে ইহার অনুবর্তী হইয়া পড়িলেন, রোম্যান ক্যাথলিক ধর্মের ভিত্তিমূলে বেদান্ত দর্শনকে স্থাপন করিয়া ইহার প্রচারে পূর্বে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, এখন হইতে বেদান্তের মধ্যেই হিন্দু জাতির উদ্ধারের উপায় খুঁজিয়া পাইলেন। রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় ১৩০৮ সালের বৈশাখ মাস হইতে 'বঙ্গদর্শন' (নবপর্যায়) প্রকাশিত হইতে থাকে। প্রথম সংখ্যাতেই তিনি "হিন্দুর

একনিষ্ঠতা” সম্পর্কে একটি দার্শনিক প্রবন্ধ লেখেন। হিন্দুগণ যে বহুর মধ্যে একের—একমেবাদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দের বিকাশ দেখেন, এই প্রবন্ধটিতে তাহাই ব্যাখ্যাত হইল। তিনি পর পর আরও কয়েকটি প্রবন্ধে হিন্দুধর্ম তথা দর্শন সম্বন্ধে স্বীয় মতামত জ্ঞাপন করিলেন। হিন্দু জাতির মূল ভিত্তি যে 'বর্ণাশ্রম ধর্ম' উক্ত বৎসরের ফাল্গুন সংখ্যায় ব্রহ্মবান্ধব তাহা সবিশেষে যুক্তিপ্রমাণ সহযোগে বর্ণনা করেন। ভারতক্ষেত্রে ধর্মসমন্বয় সম্বন্ধেও যে একটি মতবাদ চলিতেছিল এবং একদা তিনি যাহার সমর্থক ছিলেন, একটি প্রবন্ধে (“তিন শত্রু”—ঐ, শ্রাবণ ১৩০৮) তাহার অসারতা প্রতিপাদন করিয়া লেখেন যে, “দুর্গা-আল্লা”, “দুর্গা-আল্লা” বলিয়া চীৎকার করিলেই দুইটি বিভিন্ন ধর্মের মিলন হইবে না। স্বধর্মে দৃঢ়ব্রত হইলেই জ্ঞানকাণ্ডের উচ্চতম মার্গে সকলের মধ্যে মিলন সংঘটিত হইতে পারে।

সাহিত্যালোচনা-সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্রহ্মবান্ধবের প্রথম পরিচয় হইয়া থাকিবে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই এই পরিচয় উদ্দেশ্য-সাম্য হেতু বন্ধুত্বে পরিণত হয়। কার্তিকচন্দ্র নানের ভবনে ব্রহ্মবান্ধব তদীয় পুত্র এবং আরও পাঁচ ছয়জন ছাত্র লইয়া একটি আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। অল্পদিন পরে সিমলা ষ্ট্রীটের একটি ভাড়াটিয়া বাড়িতে ইহা উঠিয়া যায়। বিদ্যালয়ের কার্যে তাঁহার সিন্ধী বন্ধু রেবাচাঁদ তাঁহাকে সাহায্য করিতে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ কার্তিকচন্দ্রের ভবনে ব্রহ্মবান্ধবের সঙ্গে আলাপ করিতে আসিতেন। বোলপুর—শান্তিনিকেতন আশ্রমে একটি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপনের তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের কার্যে অভিজ্ঞ ব্রহ্মবান্ধবের সহায়তায় ১৩০৮ সালের ৭ই পৌষ (১৯০১, ২২শে ডিসেম্বর) আশ্রম-প্রতিষ্ঠা দিবসে তিনি এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার নাম দিলেন “ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়”। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং লিখিয়াছেন,—

"এই সময়েই আমি বোলপুর শান্তিনিকেতন আশ্রমে ব্রহ্মচর্যাশ্রম নামক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করি। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তখন আমার সহায় ছিলেন—তখন তাঁহার মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক উৎসাহের অঙ্কুর-মাত্রও কোনও দিন দেখি নাই—তিনি তখন একদিকে বেদান্ত অন্যদিকে রোম্যান ক্যাথলিক খৃষ্টান ধর্মের মধ্যে নিমগ্ন ছিলেন। কোনও কালেই বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা আমার না থাকাতে উপাধ্যায়ের সহায়তা আমার পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ হইয়াছিল।" (আত্মপরিচয়, পৃঃ ১২৬)

ব্রহ্মবান্ধব স্বীয় বিদ্যালয় লইয়া বোলপুরে গেলেন। সঙ্গে শিক্ষক রেবাচাঁদও গমন করেন। রেবাচাঁদ রোম্যান ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী। ব্রহ্মবান্ধব ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূলে থাকিলেও তিনি বেশীর ভাগ সময় কলিকাতায়ই অবস্থান করিতেন। রেবাচাঁদ বোলপুরে থাকিতেন। প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মচর্য আশ্রমের আদর্শে বিদ্যালয়টি স্থাপিত হইয়াছিল। প্রাতে শয্যাত্যাগ করিয়া ছেলেরা ঘর ঝাঁট দিত ; প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে পুষ্করিণীর জলে স্নান করিয়া পরিচ্ছন্ন বস্ত্র পরিধান করিত—ব্রাহ্মণ ছেলের সাদা রেশম, কায়স্থ ও বৈদ্য ছেলের লাল রেশম এবং বৈশ্য ছেলের হল্‌দে রেশমের পোশাক। এক একটি রং এক একটি জাতের নিশানা। তাহারা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র তরু তলে বসিয়া সংস্কৃতে প্রার্থনা করিত। প্রাতঃরাশের পর তাহাদের আধ ঘণ্টাকাল ভূমি কর্ষণ করিতে হইত। ইহার পর ৭টার সময় পাঠারম্ভ, ১০টায় পাঠ শেষ, এক ঘণ্টাকাল আমোদ-প্রমোদ, ১১-৩০ মধ্যাহ্ন ভোজন, ১২-৩০ পুনরায় স্কুল, ৪-৩০ ছুটি। ইহার পর খেলাধূলা ৬-৩০ পর্যন্ত সান্ধ্য উপাসনা, সঙ্গীত শিক্ষাদির পর নৈশ ভোজন, ৯টায় নিদ্রা—এই নিয়মে প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত সকল কার্য সমাধান করিতে হইত।

—*The Blade*, pp. 94-5.

রেবাচাঁদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিলে ব্রহ্মবান্ধব তাঁহাকে কলি-

কাতায় লইয়া আসেন (আগষ্ট ১৯০২) এবং এখানে পুনরায় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। উপাধ্যায় ইহার নাম দিলেন 'সারস্বত আয়তন'। করাচী হইতে কলিকাতায় আসিয়া ব্রহ্মবান্ধব দীনদুঃখী রোগার্তদের লইয়া একটি আতুরাশ্রমও স্থাপন করিয়াছিলেন। বোলপুরে বিদ্যালয় নিয়া গেলেও এই আশ্রমের কার্য পরিচালনার জন্য কলিকাতায় তাঁহাকে যাতায়াত করিতে হইত। এখন বিদ্যালয়ও কলিকাতায় স্থিত হইলে দুইটি কার্যই যাহাতে সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ হয়, তাহার আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহার মধ্যেই অন্য একটি বিষয়ে তাঁহার আহ্বান আসিল।

৭

স্বামী বিবেকান্দ ১৯০২ সনের ৪ঠা জুলাই ইহধাম ত্যাগ করেন। যে আসুরী শক্তি ভারতবাসীকে উচ্ছিন্ন করিতে উদ্যত, কেন্দ্রস্থলে গিয়া তাহাকে জয় করিতে পারিলে ভারতেরও মঙ্গল, জগতেরও মঙ্গল। বিবেকানন্দ এই বিশ্বাসে পাশ্চাত্যে, বিশেষ করিয়া বিলাতে বেদান্ত প্রচারের কথা বার বার বলিয়াছেন, তিনি আরম্ভও করিয়া দিয়াছিলেন। ব্রহ্মবান্ধব সেদিন বাহির হইতে কলিকাতা ফিরিতেছিলেন। হাওড়া স্টেশনে স্বামীজীর তিরোধানের কথা শ্রবণমাত্র সঙ্কল্প করিলেন, তিনিও বিলাতে গিয়া তাঁহার অসমাপ্ত কার্য সম্পূর্ণ করিবেন। ব্রহ্মবান্ধব একদা স্বামীজীর সতীর্থ ও সমভাবুক হইয়াও পরবর্তীকালে দুইজনে ধর্মসাধনে ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনিও ক্রমে বেদান্তের পক্ষপাতী হইয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ভারতের মুক্তির পক্ষে আসুরী শক্তির কেন্দ্রস্থলে গিয়া বেদান্ত প্রচার দ্বারা জয় করিতে পারিলে উভয়েরই মঙ্গল। ব্রহ্মবান্ধবও সন্ন্যাসী; একখানি কম্বল ও কমণ্ডলু মাত্র তাঁহার সম্বল। কোন মতে পাথেয় সংগ্রহ করিয়া মাদ্রাজ হইয়া বোম্বাই গমন-

পূর্বক ১৯০২ সনের ৫ই অক্টোবর ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। তিনি ইটালী হইয়া তথায় যান। রোমের চিত্রকলা তাঁহাকে একেবারে মুগ্ধ করে। ধর্মে তিনি তখনও রোম্যান ক্যাথলিক। যীশুক্রোড়ে ম্যাডোনার চিত্র তাঁহার প্রাণে এক নূতন অনুভূতির সঞ্চার করিল।

ইটালী হইতে ৪ঠা নবেম্বর তিনি লণ্ডনে উপনীত হন। কিন্তু সেখানে কালবিলম্ব না করিয়া একেবারে অক্সফোর্ড গমন করিলেন। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বৃটেনের বিদ্যাকেন্দ্র। তুইটিতে ছাত্র ও বিদ্বজ্জন সমক্ষে হিন্দুদর্শনের ব্যাখ্যা করাই ছিল তাঁহার আন্তরিক বাসনা। অক্সফোর্ডের নাম দিয়াছিলেন 'উক্ষপার' এবং কেম্ব্রিজের 'কামব্রজ'। একবস্ত্র কম্বলমাত্র সম্বল হিন্দু সন্ন্যাসী শীঘ্রই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। তিনি এক পরিবারে বাসের ব্যবস্থা করিয়া লইলেন। তখন সংস্কৃত সাহিত্যে বোর্ডের অধ্যাপক ছিলেন ম্যাক্‌ডোনেল সাহেব। তিনি ব্রহ্মবান্ধবের নামের সঙ্গে ইতিমধ্যেই পরিচিত ছিলেন। উপাধ্যায় প্রদত্ত প্রথম বক্তৃতায় তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে ব্রহ্মবান্ধব পর পর আরও তিনটি বক্তৃতা দেন। এই তিনটিতে সভাপতি হন বিখ্যাত দার্শনিক ডক্টর কেয়ার্ড। ইহারা পাশ্চাত্য দর্শনে সুপণ্ডিত, কিন্তু হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে ইঁহাদের ধারণা খুবই অস্পষ্ট। ম্যাক্সমুলার প্রমুখ প্রাচ্য বিদ্যাবিদ্‌গণের ব্যাখ্যা শ্রবণে হিন্দুদর্শনের উপর তাঁহাদের এতটুকুও শ্রদ্ধা বাড়ে নাই। ব্রহ্মবান্ধব এই সকল বক্তৃতায় হিন্দুদর্শন, ধর্মনীতি, সমাজ-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল কথা বলিলেন, তাহাতে তাঁহারা যেন এক নূতন জগতের সন্ধান পাইলেন। বিদ্যাবিক্রয় হিন্দু-রীতি নহে। তিনি শ্রোতাদের নিকট হইতে দর্শনী গ্রহণের ব্যবস্থা না করায় সাধারণ লোক আরও অভিভূত হইল।

ব্রহ্মবান্ধব এখান হইতে লণ্ডনে গিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চিন্তাধারা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। ইহার পর তিনি কেম্ব্রিজে গমন করেন।

এখানকার পণ্ডিতমণ্ডলী ও জনসাধারণের নিকট হইতে তিনি যেরূপ সাড়া পাইয়াছিলেন, অন্যত্র তেমনটি পান নাই। এখানে তিনি তিনটি বক্তৃতা দিলেন—(১) হিন্দুর নির্গুণ ব্রহ্ম, (২) হিন্দুর ধর্মনীতি ও (৩) হিন্দুর ভক্তিতত্ত্ব। বিখ্যাত দার্শনিক ডক্টর মেটাগগারস্ সভাপতি হইয়াছিলেন। এই সকল বক্তৃতায় সেখানে কিরূপ আলোড়ন উপস্থিত হয়, ব্রহ্মবান্ধবের নিজের কথায়ই বলি,—

"নিজের সুখ্যাতি করতে নেই ; বক্তৃতা তিনটি খুব জমেছিল। অনেক অধ্যাপক ও ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতার ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, অধ্যাপকেরা পরামর্শ করছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ্চাত্য দর্শনের সঙ্গে বেদান্তদর্শন শিক্ষা দেওয়া যাবে কি না। যদি সুপরামর্শ হয়, তা হোলেই মঙ্গল ; নহিলে আবার উঠে পড়ে লাগতে হবে। এক দিনের কর্ম নয়। একজনেরও কর্ম নয়। ইংরেজের ছেলেরা বেদান্ত পড়লে য়ুরোপেরও মঙ্গল ও ভারতের মঙ্গল। এ'রাই তো গিয়ে আমাদের অধ্যাপক ও হাকিম হন।"—"বিলাতপ্রবাসী সন্ন্যাসীর চিঠি" (৮), পৃঃ ৫৯, ৬০।

বেদান্ত দর্শন অধ্যাপনার ব্যবস্থা করার জন্য কেম্ব্রিজের অধ্যাপকগণ একটি কমিটি গঠন করিলেন এবং ব্রহ্মবান্ধব উপযুক্ত পরিমাণ অর্থসংগ্রহেরও ভার লইলেন। এই ব্যাপার তখন বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই বটে, কিন্তু পরবর্তীকালে ঐ স্থলে যে প্রাচ্য দর্শন আলোচনাদির ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা অনেকটাই ব্রহ্মবান্ধবের এই সময়কার বক্তৃতাদানের ফল বলা যাইতে পারে। ব্রহ্মবান্ধব কেম্ব্রিজে নারীদের নিকট হিন্দু নারীর অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধেও একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিলেন। এতদিন খৃষ্টান পাদ্রীরা হিন্দুনারীকূল সম্বন্ধে সেখানে যে মিথ্যা প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন এই এক বক্তৃতায়ই তাহার রহস্য প্রায় উদ্ঘাটিত হইল। ব্রহ্মবান্ধবের কথায় "এই বক্তৃতার পর কেম্ব্রিজ সহরে খুব একটা গোল হয়ে গেছে। আমার কলেজে বক্তৃতার দিন এক পাদরী আমাদের-দেশের

বিরুদ্ধে কি বলতে উঠেছিল, অমনি সভাপতি তাকে দুই ধমক দিলেন ; আর শ্রোতৃবর্গের হাততালির চোটে তাকে একেবারে দাড়িয়ে মাটি করে দিলে।"

ব্রহ্মবান্ধব বিলাতে কয়েক মাস অবস্থান করিয়া সেখানকার সমাজ সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, তাহাতে ভারতীয় বর্ণাশ্রম ধর্মের সারবত্তা তাঁহার নিকট বিশেষভাবেই প্রতিভাত হইল। অসম প্রতিযোগিতা ও শ্রেণী সঙ্ঘর্ষের হাত হইতে নিস্তার পাইতে হইলে হিন্দুর প্রাচীন সমাজব্যবস্থারই পুনরায় আশ্রয় লইতে হইবে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক "বিলাতযাত্রী সন্ন্যাসীর চিঠি"তে (১৩১৩) এই সকল জানিতে পারিবেন। কেম্ব্রিজে অবস্থানকালে Review of Reviews সম্পাদক ভারতবন্ধু উইলিয়ম ষ্টেডের সঙ্গেও ব্রহ্মবান্ধবের বিশেষ আলাপ হয়। তাঁহার সম্বন্ধে কৌতুককর কাহিনীও এই বইখানিতে আছে।

৮

ব্রহ্মবান্ধব ১৯০৩ সনের জুলাই মাসে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। বিলাত যাত্রার প্রাক্কালে তাঁহার বিদ্যালয় 'সারস্বত আয়তনে'র ছাত্রসংখ্যা ছিল মাত্র ৮ জন। এই সময় ইহা ৩০ জনে দাঁড়াইল। প্রাচীন আদর্শে এই বিদ্যালয়টি গঠিত ও পরিচালিত হইত। হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে কিশোর বয়স হইতেই যাহাতে হিন্দু রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, পূজা-পার্বণের প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক হয় সেইজন্য তিনি স্বয়ং রোম্যান ক্যাথলিক খৃষ্টান ও বেদান্তপন্থী হইয়াও নিজ আয়তনে সরস্বতী পূজার অনুষ্ঠান করিলেন (১৯০৪, ২২শে জানুয়ারী)। 'সারস্বত আয়তনে'র পরিচালনা ভার তাঁহার খৃষ্টান শিষ্য সিন্ধী রেবাচাঁদের উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি এই ব্যাপারের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইতে না পারিয়া এই সময় ব্রহ্মবান্ধবের সঙ্গ ত্যাগ করিলেন। ব্রহ্মবান্ধব কিন্তু

বিচলিত হইবার পাত্র নন। তিনি ইহার পর আয়তনের কার্যে পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী এবং তাঁহার বাঙ্গলা জীবনী-লেখক প্রবোধচন্দ্র সিংহকে নিয়োজিত করেন। বিদ্যালয়টি ১৯০৬ সনে শ্রীরামপুরে স্থানান্তরিত হয়। ব্রহ্মবান্ধব "সন্ধ্যা" পরিচালনা ও স্বদেশী আন্দোলনে একান্তভাবে লিপ্ত হইয়া পড়ায় ইহার প্রতি তেমন দৃষ্টি দিতে পারেন নাই। 'সারস্বত আয়তন' শ্রীরামপুরে স্থানান্তরিত হইবার অল্পকাল পরেই উঠিয়া যায়।

ব্রহ্মবান্ধবের সংগ্রামশীল মন কোথাও অন্যায় আচরণ বা মিথ্যা প্রচার দেখিলে তাহার একেবারে হেস্তনেস্ত করিতে উদ্যত হইত। ১৯০৪ সনে জে, এন, ফারকোহার নামক জনৈক খৃষ্টধর্ম প্রচারক "গীতা এণ্ড গসপেল" পুস্তকে শ্রীকৃষ্ণচরিতের উপর অযথা কালিমা লেপন করেন। ইহাতে ব্রহ্মবান্ধব আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি ১৯০৪ সনের ২৫শে জুলাই মেট্রোপলিটান (বর্তমান বিদ্যাসাগর) কলেজের অধ্যক্ষ এন, এন, ঘোষের সভাপতিত্বে "Personality of Sri Krishna" শীর্ষক একটি বক্তৃতা দিলেন। ইহাতে তিনি ফারকোহারের অযথা উক্তিগুলির এমন উত্তর দিলেন যে, তাঁহার পক্ষের লোক উপস্থিত থাকিলেও ইহার প্রতিবাদ করিতে ভরসা পাইলেন না। বাঙ্গলা ভাষায়ও তিনি "শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন শোভাবাজারে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের ভবনে। পূর্বস্থলী নিবাসী পণ্ডিত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন এ সভায় পৌরোহিত্য করেন। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ব্রহ্মবান্ধব ইংরাজী ও বাঙ্গলা ভাষায় এমন সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিলেন যে, এতকাল স্বার্থান্ধ সম্প্রদায়ের অপপ্রচারে ইহার উপর সাধারণ শিক্ষিত জনের মনে যে একটা বিরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা চিরতরে বিলুপ্ত হইল।

ব্রহ্মবান্ধব এই সময় বিখ্যাত ডন সোসাইটিতেও একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নানাভাবে

যুব-ছাত্রদের মনে স্বাদেশিকতার উন্মেষ সাধনে ব্রতী হন। ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ছিল তাঁহার সকল কর্মের মূল লক্ষ্য। এই সূত্রে তাঁহার সঙ্গে ব্রহ্মবান্ধবেরও ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ১৯০৪ সনে বিলাত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা এবং বিলাতে তিনি যে সকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহার চুম্বক ডন সোসাইটির সভ্যবৃন্দকে একটি ভাষণে শুনাইলেন। ডন সোসাইটির যুব সভ্যগণ এই বক্তৃতার দ্বারা কিরূপ অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার নিজস্ব ঢঙে তাহা এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন,—

"ঐ প্রথম দেখলাম। গেরুয়া-পরা লোক। পায়ে ছিল না জুতা। কাছাখোলা সাধুর চেহারা। গায়ে জামা নাই,—গেরুয়া চাদর। এই মূর্তিতে আমি এক নয়া দুনিয়ার খবর পেলাম। তখনও আমি বিবেকানন্দী দলের কোনো স্বামীজীকে দেখিনি। সতীশবাবু ফকির বটে, কিন্তু তাঁর কাপড়চোপড়ে সাধুয়ানি ছিল না। ব্রহ্মবান্ধবই আমার অভিজ্ঞতায় সর্বপ্রথম আধুনিক বাঙ্গালী সন্ন্যাসী। কাজেই আমি তাঁর হাবভাবে বিশেষ প্রভাবান্বিত হয়েছিলাম। মনে হয়েছিল—ব্রহ্মবান্ধব সতীশবাবুরই পরবর্তী ধাপ। অনুকরণ যোগ্যও বটে। তাঁর চোখের ও হাঁটার ভঙ্গী দেখে মনে হয়েছিল যে, লোকটা চব্বিশ ঘণ্টা দুনিয়াকে কলা দেখাচ্ছে। মানুষের মত মানুষ, এই রকম লোকই চাই।

"লেগেছিল চমৎকার। মাৎ হয়ে গিয়েছিলাম। তখন বয়স সতের বৎসর মাত্র (১৯০৪)। চতুর্থ বার্ষিকের ছাত্র। এই ধরণের কথা ডন সোসাইটির আবহাওয়ায় নতুন নয়। কিন্তু বলবার ঢঙটা নতুন। কাজেই মনে হয়েছিল যেন একটা দার্শনিক তাজমহলের মালিক হয়ে গেলাম।

"ব্রহ্মবান্ধবের এক বক্তৃতার জের চলেছিল বছর দশেক বলা যেতে পারে।" —"বিনয় সরকারের বৈঠকে", ১৯৪২। পৃঃ ২৮২—৩।

ব্রহ্মবান্ধব সম্বন্ধে বিনয়কুমারের আরও কোন কোন উক্তি পরে আমরা

পাইব। কিন্তু তাঁহার মধ্যে যে অগ্নি লুক্কায়িত ছিল, এতদিন আভাষে ইঙ্গিতে জানা গেলেও বাহিরে তাহা বড় একটা প্রকাশ পায় নাই। এই বৎসরেই তাহা প্রদীপ্ত হইবার সুযোগ পাইল।

৯

ইহা হইল ব্রহ্মবান্ধব কর্তৃক এক পয়সা মূল্যের বাঙ্গলা দৈনিক "সন্ধ্যা" প্রকাশ। এই বিষয় আলোচনার পূর্বে এই সময়কার অবস্থাও একটু বলা আবশ্যক। কংগ্রেস প্রায় বিংশতি বৎসর যাবৎ ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির জন্য কার্য করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু তাহার কর্মপন্থা অনেকেরই বিশেষ করিয়া চিন্তাশীল অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক ব্যক্তিদের মনঃপুত ছিল না। তাঁহারা নানাভাবে স্বদেশবাসীদের মধ্যে আত্মশক্তির উন্মেষ সাধনে তৎপর হইলেন। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের শিক্ষা এবং বঙ্কিমচন্দ্র প্রচারিত স্বদেশভক্তির আদর্শ নব্য সম্প্রদায়কে এই কার্যক্ষম উদ্বুদ্ধকরে নাই। অরবিন্দ ঘোষ, সরলা দেবী (পরে চৌধুরাণী), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিপিনচন্দ্র পাল, সিষ্টার নিবেদিতা, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় স্ব স্ব পন্থায় স্বদেশীয় দর্শন সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতি শিক্ষা-পদ্ধতি লইয়া আলোচনায়ই শুধু প্রবৃত্ত হইলেন না, তৎসমুদয় কর্মে রূপ দিতেও বদ্ধপরিকর হইলেন। বিপিনচন্দ্র পালের New India, রবীন্দ্রনাথের "বঙ্গদর্শন" (নবপর্যায়), নিবেদিতার রচনাবলী, সরলা দেবীর বীরাষ্টমী ব্রত এবং স্বদেশীয় শিল্প প্রচারের আয়োজন, সতীশচন্দ্রের ডন সোসাইটি ও "ডন" পত্রিকা এবং ব্রহ্মবান্ধবের স্বদেশে ও বিদেশে হিন্দু দর্শনমূলক বক্তৃতা বঙ্গীয় সমাজকে একটি নূতন যুগের সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত করিতেছিল। বঙ্গব্যবচ্ছেদের প্রস্তাব এই নবভাবাদর্শকে আরও দৃঢ়মূল করিয়া তুলিল এই সময় "সন্ধ্যার" আবির্ভাব এতটুকুও আকস্মিক ছিল না।

ব্রহ্মবান্ধব সন্ধ্যার অনুষ্ঠান পত্রে লিখিলেন,—

"দুঃসময় পড়িলে লোকে বলে, এই ত কলির সন্ধ্যা অর্থাৎ কালরাত্রির কেবলমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। অন্ধকার ঘুচিয়া গিয়া সুপ্রভাত হইতে এখনও অনেক বিলম্ব। কিন্তু কলির সন্ধ্যার একটি শাস্ত্রীয় অর্থ আছে। বারশত বৎসর ধরিয়া কলির এক একটি সন্ধ্যা। এরূপ চারটি সন্ধ্যা চলিয়া গিয়াছে। এখন পঞ্চম সন্ধ্যা।

"প্রথম সন্ধ্যায় শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভবসাগরে জীব ডুবিয়া না মরে তাই তিনি গীতারূপ ভেলা প্রদান করিয়াছিলেন। যাহারা উহার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহারা তুফান কাটাইয়া কূল পায়; আর যাহারা উহাকে অগ্রাহ্য করে, তাহারা হাবুডুবু খায়।

"দ্বিতীয় সন্ধ্যায় বৌদ্ধবিভ্রাট ঘটিয়াছিল। আশ্রমধর্ম ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় সমাজ অতিশয় বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল।

"তৃতীয় সন্ধ্যায় শঙ্করাচার্যের অভ্যুদয়। তিনি বৌদ্ধদিগের গর্ব খর্ব করিয়া হিন্দুধর্মের জয়পতাকা উড়াইয়াছিলেন।

"চতুর্থ সন্ধ্যায় ম্লেচ্ছাধিকার। এইবার ভারতকে একেবারে পাড়িয়া ফেলিয়াছে। অনাচার ও অত্যাচারে দেশ বাঁচিয়া থাকিয়াও যেন মরিয়া গিয়াছে।

"পঞ্চম সন্ধ্যায় বোধ হয় সুদশার পালা আসিতে পারে। কিন্তু পঞ্চমেরও দুই শত বৎসর চলিয়া গেল, তবু কোন সুলক্ষণ দেখা যাইতেছে না। অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। এখন উপায় কি? পুরাতন কথা ভাবিয়া দেখিলে উপায় কি, তাহা বোধ হয়, বুঝা যাইতে পারে। আমরা একটি লম্বা রশিতে বাঁধা আছি। যত দূরই যাই না কেন, যতই ঘুরপাক খাই না কেন, খোঁটা ছাড়িবার যো নাই। সেই বেদবেদান্ত, সেই ব্রাহ্মণ, সেই বর্ণধর্ম ছাড়া হিন্দু সন্তানের আর গতি নাই।

"কলির পঞ্চম সন্ধ্যায় আমরা সন্ধ্যা নামে যে এক দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করিবার মানস করিয়াছি, তাহার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে—

কেবল এই একমাত্র উপায় ভাল করিয়া বুঝান। রাজা ম্লেচ্ছ। উপ-জীবিকার জন্য, মানসম্ভ্রমের জন্য; ম্লেচ্ছ ভাষা, ম্লেচ্ছ বিদ্যা শিখিতে হইবে, ম্লেচ্ছ হাবভাব ধরিতে হইবে নাহলে উপায় নাই। এতে আর কি খাঁটি ধর্ম থাকে। সমস্যা শক্ত বটে, কিন্তু সিদ্ধান্তও আছে। রাজার সহিত সম্পর্ক রাখিতেই হইবে। রাজায় প্রজায় কিরূপ ব্যবহার হওয়া উচিত, সেই সম্বন্ধে রাজনৈতিক কথা সন্ধ্যা পত্রিকায় বিস্তর থাকিবে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির কার্যকলাপ ও দেশ বিদেশের বিবিধ সংবাদ লিখিত হইবে। বিদেশীয় কলকৌশল শিখিয়া কিরূপে ধনধান্যের বৃদ্ধি করিতে হয়, তাহার মন্ত্রণা থাকিবে। কিন্তু সকল কথার মাঝে সহজ কথায় বাঙ্গালীর প্রাণের কথা আমরা সদাই বলিব। যাহা শুন—যাহা শিখ—যাহা কর—হিন্দু থাকিও, বাঙ্গালী থাকিও। সখের জন্য সাহেবি ঢং নকল করিলে আসল ভেস্তে যাবে। কিন্তু বিদেশী বিদ্যা শিখিলে বা পেটের দায়ে ধর্মের ব্যাঘাত না করিয়া বহিরঙ্গ ব্যাপারের অল্প স্বল্প বদল করিলে ক্ষতি নাই। সকল অবস্থায় কায়মনোবাক্যে ব্রাহ্মণের শিষ্য হইয়া জাতি-মর্যাদা রক্ষা করিলে কোন দোষ স্পর্শ করিবে না। আমরা যতই নিজেকে ভুলি না কেন, আমাদের হৃদয়ে এক পুরাতন সুর যুগযুগান্তর ধরিয়া চলিতেছে।

"পূজা পর্ব, শিল্প সাহিত্য, সমাজনীতি, গৃহস্থালী ইত্যাদি সব কথাই বলা যাইবে, কিন্তু সমুদয়ের ভিতরে ঐ এক সুরের খেলা থাকিবে—বেদ, ব্রাহ্মণ ও বর্ণধর্ম। এল্‌তলা বেলতলা সেই বুড়ির পায়ের তলা। আমরা এই কথাটি বুঝিয়া একনিষ্ঠ হইতে পারি, নিশ্চয়ই ভগবানের কৃপা হইবে অন্ধকার ঘুচিবে। নাস্তি গতিরন্যথা।

"এই পত্রিকায় কোন নূতন কথা বলিবার স্পর্ধা আমরা রাখিব না। আমাদের অগ্রজদিগের নিকট যাহা শিখিয়াছি, তাহাই কেবল নূতন আকারে প্রকাশ করিব। তাঁহাদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করি।"

—"উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব" ৮১-৩

সন্ধ্যা ১৯০৪ সনের ২০শে নভেম্বর (?) প্রথম আবির্ভূত হইল। অনুষ্ঠানপত্রে প্রস্তাবিত উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্রহ্মবান্ধব ইহাতে লেখনী পরিচালন করিতে লাগিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ইহা বাহির হইত। বাঙ্গলার আকাশে বাতাসে আত্মশক্তি ও আত্মনির্ভরতার যে নূতন ভাবাদর্শ উত্থিত হইতেছিল, সন্ধ্যা নিজবক্ষে তাহা ধারণ করিয়া আসন্ন সংগ্রামের জন্য বাঙ্গালী জাতিকে প্রস্তুত করিতে লাগিয়া গেল।

১০

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদে সরকার কৃতসঙ্কল্প। বড়লাট লর্ড কার্জন জনমত স্বপক্ষে টানিবার জন্য পূর্ববঙ্গ পরিক্রমাও করিলেন। কলিকাতায় ও মফঃস্বলে জনচিত্ত এই প্রস্তাবে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। ১৯০৫ সনের ১৬ই অক্টোবর বাঙ্গলা দ্বিখণ্ডিত হইল। বাঙ্গালী ইহা বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করিতে পারিল না। ইহার পূর্বেই এই বিষয়ের প্রতিরোধকল্পে বিলাতী দ্রব্য বর্জনের প্রস্তাব কেহ কেহ করিয়াছিলেন। কলিকাতায় ১৯০৫, ৭ই আগষ্ট, খোলাখুলিভাবে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল। ব্রহ্মবান্ধব 'সন্ধ্যা'য় এই নূতন আন্দোলনকে ঐকান্তিকভাবে সমর্থন করিয়া দিনের পর দিন ইহার অনুকূলে স্বীয় মত ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতে বঙ্গদেশে যে বিপুলভাবে সরকার-প্রতিরোধ-কার্য উপস্থিত হয়, তাহাই এক কথায় স্বদেশী আন্দোলন বলিয়া অভিহিত। ইহার ইতিবৃত্ত নানাজনে নানাভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এখানে স্বদেশী আন্দোলনে ব্রহ্মবান্ধবের যোগাযোগের কথাই বিশেষ করিয়া বলিব। স্বদেশী ব্রত সার্থকভাবে উত্থাপন করার জন্য যে সব সলাপরামর্শ হয়, তাহার প্রত্যেকটিতেই ব্রহ্মবান্ধব যুক্ত ছিলেন। 'সন্ধ্যা' ব্যতিরেকে ব্রহ্মবান্ধব ১৯০৫ জুন হইতে ১৯০৬ জুন মাস পর্যন্ত একটি মেসেরও কর্মকর্তা

ছিলেন। এইখানে বঙ্গ-বিপ্লবের মূল বিষয়গুলি যথারীতি আলোচনা হইত। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার বলেন,—

"কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট ছিল ঠিকানা। একটা বড় বাড়ী। নাম ছিল তার রাজবাড়ী। ঢুকতে হত শিবনারায়ণ দাসের গলি দিয়ে। কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের উপর পূব দিকে ছিল মাঠ। তাকে লোকেরা বলতো 'পান্তের মাঠ'। মাঠের দক্ষিণেই মেট্রোপোলিটান কলেজের পেছনটা। আমরা থাকতাম দোতলায়।

"বঙ্গ-বিপ্লবের অনেক কিছু ঘটত এই বাড়ীর সামনের মাঠে। সবই আমরা ঘরে বসে দেখতাম। সভায় হাজির থাকার দরকার হতো না। তবে সভায় যা কিছু ঘটত, তার বেশ কিছু আমাদের বাড়ীরই ঘরগুলায় আর একতলায় আগে থেকে তৈরি হয়ে থাকত। কেননা, সতীশবাবু আর ব্রহ্মবান্ধব এই দুজনের শল্লা স্বদেশী আন্দোলনের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে হামেশা জরুরী হতো। প্রকারান্তরে বলা চলে যে, বঙ্গ-বিপ্লবের 'গ্রীণ-রুমে' বা সাজঘরেই রাধাকুমুদ, রবি আর সামাধ্যায়ীর সঙ্গে আমি ১৯০৫-এর গৌরবময় দিন, সপ্তাহ বা মাসগুলা কাটিয়েছি। তখন আমাদের আত্মিক অভিভাবক সতীশবাবু আর ব্রহ্মবান্ধব। ১৯০৬ সনের জুন পর্যন্ত এইভাবে কাটে।" ("বিনয় সরকারের বৈঠকে" ১৯৪২ পৃঃ ২৮৪-৫)।

ইহার পর ১৯৩, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে সন্ধ্যা অফিসই ব্রহ্মবান্ধবের আবাস স্থল হইল। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রমুখ সন্ধ্যার লেখকগণ তো এখানে সমবেত হইতেনই, ইহা ছাড়া বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দও সমাগত হইয়া বিভিন্ন কার্য সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শ করিতেন। ব্রহ্মবান্ধব ছিলেন স্বদেশী মন্ত্রের অন্যতম প্রধান উদ্গাতা। এই সময়কার প্রত্যেকটি ব্যাপারেই তিনি ছিলেন অগ্রণী, কোন কোনটির উদ্ভাবকও তিনি। আবার যুব বাঙ্গলার তিনি ছিলেন অবিসংবাদী নেতা। বিনয় সরকারের কথায়—

"ব্রহ্মবান্ধব একজন জবরদস্ত, স্বার্থত্যাগী ও নির্ভীক কর্মবীর। লোকটা ডান্‌পিটে, ত্যাঁদড় আর ভবঘুরে। যতগুলো গুণ আমার বিবেচনায় যুগ-প্রবর্তকের লক্ষণ সবগুলাই তাঁর ছিল। তাঁর সংস্পর্শে এসে যুবক বাঙলার অনেকে স্বদেশসেবার নানা কাজে মোতায়েন হতে পেরেছে। দেশের লোকে তাঁকে 'সন্ধ্যা' দৈনিকের সম্পাদক বলে জানে। বস্তুতঃ, ব্রহ্মবান্ধবের চিন্তাসম্পদে বাঙালীজাত ঐশ্বর্যশালী হয়েছে। ১৯০৫-এর পরবর্তী বঙ্গ-সমাজের বিভিন্ন আন্দোলনে ব্রহ্মবান্ধবের বিরাট ব্যক্তিত্ব জ্বল্ জ্বল্ করছে।"

(ঐ, পৃঃ ২৮৫—৬)

এই সকল বিষয় উল্লেখ করিবার পূর্বে "সন্ধ্যা" সম্পর্কে এখানে আরও কিছু বলা আবশ্যক। স্বদেশী মতকে জনসাধারণের মত করিয়া তুলিতে হইলে ইহার কথা তাহাদেরই ভাষায় বলা দরকার। বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যে ভাষায় কথা বলেন, তাহা উচ্চতন মার্গের হইলেও সাধারণের সহজবোধ্য নহে। ব্রহ্মবান্ধব "সন্ধ্যা"র ভাষাকে একেবারে বাংলার জনগণের বাচনভঙ্গীর অনুগ করিয়া লইলেন। তাঁহার এইরূপ ভাষা প্রয়োগে অনেকে অবাক হইল বটে, কিন্তু তিনি পল্লীগ্রামে পিতামহীর ক্রোড়ে মানুষ। পল্লীবাসীর সহজ বচনভঙ্গীর সঙ্গে আশৈশব তিনি পরিচিত ছিলেন। এইবারে নব নব ভাবধারা প্রকাশে তাহা সম্যক্ প্রযুক্ত হইতে লাগিল। তিনি ইংরেজকে 'ইংরেজ' বলিতেন না, বলিতেন 'ফিরিঙ্গি'। আমাদের দেশীয় নামগুলি যেমন ইংরেজরা বিকৃত উচ্চারণ করিত ও বিকৃতভাবে লিখিত, তিনিও ইংরেজী নামগুলি বিকৃত করিয়া লিখিতেন, যেমন কিংসফোর্ডকে লিখিতেন 'কিং ফর্দ্দ'। 'সন্ধ্যায়' তিনি কাহাকেও তোয়াক্কা করিয়া কথা বলিতেন না। গবর্ণমেণ্টের সমালোচনায় যেমন, দেশ-বিরোধী কি ভণ্ড স্বাদেশিকের সমালোচনাতেও তেমনি কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিতে ছাড়িতেন না। অসাড় জাতিকে জাগাইতে গিয়াও

তিনি তীব্র বাণ হানিতেন। 'সন্ধ্যা'র ভাষা তথা পাড়াগেঁয়ে বুলির কৈফিয়ৎস্বরূপ তিনি লিখিয়াছিলেন—

"দেশের রোগটা কিছু বিষম হইয়াছে, তাই মকরধ্বজেরও উপরে চটী খাওয়াইতে হইবে। এ সময় কি ভেল্‌সায় চলে? দেশে চারিদিকে তমোভাব—অসাড়তা। এখন হাত বুলাইলে চলিবে না—খোঁচা না দিলে সানাইবে না।......

"তমোভাব আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। রজোভাবের দ্বারা উহাকে নাড়িয়া-চাড়িয়া দূর করিয়া দিতে হইবে। আর রজোগুণটা স্বভাবতঃ কিছু কড়া। তাই যাঁহারা নরম প্রকৃতির লোক, তাঁহাদের ঐ কড়া মেজাজটা ভাল লাগে না। যে আফিম খাইয়া মরিতে বসিয়াছে, তাহাকে না চাব্‌কাইলে তাহার সংজ্ঞা থাকিবে না। তাই বলিয়া কি সেই আফিমখোরের আর চাব্‌কানো ভাল লাগে! রজোগুণের দ্বারা তমোভাব দূর হইলে সত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হইবে। তমঃতে সত্ত্ব বসে না, তাই রজঃ চাই! শেষে সত্ত্ব। সত্ত্বই বা শেষ কেন? তিন গুণের অতীত হওয়াই শেষ—নির্বাচন-মুক্তি।"

(উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, পৃঃ ৮৯)

১১

স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা হইতেই প্রগতিপন্থী নেতৃবৃন্দের মনে আর একটি প্রশ্নের উদয় হয়। ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্র কিরূপ হইবে? তাঁহারা এই প্রশ্নের সমাধান করিলেন এইরূপে—ব্রিটিশ সম্পর্কবিহীন স্বাধীনতাই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় আদর্শ। কে প্রথম এই উক্তি করেন, তাহা লইয়া মতভেদ আছে। কিন্তু ইহা তখন নব্য দলের মনে দৃঢ়বদ্ধ হইতে থাকে। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সন্ধ্যায় এই আদর্শের কথা ব্যক্ত করিয়া জাতিকে

সচেতন করিতে লাগিয়া যান। রাষ্ট্রীয় আদর্শ যখন এই প্রকার, তখন কর্মপন্থাও তদনুরূপ নির্ণীত হইতে বিলম্ব হইল না। এই নূতন ভাবাদর্শ প্রচারের জন্য বিপিনচন্দ্র পাল ১৯০৬ সনের ৬ই আগষ্ট 'বন্দেমাতরম্' নামে ইংরেজী পত্রিকা বাহির করিলেন। ইহার পর প্রায় দুই মাসকাল তিনি কলিকাতার বাহিরে ছিলেন। মূল প্রেস ইহা বেশী সংখ্যায় ছাপিতে অসমর্থ হইলে ব্রহ্মবান্ধব দুই মাস ধরিয়া কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে নিজ সারস্বত যন্ত্রে ছাপাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। বঙ্গে যে নব্য দল বা উগ্রপন্থীদের আবির্ভাব হয়, তাহাতে ব্রহ্মবান্ধবের কৃতিত্ব চিরস্মরণীয়।

স্বদেশী ব্রতের মূল কথা আত্মনির্ভর—আত্মশক্তির উন্মেষসাধন। ভাবমার্গে 'সন্ধ্যা'য় ইহার প্রকাশ, ব্রহ্মবান্ধব কর্মেও ইহাকে রূপ দিবার আয়োজনে রত হইলেন। বিলাতী দ্রব্য বর্জনে যেমন জনগণকে উদ্বুদ্ধ করিলেন তেমনি জাতির আশা-ভরসা যুবকগণকে বিজাতীয় শিক্ষার মোহমুক্ত হইতেও উপদেশ দিলেন। তিনি এই বিজাতীয় শিক্ষার পীঠস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম দিয়াছিলেন "গোলামখানা।" কিন্তু নেতিবাচক চিন্তা বা কার্যেই তাঁহার প্রচেষ্টা পরিসমাপ্ত হয় নাই। জাতীয় শিল্প উদ্ধার এবং জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনেও তাঁহার শক্তি নিয়োজিত হইল। নিজ সারস্বত আয়তনে প্রাচীন আদর্শে জাতীয় শিক্ষা প্রদানে তিনি কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই নিবিষ্ট ছিলেন। এখন এই প্রয়াস নিম্নতম হইতে উচ্চতম শিক্ষাব্যবস্থার একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার মধ্যে প্রসারিত হইল। বঙ্গের জাতীয় শিক্ষা পরিষদ বা National Council of Education যাঁহাদের চিন্তাপ্রসূত, তাঁহাদের সঙ্গে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের নামও শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করিতে হয়।

জনচিত্তকে জাতীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে সাধারণের মধ্যে নানারূপ উৎসব বা মেলারও অনুষ্ঠান করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে মহারাষ্ট্রে গণপতি উৎসব ও শিবাজী উৎসবের প্রতিষ্ঠা। বঙ্গেও ব্রহ্মবান্ধব

প্রমুখ নেতৃবৃন্দের ঐকান্তিক চেষ্টায় কলিকাতায় ১৯০৬ সনের জুন মাসে শিবাজী উৎসব উদ্‌যাপিত হইল। উৎসবমণ্ডপে যে ভবানী মূর্তি স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের পরিকল্পনা। কোন কোন সম্প্রদায় হইতে আপত্তি উঠিলেও তিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। এই উৎসব প্রধানতঃ নব্যদল কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইলেও প্রবীণ-নবীন সকলেই ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্র হইতে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক দুইজন সহকর্মীসহ এই উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া যোগদান করেন। "বন্দে মাতরম্‌" মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মভূমি কাঁঠালপাড়ায় তাঁহার জন্মোৎসব প্রতিপালনেও ব্রহ্মবান্ধব বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন। এইরূপে নূতন ভাবাদর্শকে বঙ্গবাসীর হৃদয়ে দৃঢ়রূপে গ্রথিত করিবার নানা উপায়ই তিনি অবলম্বন করিতে লাগিলেন। জাতীয় কংগ্রেস ও প্রাদেশিক সম্মেলনেও তিনি যথারীতি যোগ দিয়াছেন, কিন্তু সর্বত্রই নূতন ভাবাদর্শকে কর্মে রূপ দিবার প্রয়াসী ছিলেন; গতানুগতিক সহজ পথ তিনি সর্বদাই এড়াইয়া চলিতেন।

'করালী' নামে "সন্ধ্যা"র একখানি অর্ধসাপ্তাহিক সংস্করণ বাহির হইত। ইহাতে সন্ধ্যার প্রবন্ধগুলি পুনর্মুদ্রিত হইত। যাহারা 'সন্ধ্যা' নিয়মিত পড়িতে পাইত না, এখানি তাহাদেরই জন্য। 'সন্ধ্যা'মণ্ডলী কর্তৃক ১৯০৭ সনের ১০ই মার্চ 'স্বরাজ' নামে একখানি সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহার বারখানি সংখ্যা বাহির হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। "সন্ধ্যা" বা "করালী" দেখিবার সৌভাগ্য না হইলেও এই "স্বরাজ" পত্রিকার ২য় হইতে ১০ম সংখ্যা সম্প্রতি দেখিবার সুযোগ আমার হইয়াছে। স্থাপত্য, শিল্পকলা, বীর নারী ও নর, দাতা, সাধক, সন্ন্যাসী, তপস্বিনী প্রভৃতি যে সকল বিষয় আমাদের জাতীয় সম্পদ এবং নূতন ভাবাদর্শের দ্যোতক তৎসমুদয়ই ইহাতে স্থান পাইয়াছে। আমাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শের কাণ্ডথ কোন কোন সংখ্যায় বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে।

জাতির আত্মগৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে, জনগণের আত্মপ্রত্যয় ফিরাইয়া আনিতে ব্রহ্মবান্ধবের প্রয়াস অতুলনীয়।

১২

বাংলার আকাশ-বাতাস মথিত করিয়া স্বদেশী আন্দোলন বিপুলভাবে আরম্ভ হইলে গবর্ণমেণ্টেরও টনক নড়িল। তবে তাঁহারা মূল কারণ বিদূরিত না করিয়া অন্য উপায়ে ইহা প্রতিরোধে অগ্রসর হইলেন। হিন্দুমুসলমানের মধ্যে ভেদবুদ্ধি জাগ্রত করিতে পারিলে তাঁহাদের উদ্দেশ্য আশু সিদ্ধ হওয়া সম্ভব—এই ধারণাবশে উচ্চ কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক উভয় ক্ষেত্রেই এই ভেদ-বৈষম্য সৃষ্টি করিতে তৎপর হইয়া উঠিলেন। এই বৈষম্যের ভীষণ পরিণতি আজ আমরা খণ্ডিত ভারতের মধ্যে লক্ষ্য করি। সামাজিক ক্ষেত্রে তখনই উভয়ের মধ্যে ভয়ানক মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। পূর্ববঙ্গে, বিশেষ করিয়া কুমিল্লা ও ময়মনসিংহে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইল। বলা বাহুল্য ইহার পশ্চাতে কর্তৃপক্ষের উস্কানি পুরামাত্রায়ই ছিল।

স্বদেশী আন্দোলন প্রতিরোধের দ্বিতীয় উপায়ও সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হইল। আন্দোলন যে বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে অত দ্রুত প্রসারলাভ করিতে পারিয়াছিল, তাহার মূলে ছিল বাংলা সংবাদপত্রের অপরিসীম প্রয়াস। এই সংবাদপত্র দমনেই সরকারী রুদ্র-নীতির সূত্রপাত হইল। 'যুগান্তর', 'বন্দে মাতরম্' একে একে রাজদ্রোহ প্রচারের অপরাধে সরকার কর্তৃক অভিযুক্ত হইল। 'যুগান্তর' সম্পাদক শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (অধুনা ডক্টর) কারারুদ্ধ হইলেন। 'বন্দেমাতরম্'-এর সম্পাদক নির্ণয়ে বিচারালয় অসমর্থ হইলে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ রেহাই পাইলেন বটে, কিন্তু এ বিষয়ে ব্রিটিশের আদালতে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করায় বিপিনচন্দ্র পালের ছয় মাস জেল হইল। ইহার পরেই আসিল 'সন্ধ্যা'র উপর

আক্রমণ। ব্রহ্মবান্ধব গবর্ণমেণ্টের দমন-নীতির তীব্র প্রতিবাদ করিয়া 'সন্ধ্যা'য় কতকগুলি প্রবন্ধ লেখেন। "এখন ঠেকে গেছি প্রেমের দায়" (২৮ শ্রাবণ, ১৩১৪) "ছিদিসনের হুড়ুম হুড়ুম, ফিরিঙ্গীর আক্কেল গুড়ুম" (৩ ভাদ্র, ঐ), "বোচ্‌কা সকল নিয়ে যাবেন বৃন্দাবনে" (৬ ভাদ্র, ঐ) এইরূপ কতকগুলি প্রবন্ধে সরকার রাজবিদ্রোহের আভাস পাইয়া "সন্ধ্যা" আপিস তুইবার খানাতল্লাস করিলেন। কর্মকর্তা ও মুদ্রাকরসহ ব্রহ্মবান্ধব বিচারালয়ে রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হইলেন। ব্রহ্মবান্ধবের পক্ষে প্রথম দিকে কৌঁসুলী ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়। ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯০৭ তারিখে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ডের এজলাসে ব্রহ্মবান্ধবের বিচার আরম্ভ হইল। প্রথম দিনেই তিনি বিচারকের সম্মুখে এই বিবৃতি পাঠ করিলেন,—

"I accept the entire responsibility of the publication, management and conduct of the newspaper Sandhya and I say that I am the writer of the article, *Ekhan Thake Gachi Premer Dai* which appeared in the Sandhya of the 13th August 1907, being one of the articles forming the subject matter of this prosecution. But I do not take any part in this trial because I do not believe that in carrying out my humble share of the God-appointed mission of Swaraj. I am in any way accountable to the alien people who happen to rule over us and whose interest is and must necessarily be in the way of our true national development,"

ব্রহ্মবান্ধব "সন্ধ্যায়" পরিচালনা, সম্পাদনা ও লেখার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে লইয়া ঘোষণা করিলেন যে, তাহার কৃতকার্যের জন্য কোন বিদেশীর নিকট তিনি জবাবদিহি করিতে বাধ্য নন। তিনি এইরূপে

বিদেশীর প্রভুত্বকেই অস্বীকার করিলেন। ব্রহ্মবান্ধব সন্ন্যাসী, 'ফিরিঙ্গির' আদালতে গৈরিক বসন অপবিত্র হইবে বিবেচনায় তিনি উপবীতসহ সাধারণ বাঙ্গালীর পোশাক পরিয়া আদালতে গিয়াছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ইহার দুই মাস পূর্বে তিনি প্রায়শ্চিত্ত করেন।

ব্রহ্মবান্ধব হার্ণিয়া রোগে ভুগিতেছিলেন। প্রতি দিন দীর্ঘ সময় অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাঁহার এই ব্যাধি বৃদ্ধি পাইল। অবশেষে চিকিৎসকের পরামর্শে অস্ত্রোপচারের জন্য ক্যাম্বেল হাসপাতালে ভর্তি হইলেন। প্রসিদ্ধ সার্জন মৃগেন্দ্রনাথ মিত্র অস্ত্রোপচার করেন। ব্রহ্মবান্ধব ক্রমশঃ আরোগ্য হইয়া উঠিতেছিলেন। কিন্তু তিনি 'ফিরিঙ্গির' কারাগারে আর পদক্ষেপ করিবেন না। অকস্মাৎ কয়েকটি উপসর্গ বৃদ্ধি পাওয়ায় ২৭শে অক্টোবর (১৯০৭) সকালে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া পত্রপুষ্প ভূষিত শব লইয়া যাওয়া হয়। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী শোকবিহ্বলকণ্ঠে উপস্থিত জনমণ্ডলীর সম্মুখে ব্রহ্মবান্ধবের গুণপণার উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করেন। ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের পত্নী ব্রহ্মবান্ধবের পদধূলি শেষবারের মত লইয়া বলেন,—

"উপাধ্যায় মহাশয় আমাকে স্বদেশভক্তি শিখাইয়াছেন। আমার ন্যায় অনেক বঙ্গমহিলাকে উপাধ্যায় মহাশয় স্বদেশ ভক্তিতে দীক্ষিত করিয়াছেন। আমরা তাঁহার কাছে ঋণী। প্রাণপণে স্বদেশব্রত পালন ও অশিক্ষিত মহিলা সমাজে স্বদেশধর্মের প্রচার করিলে উপাধ্যায় মহাশয়ের ঋণ কিয়ৎ পরিমাণে শোধ হইতে পারে।"

ব্রহ্মবান্ধবের আকস্মিক মৃত্যুতে একদিকে যেমন স্বতঃস্ফূর্ত শোকোচ্ছ্বাস, অন্যদিকে তেমনি বিজয়লাভের আনন্দ। কেননা ফিরিঙ্গির কারাগারে তাঁহাকে আর যাইতে হইল না। 'বন্দে মাতরম্' এই কথাটির উপর জোর দিয়াই পরদিন সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিয়াছিলেন,—

"The man of faith speaks uncommon things—he speaks strange truths—for he is a prophet. He knows the will of Providence as Whose instrument he works. The messengers of liberty have a despot-defying strength which knows no compromise—no defeat. All who work in the train of despotism, hangman, priest, tax-gatherer, soldier, lawyer, lord, jailor, and sycophant try to rivet their iron chains on the Messiah of human emancipation, but he eludes their grasp and travel to spheres where kings have little power. The passing away of Upadhyaya Brahmabandab when the bureaucrat was pursuing him, with the most unedifying vindictiveness proves beyond the shadow of a doubt that when the infidel supposes that he can very well triumph with the prison, scaffold, Garret, handcuffs, iron necklace and lead balls at his command. Faith twits him with his audacity and takes his victim far out of his reach."

১৩

প্রারম্ভেই সাম্প্রতিককালে-প্রকাশিত ব্রহ্মবান্ধবের একখানি ইংরেজী জীবনী গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছি। ইহাতে গ্রন্থকার প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, ব্রহ্মবান্ধব মৃত্যু পর্যন্ত রোমান ক্যাথলিক ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। ব্রহ্মবান্ধব রোমান ক্যাথলিক ছিলেন কি না। তাহা আমাদের নিকট বড় কথা নয়। তিনি আজীবন ভারতবাসী ছিলেন এবং ভারতীয় ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতির পোষকতাই করিয়া গিয়াছেন। স্বদেশভক্তি তাঁহাতে

পূর্ণ মাত্রায় ছিল। তিনি ইহাতে পরিপ্লুত হইয়া অন্যদের ইহা দ্বারা প্লাবিত করিয়া গিয়াছেন। মনস্বী বিপিনচন্দ্র পাল লিখিয়াছেন,—

"উপাধ্যায় স্বদেশের ভালটুকুকে, স্বদেশী সমাজের শ্রেয়টুকুকে, স্বাদেশিক রীতিনীতির শোভনতাটুকুকেই ভাল করিয়া ধরিয়াছিলেন। ইহাতেই তাঁহার উদার কোমল প্রাণ মজিয়া গিয়াছিল। তাই তিনি অমন করিয়া স্বদেশকে ও স্বদেশী সমাজকে স্বদেশী সভ্যতা ও স্বদেশী সাধনাকে এতটা পরিমাণে প্রেম দিতে পারিয়াছিলেন। তাঁর চক্ষে আমাদের ভাল আমাদের মন্দকে ছাপাইয়া উঠিত, আমাদের সৌন্দর্য, আমাদের কদর্যতাকে ঢাকিয়া ফেলিত। আমাদের অব্যক্ত শক্তি প্রকাশ্য দুর্বলতার মায়িকতা মাত্র প্রমাণ করিত। তিনি আমাদের সিদ্ধিকে উপেক্ষা করিয়া সাধ্যের ধ্যান করিতেন। আমরা কি করিয়াছি বা করিতেছি, তার বিচার না করিয়া আমরা কি করিতে পারি তারই সন্ধান করিতেন। আর এই জন্যই আমাদের ত্রুটি দুর্বলতা প্রভৃতি কিছুতেই তাঁর প্রেমকে ব্যাহত করিতে পারিত না। এবিষয়ে তিনি ভারতের সন্তসমাজসুলভ প্রখর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন।

"আমাদের সাধুসন্তেরা মানুষ কি আছে, তাহা তত দেখেন না। সে সত্য বস্তুটি যে কি, ইহা জানেন বলিয়া, তাহার বর্তমান দুর্গতি বা পাপ-কলুষ দর্শনে বিন্দু পরিমাণেও বিচলিত হন না। এ দু'দিনের কর্মভোগ, দু'দিনে ফুরাইয়া যাইবে। পথের ধূলামাটি চিরদিন গায়ে লাগিয়া থাকিবে না। একদিন না একদিন এগুলি আপনা হইতেই ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার হইয়া যাইবে। এবিশ্বাস তাঁহাদের আছে বলিয়া কাহারও প্রতি তাঁহাদের প্রেমের বা আস্থার বা শ্রদ্ধার কোনও অল্পতা হয় না। উপাধ্যায় সেইরূপ এই ভারতবর্ষ আজি কিভাবে পড়িয়া আছে, তাহার প্রতি দৃক্‌পাত করিতেন না। ভারতবর্ষের সত্য বস্তুটি কি, ইহাই জানিয়াছিলেন ও ধরিয়াছিলেন বলিয়া তার বর্তমান দুর্গতিতে বা হীনতায় বিন্দু পরিমাণেও তাঁর

চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিত না। এ মোহ যে দু'দিনের, এ মায়া যে ক্ষণস্থায়ী, এ দুর্দশা যে শারদ প্রভাতের মেঘাড়ম্বরের ন্যায় আপনা হইতে কালক্রমে কাটিয়া যাইবেই যাইবে, এ বিশ্বাস উপাধ্যায়ের মধ্যে যেমন দেখিয়াছি, এমন কাহারো মধ্যে দেখি নাই। আর উপাধ্যায়ের মধ্যে যে রক্ষণশীলতা দেখা যাইত, তাহা এই অটল বিশ্বাসেরই ফল। স্বদেশের সভ্যতার ও সাধনার, স্বদেশের সমাজ প্রকৃতির ও লোক প্রকৃতির উপরে উপাধ্যায়ের যেরূপ আস্থা ছিল, এমন আস্থা আমাদের মধ্যে আর কাহারো ছিল বলিয়া বিশ্বাস হয় না।"

ব্রহ্মবান্ধবের আর একটি কৃতির কথাও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়—যদিও ইহাও তাঁহার অপূর্ব স্বদেশভক্তিরই অঙ্গ। তাঁহার দ্বারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যে কতখানি উপকৃত হইয়াছে, তাহা হয়ত আজ অনেকেরই অজ্ঞাত। তিনি বঙ্গদর্শনে গুরুগম্ভীর দর্শনালোচনা তদুপযুক্ত ভাষাতেই করিয়াছেন। 'সমাজ' নামক পুস্তকে তাহার প্রায় সবই (একটি বাদে) পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু জনগণের ভাষায় রাজনীতির কথা প্রকাশও তাঁহার একটি প্রধান কীর্তি। বাংলা সাহিত্যে তিনি এই ব্যাপারে অন্যতম পথ-প্রদর্শক। "আমার ভারত-উদ্ধার" এবং "বিলাত যাত্রী সন্ন্যাসীর চিঠি"তে (১৩১৩) ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। "আমার ভারত-উদ্ধার" অসমাপ্ত রচনা। ব্রহ্মবান্ধবের "পালাপার্বণ" পুস্তকখানিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। "সন্ধ্যা" গ্রাম্য জনগণের ভাষাতেই লিপিবদ্ধ হইত বলিয়া তখন তথাকথিত বিদগ্ধ সমাজ ইহা পছন্দ করিতেন না। কিন্তু বাংলা ভাষাকে সহজ ও সাধারণবোধ্য করিবার এই যে প্রয়াস আরম্ভ হয় তাহার ফলে ইহা এখন বাঙ্গালীর ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, মুষ্টিমেয় পণ্ডিতম্মন্যদের মধ্যে ইহা আর আবদ্ধ নহে। আজিকার পরিবেশে ব্রহ্মবান্ধবের মত মহাপ্রাণ স্বদেশভক্তের জীবনকথা নূতন করিয়া আলোচনার সময় আসিয়াছে।

ভগিনী নিবেদিতা

১

গত ১৯৪৫ সনে 'সিষ্টার' বা ভগিনী নিবেদিতার একখানি জীবনী-গ্রন্থ ফরাসী ভাষায় বাহির হইয়াছে। নিবেদিতার মৃত্যুর পরে শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকার তাঁহার শিক্ষয়িত্রী জীবনের কথা একখানি পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করেন। নিবেদিতা সম্বন্ধে কোন কোন পত্র-পত্রিকায় কিছুকাল যাবৎ আলোচনাও হইয়াছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, বাংলা ভাষায় তাঁহার কোনও তথ্যনির্ভর পূর্ণাঙ্গ জীবন-চরিত এখনও রচিত হয় নাই। অথচ গত পঞ্চান্ন বৎসরে বঙ্গীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও শিল্পে যে নূতন ধারা প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহার অন্যতম মূলাধার ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। আজিকার বাঙ্গালী এই ভাবধারা দ্বারাই পুষ্ট ও বলিষ্ঠ। ভগিনী নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দ-শিষ্যা। স্বামীজীর ঐকান্তিক ভারত-প্রীতি নিবেদিতার মধ্যে পূর্ণ সুষমায় প্রকটিত হইয়াছে।

নিবেদিতা ছিলেন নব্যবঙ্গের মধ্যমণি। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, রাজনীতিজ্ঞ বঙ্গসমাজের পুনর্গঠনে তৎপর হইয়াছিলেন। প্রবীণ ও নবীন সকলেই নিবেদিতার একনিষ্ঠ ভারত-প্রীতিতে মুগ্ধ হন। তখনকার যুবসম্প্রদায় ইহা দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া নিজ নিজ কর্তব্যপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সে যুগে এমন কোন বাঙ্গালী প্রধান ছিলেন না, যিনি তাঁহার সংস্পর্শে আসেন নাই। রমেশচন্দ্র দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু তখন প্রবীণ দলভুক্ত। যেমন নিবেদিতা তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়া-ছিলেন, তেমনি নব্যবঙ্গের পুরোধা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু ও লেডী বসু, বিপিনচন্দ্র পাল, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর,

প্রফুল্লচন্দ্র রায়, নীলরতন সরকার, দীনেশচন্দ্র সেন, যদুনাথ সরকার, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, অরবিন্দ ঘোষ, অশ্বিনীকুমার দত্ত, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষিগণও নিবেদিতার গুণে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। তখনকার যুব-ছাত্রদের মধ্যে নন্দলাল বসু, বিনয়কুমার সরকার, তারকনাথ দাস প্রভৃতিও তাঁহার নিকট হইতে বিভিন্ন দিকে প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। নিবেদিতা নব্যবঙ্গের অন্যতম স্রষ্টা।

২

ভগিনী নিবেদিতার পূর্বাশ্রমের নাম মারগারেট এলিজাবেথ নোব্‌ল। উত্তর আয়ার্লণ্ডে ১৮৬৭, ২৮শে অক্টোবর একটি ক্যাথলিক পরিবারে নিবেদিতা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা স্কচ, নাম স্যামুয়েল রিচমণ্ড নোব্‌ল। মাতা ইসাবেল ছিলেন আইরিশ। নোবল-পরিবার আইরিশ জাতির স্বার্থকেই নিজেদের স্বার্থ বলিয়া গণ্য করিয়া স্বদেশের উন্নতির কার্যে লিপ্ত ছিলেন। পিতা রিচমণ্ড প্রথমে বস্ত্রের ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার ধর্মপ্রবণ অন্তঃকরণ সায় দিল না। তিনি পাদ্রী হইয়া ইংলণ্ডের ডেভনশায়ারের একটি গ্রামে সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন। মারগারেট ব্যতীত তাঁহাদের আরও দুইটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে।

মারগারেটের জীবনের প্রথম চারি বৎসর উত্তর আয়ার্লণ্ডে পিতামহীর নিকটে আইরিশ পরিবেশের মধ্যে কাটে। ইহার পর তাঁহাকে পিতা-মাতার কাছে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এখানে যথাবিহিত শিক্ষালাভ করিয়া ভগিনী মেরীসহ মারগারেট হ্যালিফাক্স কলেজে ভর্তি হইলেন। এখানকার শিক্ষা সমাপনান্তে শিক্ষাব্রত গ্রহণের জন্য তিনি প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে পিতা রিচমণ্ডের মৃত্যু হওয়ায় কর্ম গ্রহণে অধিকতর

বিলম্ব করাও আর সম্ভব হইল না। কেস্‌উইকের একটি প্রাইভেট স্কুলে তিনি শিক্ষয়িত্রীর পদ গ্রহণ করিলেন।

শিক্ষকতা কার্যে লিপ্ত হইয়াই মারগারেট যেন একটি নূতন জগতের সন্ধান পান। তিনি খৃষ্টধর্মের প্রোটেষ্টাণ্ট শাখার বিষয় জানিয়া কতকটা 'মিষ্টিক' হইয়া পড়েন। এই সময় জীবনের একটি নূতন আস্বাদও তিনি পাইলেন। গেলোয়া নামক তেইশ বৎসরের একটি যুবকের সঙ্গে মারগারেটের পরিচয় হয়। যুবকটি তাঁহাকে পত্রিকা ও পুস্তকাদি কিনিয়া দিতেন। উভয়ে একসঙ্গে থরো, এমার্সন ও রাসকিন অধ্যয়নে নিরত হন। উভয়ে একত্র ভ্রমণেও বাহির হইতেন। পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হইল। তাঁহাদের বিবাহের কথাবার্তাও হইয়াছিল, কিন্তু যুবকটি মারা যাওয়ায় মারগারেটকে নিরাশ হইতে হয়।

ইহার পর তিনি চেষ্টারে বদলী হইয়া যান। সেখানে তাঁহাকে বয়স্কা ছাত্রীদের পড়াইতে হইত। তাঁহার ভগিনী লিভারপুলে কাজ করিতেন, মারগারেট সেখানে মাঝে মাঝে যাইতেন। চেষ্টারের সানডে ক্লাবে তিনি যোগ দিলেন। এখানে সাহিত্যিকেরা আসিয়া নানা বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। মারগারেট এই সময় অল্প অল্প লিখিতেও আরম্ভ করিলেন। দুই বৎসর চেষ্টারে কাটাইবার পর জনৈকা বান্ধবীর লণ্ডনস্থ 'নিউ স্কুল' নামক বিদ্যালয়ে তিনি নিযুক্ত হইয়া আসেন। উইম্বলডনের এই ছোট স্কুলটি মারগারেটের বড়ই ভাল লাগিতেছিল। এতদিন তিনি বয়স্কা ছাত্রীদের অধ্যাপনায় লিপ্ত ছিলেন, এখানে ছোট ছোট শিশুদের জীবন-গঠনের কার্যে নিয়োজিত হইলেন।

ইতিমধ্যে আরও কয়েকটি কাজে তিনি হাত দিয়াছিলেন। সেণ্ট মার্ক চার্চের সংস্কার মানসে নর্থ ওয়েলস গার্ডিয়ানকে একখানি পত্র লিখিলেন। তাঁহার লেখিকা-জীবনের এখানেই আরম্ভ। তিনি ছদ্মনামে সংবাদপত্রেও প্রবন্ধ লিখিতেন। মারগারেট দারিদ্র্যব্রত অবলম্বন করিলেন। তিনি

উইম্বলডনের দীনদরিদ্রের সেবায় এই সময় হইতেই রত হন। এখানে তিনি আর একটি যুবকের সহিত প্রণয়াবদ্ধ হন। দীর্ঘ পনর মাস ঘনিষ্ঠতার পরে যুবকটি পূর্ব-প্রণয়িনীকে বিবাহ করে। এই ব্যাপারে মারগারেট মনে ভীষণ আঘাত পান। যাহা হউক, কিছুকাল পর তিনি পুনরায় নিজ কার্যে পূর্ণোদ্যমে নিয়োজিত হইলেন।

শিক্ষাব্রত মারগারেট-জীবনের প্রধানতম কার্য। তিনি শিক্ষা-সংস্কারেও মন দিলেন। পেষ্টালোজী ও ফ্রয়বেলের শিক্ষাপদ্ধতি অবলম্বনে তিনি এক নূতন প্রণালী আবিষ্কার করিলেন। ইহা কিণ্ডার-গার্টেন প্রণালীর অনুযায়ী। স্বাধীনভাবে নিজ প্রণালী প্রবর্তনের জন্য তিনি 'রাস্‌কিন স্কুলে' কর্ম গ্রহণ করেন। এইখানে কার্যকালেই তিনি ম্যাকনিল নামক এক যুবকের সঙ্গে মিলিত হইয়া 'সিসেম ক্লাব' স্থাপন করিলেন। শিক্ষার নূতন আদর্শ প্রচারের কেন্দ্র হইল এই সিসেম ক্লাব। এই সময়েই তিনি স্বামী বিবেকানন্দের বাণী শ্রবণের সুযোগ পান।

মারগারেট সমাজ-সংস্কারক, শিক্ষাব্রতী ও বুদ্ধিমতী লেখিকা, দরিদ্র নরনারীর সেবায় নিয়োজিতা। বিবেকানন্দের সংস্রবে আসিবার পূর্বে তিনি আরও একটি বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। মারগারেট আয়ার্লণ্ডের 'হোমরুল' আন্দোলনের লণ্ডনস্থ শাখার একজন প্রধান কর্মী ও অধ্যক্ষা। তিনি বিপ্লবী। রাশিয়ার বিপ্লবের আন্দোলন তাঁহার মনেও দোলা দিয়াছিল। আয়ার্লণ্ডের স্বাধিকার লাভের আশায় তিনি নিজেকে বিপ্লবী প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত করিয়া লইতেও দ্বিধা করেন নাই।

৩

কুমারী মারগারেট এলিজাবেথ নোব্‌ল সবে ঊনত্রিংশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। এই সময় ১৮৯৫ সনের নভেম্বর মাসে এক রবিবারে

পনের-ষোল জন সঙ্গিনীসহ তিনি স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্তবিষয়ক আলোচনা শুনিতে ওয়েষ্ট এণ্ডে ই. টি. স্টার্ডির গৃহে গমন করেন। প্রথম দিনের আলোচনায় নূতন কিছু জানিতে পারিলেন বলিয়া শ্রোতাদের অনেকেরই মনে হয় নাই। মনস্বিনী মারগারেটের মনে কিন্তু বেশ একটা ধাক্কা লাগিল। তিনি বিবেকানন্দের আলোচনার মধ্যেই "message of a new mind and a strange culture," 'একটি নূতন মন এবং অপূর্ব সংস্কৃতির বাণী' শুনিতে পাইলেন। তিনি এই সময় আরও দুই বার লণ্ডনে স্বামীজীর বক্তৃতা শোনেন। অল্পকাল লণ্ডনে অবস্থিতির পর স্বামীজী পুনরায় আমেরিকায় যান। সেখান হইতে ১৮৯৬ সনের এপ্রিল মাসে লণ্ডনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। জুলাই মাসে লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ফ্রান্স, জার্মাণী ও সুইজারল্যাণ্ড পরিভ্রমণ করেন। অতঃপর রোম হইয়া তিনি স্বদেশাভিমুখে রওনা হন। স্বামীজী ১৮৯৭, ১৫ই জানুয়ারী কলম্বোতে উপনীত হইলেন।

দ্বিতীয় বার লণ্ডনে অবস্থানকালে মারগারেট স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিলেন। তিনি ইতিমধ্যেই স্বামীজীকে মনে মনে 'গুরু' বা আচার্য (Master) বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। The Master as I saw Him ('গুরুকে যেমনটি দেখিয়াছি') পুস্তকে তিনি এই মর্মে লিখিয়াছেন যে, স্বামীজী কোন বিশেষ ধর্মের পক্ষ সমর্থন করিয়া কিছু বলিতেন না। তিনি এমনভাবে বেদান্তের সারতত্ত্ব শ্রোতৃবর্গকে বুঝাইয়া দিতেন যে, তাহার মধ্যে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরই গ্রহণযোগ্য তত্ত্ব মিলিত। তবে তাঁহার উপদেশ ভারতবর্ষের পৃথক পৃথক যুগের নানা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিতেন। তাহাতে ভারতের দিকে মন সহজেই আকৃষ্ট হইত। বিদুষী মারগারেটের হৃদয়ও স্বামীজীর কথায় সাড়া না দিয়া পারিল না। ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন স্বামীজীর মনোগত অভিপ্রায়। নারী

জাতিকেও সুপথে চালিত করিতে হইবে। স্বামীজী একদিন কথায় কথায় নিবেদিতাকে বলেন ঃ

"I have plans for the women of my own country in which you, I think, could be of great help to me."

অর্থাৎ, 'নারী জাতির উন্নতিকল্পে আমার যেরূপ অভিপ্রায়, তাহাতে তুমি আমার বিশেষ সাহায্য করিতে পারিবে।' মারগারেট লণ্ডনে দরিদ্র ছাত্রীদের উপযুক্ত শিক্ষাদানের জন্য নিজ শিক্ষা-দীক্ষা, বিদ্যাবুদ্ধি ও শক্তি-সামর্থ্য নিয়োজিত করিতে যেরূপ সুরু করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা স্বামীজীর অগোচর ছিল না। এইজন্যই হয়ত তিনি মারগারেটকে বাছাই করিয়া লইয়াছিলেন। মারগারেট লিখিয়াছেন, স্বামীজীর ঐ উক্তির মধ্যেই তিনি এমন একটি আহ্বান শুনিলেন, যাহাতে তাঁহার জীবনের গতি একেবারে পরিবর্তিত হইয়া গেল। স্বামীজীর যোগ্যা শিষ্যা তথা ভারতের সত্যিকার সেবিকা হইবার নিমিত্ত এই সময় হইতেই তিনি যত্নপর হন। মারগারেট ভারত-যাত্রার সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু যে গুরুভার তাঁহাকে বহন করিতে হইবে, তজ্জন্য তো প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। তিনি আত্ম-প্রস্তুতি কার্যে মন দিলেন। যখন বুঝিলেন, ভারতবর্ষে যাওয়া তাঁহার পক্ষে যুক্তিযুক্ত, তখন তিনি যাত্রা করিলেন। ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষকে তিনি মনে মনে স্বদেশ বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছিলেন। ভারত-যাত্রা তাঁহার নিকটে যে তখন স্বদেশ-যাত্রা! মারগারেট ১৮৯৮ সনের ২৮শে জানুয়ারী ভারতে পদার্পণ করেন। কলিকাতার সন্নিকটে বেলুড় মঠ নির্মাণের জন্য তখন সবেমাত্র জমি ও একটি বাড়ী কেনা হইয়াছে। এখানে তিনি স্বামীজীর মার্কিণ-শিষ্যাদের সঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন।

ভারতে পদার্পণের অল্পকাল পরে স্বামীজীর সভাপতিত্বে কলিকাতার ষ্টার থিয়েটারে মারগারেট "The Influence of Indian Spiritual

Thought in England' ('বিলাতে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের প্রভাব') শীর্ষক একটি বক্তৃতা ১৮৯৮, ১১ই মার্চে প্রদান করেন। এই সাধারণ সভায়ই সর্বপ্রথম স্বামাজী 'ভারতকে ইংলণ্ডের আর একটি দান' বলিয়া মারগারেটকে অভিনন্দিত করিলেন। ইহার মাত্র পাঁচ দিন পরে স্বামীজী কুমারী মারগারেট এলিজাবেথ নোব্‌লকে দীক্ষা দানান্তর 'নিবেদিতা' নামে ভূষিত করেন। অতঃপর মারগারেট 'নিবেদিতা' বলিয়া সর্বত্র পরিচিত হন। স্বামীজী এই উপলক্ষ্যে নিবেদিতার উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত কবিতাটি রচনা করিলেন ঃ

The mother's heart, the hero's will,
The softest flower's sweetest feet,
The charm and force that ever sway
The alter flowers flaming play ;
The strength that leads in love obeys.
Far-reaching dreams and patient ways
Eternal faith in self, in all,
The light divine in great, in small ;
All these and more than I could see,
Today may mother grant to thee.

স্বামীজী গুরুভাই ও শিষ্যদের লইয়া ১৮৯৮, ৬ই মে উত্তর ভারত পরিক্রমার কলিকাতা হইতে যাত্রা করেন। ছয় মাসেরও অধিক কাল পর্যটনের পর ১৮ই অক্টোবর তাঁহারা বেলুড়ে আসিয়া পেঁাছিলেন। বলা বাহুল্য, নিবেদিতাও এই দলে ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, বেলুড়ে বন্ধুদের সঙ্গে অবস্থানকালে এবং কুমায়ুন ও কাশ্মীর ভ্রমণের সময়ে তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করিতে আরম্ভ করেন। বিশেষ করিয়া স্বামীজীর ব্যক্তিগত জীবন ও দরদী মনেরও পরিচয় তিনি এই সময়ে পাইতে লাগিলেন। অনেকে ভাবিয়াছিলেন, নিবেদিতার আগমনের

সঙ্গে সঙ্গে বালিকা বিদ্যালয় খোলা হইবে ; স্বামীজী কিন্তু উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষায় ছিলেন। কাশ্মীরের একটি বনানীর তাঁবুতে স্বামীজী, বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে নিবেদিতা কিছু ভাবিয়াছেন কিনা, সেকথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে অন্য শিষ্য ও গুরুভাইরাও বসিয়াছিলেন। নিবেদিতা লিখিয়াছেন ঃ

"I replied eagerly, begging to be freed from collaborators, to be allowed to begin in a small way, spelling out my method ; and urging above all, the necessity of a definite religious colour, and the usefulness of sects."

—*The Master as I Saw Him*—Pp. *141*.

নিবেদিতা কি পদ্ধতিতে কাজ করিতে চাহেন, স্বামীজীকে তাহা জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার কার্যে অন্যনিরপেক্ষ হইয়া স্বাধীনভাবে অগ্রসর হইতে চান। স্বামীজী তাঁহার প্রস্তাবে সম্পূর্ণ সম্মতি দিলেন। কলিকাতায় ফিরিয়া ১৮৯৮, ১২ই নবেম্বর কালীপূজার দিনে বাগবাজারে বোসপাড়ার গলিতে স্বামীজী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। মাতা শ্রীশ্রীসারদাদেবী এই কার্যকে আশীর্ব্বাদ করেন। ইহার পর বিদ্যালয়ের কার্য আরম্ভ হইল। এই বিদ্যালয়টিই পরে নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়রূপে পরিচিত হইয়াছে। নিবেদিতা লিখিতেছেন, বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাবধি ১৮৯৯ সনের জুন মাসে ভারত-ত্যাগ পর্যন্ত এখানে তাঁহার নিজেরই শিক্ষালাভ হইয়াছে। ১৯০৩ সনের শরৎকাল হইতে মার্কিণ মহিলা বিবেকানন্দ-শিষ্যা কুমারী ক্রিষ্টিনা বিদ্যালয়ের কার্যে নিবেদিতার সহকারিণী হন। বিদ্যালয়টির সাফল্যের মূলে তাঁহার কৃতিত্বও ছিল অনেকখানি। এই বালিকা বিদ্যালয়টিই পরবর্তী কয়েক বৎসর নিবেদিতার প্রত্যেকটি কর্মের কেন্দ্রস্থল এবং বিভিন্ন মনীষীর মিলনক্ষেত্র হইয়া দাঁড়ায়। ইহা ছিল তাঁহার আবাস গৃহ।

নিবেদিতা ব্রহ্মচর্য-ব্রত অবলম্বন করিয়া কৃচ্ছ্র সাধন আরম্ভ করিয়াছেন। অশনেবসনে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। পাছে নূতন পরিবেশে এত কৃচ্ছ্রসাধনায় তাঁহার স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া পড়ে, এজন্য স্বামীজীর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। তিনি কখনও কখনও নিবেদিতার স্বহস্ত-পক্ক দ্রব্যাদি ভোজন করিতেন, হিন্দুসমাজে তিনি যাহাতে গৃহীত হন, সেজন্যও তিনি সচেষ্ট হইলেন। আচার-আচরণে ভারতীয় বনিয়া যাইতে নিবেদিতার অধিক সময় লাগিল না। তিনি এতদঞ্চলের রাস্তাঘাট পরিষ্কার করিতেও লাগিয়া গেলেন। যখন প্লেগ মহামারী উপস্থিত হইল, তখন তিনি নিজেই প্লেগ-আক্রান্ত রোগীদের সেবাশুশ্রূষার ভার লইলেন। তিনি বোসপাড়া গলি ছাড়িয়া কোথায়ও যাইতেন না। তিনি বলিতেন ঃ

"The lane has adopted me and I must stay here and nowhere else."

"গলিটি আমাকে আপন করিয়া লইয়াছে, আমি এ-জায়গাটি ছাড়িয়া এক পাও নড়িব না।" ইহা অবশ্য পরবর্তী কালের কথা।

হিন্দুধর্মের মর্মকথাও নূতন পরিবেশের মধ্যে থাকিয়া নিবেদিতা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইহার একটি প্রমাণ —কলিকাতা এলবার্ট হলে ১৮৯৯, ১৩ই ফেব্রুয়ারী প্রদত্ত তাঁহার 'Kali the Mother' বক্তৃতা। কালীমাতা সম্বন্ধে শিক্ষিত সমাজের এতই বিরূপ ধারণা ছিল যে, মেট্রোপলিটান (বিদ্যাসাগর) কলেজের অধ্যক্ষ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রথমে সভাপতি হইতে রাজি হইয়াও শেষ পর্যন্ত সভাস্থ হওয়া সমীচীন বোধ করেন নাই। আচার্য যদুনাথ সরকার বলেন, এই বক্তৃতায় কালীমাতার নূতন ব্যাখ্যায় বঙ্গীয় সমাজ মুগ্ধ হইয়া গেল। তমোহারিণী দুষ্কৃতদলনী রূপে কালীমাতার এমন ব্যাখ্যা শিক্ষিত জন পূর্বে আর কখনও শুনেন নাই।

৪

স্বামী বিবেকানন্দ, তুরীয়ানন্দ ও নিবেদিতাসহ দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য ভ্রমণে বাহির হইলেন। তাঁহারা কলিকাতা হইতে ১৮৯৯, ২০শে জুন জাহাজযোগে রওনা হন এবং পরবর্তী ৩১শে জুলাই লণ্ডনে পৌঁছেন। এই সময়ে স্বামীজী নিবেদিতাকে নানা বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেন। ব্যক্তিগত আচরণাদি সম্পর্কে স্বামীজীর উপদেশের কথা নিবেদিতা এইরূপ লিখিয়াছেন ঃ

"You must give up all visiting, and live in strict seclusion. You have to set yourself to Hinduism your thoughts, your needs, your conceptions, and your habits. Your life, internal and external, has to become all that on orthodox Hindu Brahmacharin's ought to be. The method will come to you if only you desire it sufficiently. But you have to forget your own past, and to cause it to be forgotten. You have to lose even its memory.—*Ibid*., p. 310.

নিবেদিতা গুরুর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। তিনি যথার্থ হিন্দু ব্রহ্মচারিণীর মত জীবনযাপন করিয়া হিন্দুধর্মের সারসত্য হৃদয়ঙ্গম করেন এবং দশজনকেও ইহা শ্রবণ করান। ভারত-সেবার নানা পদ্ধতি তাঁহার নিকট কিরূপ উন্মুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, আমরা একটু পরেই তাহা বুঝিতে পারিব। নিবেদিতা উত্তর ভারত, কাশ্মীর, কুমায়ুন ভ্রমণে এবং কলিকাতা বাসকালে গুরুর সঙ্গলাভ করিয়াছেন। তাঁহার মুখনিঃসৃত উপদেশাবলী তিনি নিজ জীবন দিয়া উপলব্ধি করিতে প্রয়াস পান। বিলাত যাত্রার সময়েও জাহাজে গুরুর সঙ্গ পূর্ণভাবে লাভ করেন। ইংলণ্ড ও আমেরিকায়ও তাঁহার এই সুযোগ ঘটে। স্বামীজী লণ্ডনে কয়েক সপ্তাহ থাকিয়া আমেরিকা

চলিয়া যান। নিবেদিতা সেখানে স্বামীজীর সঙ্গে ছয় সপ্তাহ বাস করেন। ১৯০০ সনে নিউ ইয়র্কে এবং প্যারিসে ও সর্বশেষে ব্রিটানিতে নিবেদিতা স্বামীজীর সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন। নিবেদিতা স্বয়ং লিখিয়াছেন ঃ

"I missed no opportunity of the Swami's society that presented itself, accepted practically no other, filling up the time with quiet writing and needle-work : thus I received one long continuous impression of his mind and personality, for which I can never be sufficiently thankful.—(*Ibid*. p. 174).

একত্র অবস্থানের ফলে নিবেদিতা স্বামীজীর মন ও ব্যক্তিত্বের বিশেষ পরিচয় পাইয়াছিলেন। তাঁহার উপর স্বামীজীর প্রভাব এত অধিক পড়িয়াছিল যে, বলিয়া শেষ করা যায় না। স্বামীজীর বাণীসমূহ নিবেদিতার হৃদয়মুকুরে পরিপূর্ণভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল। তাই তৎকর্তৃক ভারত-ধর্মের বিভিন্ন ধারার আলোচনায় তাহা এমন করিয়া সক্রিয় হইয়া উঠা সম্ভবপর হয়। ১৯০০ সনে কোন সংবাদপত্রের পক্ষে এফ, জে আলেকজাণ্ডার নামক এক যুবক নিউ ইয়র্কের একটি রেলওয়ে ষ্টেশনে নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করিতে আসেন। নিবেদিতার সঙ্গে কথাবার্তায় তাঁহার প্রথমেই যে ধারণা হয়, সে সম্বন্ধে লেখেন ঃ

"In the inclusive sense of the word she was an *Indian*, and the manner in which she spoke of Indian politics and the names she mentioned of celebrated Indians, with which her sentences were replete, made me then and there reshape my entire conception as to 'who' the Sister Nivedita was. She was no mere nun, with a retiring, purely religious dispositon. She was an incarnate representative, as I come more and more to know, verily of the Indian Dharma itself in

all of its aspects, and a great enthusiast, I lost myself in that short space of time in admiration, forgetting my tea and my surroundings in spell-bound attention to her words.—(*The Modern Review* for August, 1912).

নিবেদিতা ১৯০০ সনেই ভারত-ধর্মের মূর্ত-প্রতীক বলিয়া এই মার্কিণ যুবকের নিকট প্রতিভাত হইয়াছিলেন। নিবেদিতা শুধু একজন বিবাগী সন্ন্যাসিনী নহেন ; ভারত-ধর্মের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে তাঁহার সজাগ দৃষ্টি দেখিয়া যুবকটি বিস্মিত হন। আলেকজাণ্ডার মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহার কথা শুনিতে লাগিলেন। নিবেদিতা ভারতের রাজনীতির আলোচনায়ও যে এ সময় সমান আগ্রহশীল ছিলেন, আলেকজাণ্ডারের উক্তিতে তাহাও আমরা জানিতে পারিলাম।

নিবেদিতা বিশেষ কার্যে স্বামীজী কর্তৃক নিয়োজিত হইয়াছিলেন, তাহা কি তিনি ভুলিতে পারেন ? জাতীয় ভাবে স্ত্রী-শিক্ষা-বিস্তারকল্পে আমেরিকাবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নিবেদিতা ১৯০০, ২রা এপ্রিল 'The Project of the Ramkrishna School for Girls' নামে একখানি অনুষ্ঠান-পত্র রচনা করিয়া প্রকাশিত করিলেন। ভারতীয় নারীদের শিক্ষা কি ধরণের হওয়া উচিত, সে বিষয়ে ইহাতে যথেষ্ট আলোচনা আছে। বিলাতে বসিয়াও তিনি এই উদ্দেশ্যে কার্য করিয়াছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত লণ্ডনস্থ সিসেম ক্লাবে ১৯০০, ২২শে অক্টোবর 'ভারতীয় জীবনের নূতন ব্যক্তিত্ব' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন ঐ একই উদ্দেশ্যে। নরওয়ে নিবাসিনী মিসেস ওলি বুল শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ উক্ত বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার বহন করিতে সম্মত হইলেন। লেডী অবলা বসু লিখিয়াছেন, 'ভারতীয় নারী জাতির উন্নতির উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য বিলাতে অবস্থানকালে তাঁহার সঙ্গে নিবেদিতা দেখা-সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। বিদেশে তিনি কঠিন রোগে

আক্রান্ত হইলে নিবেদিতা কায়মনে তাঁহার সেবা ও শুশ্রূষা করেন।" কিন্তু সে অন্য কথা।

স্বামীজী ১৯০০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে স্বদেশ যাত্রা করেন। ব্রিটানিতে বিদায়কালে তিনি নিবেদিতার উদ্দেশ্যে এই কথা কয়টি উচ্চারণ করেন :

"Go forth into the world, and there, if I made you, be destroyed! If Mother made you, live!"—(*The Master As I Saw Him*, p, 222).

স্বামীজির উপদেশ ও শিক্ষা নিবেদিতা ঈশ্বরাদেশ বলিয়া গ্রহণ করিতেন। তাঁহার ভারত-প্রত্যাবর্তনে বৎসরাধিককাল বিলম্ব হয়। এই সময় তিনি আর একজন মহামনা ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিলেন। ইনি রমেশচন্দ্র দত্ত। তাঁহার স্বদেশ-প্রীতি দর্শনে নিবেদিতা মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহারই সঙ্গে একই জাহাজে ১৯০২ সনের জানুয়ারী মাসে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসেন। ভারতবর্ষ ইতিপূর্বেই তাঁহার স্বদেশে রূপান্তরিত হইয়াছে। রমেশচন্দ্র ও নিবেদিতা জাহাজে করিয়া মাদ্রাজে পৌঁছিলে উভয়ে জনসাধারণ কর্তৃক একটি প্রকাশ্য সভায় অভিনন্দিত হইলেন। রমেশচন্দ্র অভিনন্দনের উত্তরে নিবেদিতা সম্পর্কে বলেন :

"I felt an unspeakable joy that you should have thus accorded your hearty greetings to a lady who is now one of us, who lives our life, shares our joys and sorrows, partakes of our trials and troubles and labours with us in the cause of our Mother-land."—(*Life and Work of Romesh Chandra Dutta*, p, 297).

নিবেদিতা ভারতমাতার সন্তান বলিয়া তখনই গণ্য হইয়াছেন। তিনি আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখের ভাগী। তিনি স্বদেশের কার্যে জীবন উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন। কলিকাতায় ফিরিয়া আবার তিনি

তাঁহার কার্যে মাতিয়া রহিলেন। এবারে স্বামীজীর সঙ্গলাভ তাঁহার ভাগ্যে আর বেশীদিন ঘটিল না। ১৯০২ সনের ৪ঠা জুলাই স্বামীজী বেলুড় মঠে দেহত্যাগ করিলেন। নিবেদিতা মৃত্যু-সংবাদ পাইবামাত্র মঠে ছুটিয়া গেলেন। শবদেহ যতক্ষণ পর্যন্ত মরধামে ছিল, ততক্ষণ পার্শ্বে বসিয়া ইহাকে পাখার হাওয়া করিয়াছিলেন। স্বামীজীর মৃত্যু যে নিবেদিতার কাছে অবিশ্বাস্য।

৫

স্বামীজী ভগিনী নিবেদিতাকে স্বাধীনভাবে কাজ করিবার অনুমতি দিয়া যান। একটি সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত হইলে এই স্বাধীনতা বিলোপের আশঙ্কা—এইজন্য তিনি স্বামীজীর মৃত্যুর পনর দিনের মধ্যেই রামকৃষ্ণ মিশন হইতে নিজের নাম কাটাইয়া লইলেন। নিবেদিতা অতঃপর নিজের নাম স্বাক্ষর করিতেন 'Nivedita of Ramkrishna-Vivekananda' ('রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা')। স্বামীজীর নিকট হইতে যে সেবাধর্মের শিক্ষা তিনি পাইয়াছেন, বোসপাড়ার বালিকা বিদ্যালয়টিকে কেন্দ্র করিয়া ভারতবাসীর উন্নাতকল্পে তাহাই নিয়োজিত করিলেন। ভারত-ধর্ম ও সংস্কৃতি-সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, জাতীয় শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, সাংবাদিকতা, গ্রন্থ-রচনা, রাষ্ট্রীয় কার্য—কোনটিই তাঁহার নিকট হইতে বাদ পড়িল না। নিবেদিতা ইউরোপীয় শিল্পকলার সঙ্গে সুপরিচিত; স্বামীজীর সঙ্গে উত্তর ভারত পরিভ্রমণ কালে ভারতীয় ললিতকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য স্বচক্ষে দেখিয়া তাহার মর্মস্থলে প্রবেশ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। নিবেদিতার ভারত-প্রীতি ভারতীয় শিল্প-কলার শাশ্বত রূপের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিল। আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে তিনি ১৯০০, ২৪শে জুন ভারতীয় শিল্পকলার

উপরে প্রকাশ্যে বক্তৃতা দিলেন। দ্বিতীয় বার ভারত আগমনের পর নিবেদিতা এই বিষয়ে আরও মনোযোগী হইলেন।

১৯০২ সাল। জাপান হইতে কাউন্ট ওকাকুরা তথাকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রকর তাইকোয়ানকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন। ওকাকুরা Ideals of the East পুস্তকে প্রাচ্যের আদর্শের কথা বিশদভাগে বর্ণনা করিয়াছেন। এশিয়া যে ইউরোপ হইতে নিকৃষ্ট নয়, বরং নানা বিষয়ে ইউরোপেরই শিক্ষাগুরু, একথা ওকাকুরা বলিতে ভুলেন নাই। ইহা রুশ-জাপান যুদ্ধের (১৯০৫) বহু পূর্বের কথা।

যাহা হউক, ওকাকুরার সঙ্গে নিবেদিতা অবিলম্বে মিলিত হইলেন। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষকে যাঁরা সত্যিই ভালোবেসেছিলেন, তার মধ্যে নিবেদিতার স্থান সবচেয়ে বড়।" ওকাকুরা-নিবেদিতা মিলনের কথা তিনি এইরূপ বলিয়াছেন ঃ

'প্রথমে তাঁর (নিবেদিতার) সঙ্গে আমার দেখা হয় আমেরিকান কন্সালের বাড়িতে। ওকাকুরাকে রিসেপশন দিয়েছিল, তাতে নিবেদিতাও এসেছিলেন। গলা থেকে পা পর্যন্ত নেমে গেছে সাদা ঘাগ্‌রা, গলায় ছোট্ট রুদ্রাক্ষের মালা ; ঠিক যেন সাদা পাথরের গড়া তপস্বিনীর মূর্তি একটি। যেমন ওকাকুরা একদিকে, তেমনি নিবেদিতা আর একদিকে। মনে হল যেন দুই কেন্দ্র থেকে দুটি তারা এসে মিলেছে। সে কি দেখলুম, কি করে বোঝাই।" ('জোড়াসাঁকোর ধারে,' পৃঃ ১০৮)।

ওকাকুরা তখন নব্যবঙ্গে যে সাড়া আনিয়া দেন, নিবেদিতার কৃতিগুণে তাহা স্থায়ী হইয়া গেল। তিনি ধাত্রীর মত ভারতীয় চিত্রকলার বঙ্গীয় শাখাকে লালন করিয়া গিয়াছেন। এ বিষয় বলিবার পূর্বেই নিবেদিতা সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথের আর একটি উক্তি এখানে উল্লেখ করিতেছি ঃ

"আর একবার দেখেছিলুম তাঁকে। আর্ট সোসাইটির এক পার্টি, জাস্টিস হোমউডের বাড়ীতে, আমার উপরে ছিল নিমন্ত্রণ করার ভার।

নিবেদিতাকেও পাঠিয়েছিলুম চিঠি একটি, পার্টি সুরু হয়ে গেছে। একটু দেরি করেই এসেছিলেন তিনি। বড় বড় রাজা-রাজড়া সাহেব-মেম গিসগিস করছে। অভিজাতবংশের বড়ঘরের মেম সব; কত তাদের সাজসজ্জার বাহার, চুল বাঁধবারই কত কায়দা; নামকরা সুন্দরী অনেক সেখানে। তাদের সৌন্দর্যে ফ্যাশানে চারদিক ঝলমল করছে। হাসি গল্প গানে বাজনায় মাত্। সন্ধ্যে হয়ে এল, এমন সময়ে নিবেদিতা এলেন। সেই সাদা সাজ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথার চুল ঠিক সোনালি নয়, সোনালি রূপোলিতে মেশানো, উঁচু করে বাঁধা। তিনি যখন এসে দাঁড়ালেন সেখানে, কি বলব যেন নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে চন্দ্রোদয় হল। সুন্দরী মেমরা তাঁর কাছে যেন এক নিমেষে প্রভাহীন হয়ে গেল।...

'সুন্দরী' 'সুন্দরী' কাকে বল তোমরা জানিনে। আমার কাছে সুন্দরীর সেই একটা আদর্শ হয়ে আছে। কাদম্বরীর মহাশ্বেতার বর্ণনা সেই চন্দ্রমণি দিয়ে গড়া মূর্তি যে মূর্তিমতী হয়ে উঠল।"—ঐ পৃঃ ১০৮

নিবেদিতা শুনিলেন, বিলাত হইতে মিসেস হেরিংহ্যাম অজন্তায় আসিয়া সেখানকার চিত্রসম্ভার নকল করাইবেন। তাঁহার সহকারী চিত্রশিল্পী আবশ্যক (১৯০৭)। তিনি হেরিংহ্যাম মহোদয়ার সঙ্গে পত্র লেখালেখি করিয়া নন্দলাল বসু ও অসিতকুমার হালদারকে অজন্তা চিত্রসমূহ নকল করিবার সুযোগ দিতে সম্মত করাইলেন। এদিকে কিন্তু নন্দলাল যাইবেন কিনা, সেই বিষয়ে 'কিন্তু কিন্তু' করিতেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'নন্দলালদের কত ভালবাসতেন, কত উৎসাহ দিতেন। অজন্তায় তো তিনিই পাঠাইলেন নন্দলালকে। ...নিবেদিতা নইলে নন্দলালের যাওয়া হত না অজন্তায়।' (ঐ, পৃঃ ১০৭-৮)। অবনীন্দ্রনাথ আরও বলিয়াছেন যে, পাছে সেখানে খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধা হয়, এজন্য নিবেদিতা গণেন মহারাজকে দিয়া চাল, ডাল, নূন, ঘি আর একজন রাঁধুনি পাঠাইয়া দিলেন। নন্দলাল বলেন, নিবেদিতাও

একবার এই সময়ে অজন্তায় যান। নিবেদিতা সত্যই ছিলেন নব্যবঙ্গের চিত্রকলার ধাত্রী।

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের চিত্র সম্বন্ধে নিবেদিতা কিরূপ উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন, তাহা তাঁহার ভারতমাতা, সতী, সাজাহান প্রভৃতি চিত্রের বাখ্যায় প্রকটিত হইয়াছে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত মডার্ণ রিভিয়ুতে তাঁহার এই সকল ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়। Civic and National Ideals পুস্তকে (পৃঃ ৬২—১২৩) নিবেদিতা শিল্পকলার মূলসূত্রসমূহ ধরিয়া দিয়াছেন। এককথায় উহা নব্য শিল্পকলার বেদ-স্বরূপ। নিবেদিতার Myths of the Hindus and Buddhists শীর্ষক অসমাপ্ত পুস্তকখানি বিখ্যাত শিল্প-সমালোচক ডাঃ আনন্দ কুমার-স্বামী সম্পূর্ণ করেন। ইহা প্রকাশ কালে (১৯১৩), তিান লেখেন ঃ

"Sister Nivedita's untimely death in 1911 has made it necessary that the present work should be completed by another hand. A most sincere disciple of Swami Vivekananda who was himself a follower of the great Ramkrishna, she brought to the study of Indian life and literature a sound knowledge of Western educational and social science and an unsurpassed enthusiasm of devotion to the peoples and ideals of her adopted country. Through these books Nivedita became not merely an interpreter to Europe, but even more, the inspiration of a new race of Indian students no longer anxious to be Anglicized, but convincced that all real progress, as distinct from mere political controversy, must be based on national ideals, upon intentions, already clearly expressed in Religion and Art."

নিবেদিতার শিল্প-জ্ঞান কত ব্যাপক ও শিল্পদৃষ্টি কিরূপ সূক্ষ্ম ছিল, তাহার একটি উদাহরণ দীনেশচন্দ্র সেনের কথায় আমরা পাই। তিনটি সাধারণ পুতুল এক টাকায় ক্রয় করায় সেন মহাশয় বিস্ময় প্রকাশ করিলে নিবেদিতা পরে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন ঃ

"দীনেশবাবু ওই পুতুল আমার এত ভাল লেগেছে কেন, শুনবেন? ৩০০০ খ্রীঃ পূর্বের অর্থাৎ এখন হইতে ৫০০০ বৎসর পূর্বের অনেকগুলি জিনিষ সম্প্রতি ক্রীট দ্বীপ হইতে ডাঃ ইভান্স আবিষ্কার করিয়া বিলাতে লইয়া আসিয়াছেন। আমি এবার বিলাত যাইয়া সেগুলি দেখিয়া আসিয়াছি, সেই সংগ্রহের ভিতর অবিকল এই পুতুলের মত পুতুল দেখিয়া আসিয়াছি।" ('ঘরের কথা ও যুগ-সাহিত্য'—পৃঃ ৩৭৯)।

তীর্থভ্রমণ নিবেদিতার ধর্মসাধনের অঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু ও শ্রীযদুনাথ সরকারের সঙ্গে তিনি বুদ্ধগয়ায় ১৯০৪ সনে গমন করেন। সাঁচী ও রাজগৃহেও তিনি গিয়াছিলেন। বুদ্ধগয়ায় বোধিবৃক্ষের সন্নিকটে প্রস্তরের চক্র দেখিয়া নিবেদিতা উহার যে সুন্দর ব্যাখ্যা করেন, যদুনাথ সরকার মহাশয় তাঁহার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

"Seeing that mark, Nivedita remarked, this sign of thunder should be adopted as the national emblem of India. Its significance is that when a man gives up his all for the good of humanity, he becomes as powerful as the thunderbolt for the work of the gods. Nivedita emphasised the bold and courageous implications of this symbol."

—(*Prabuddha Bharat*, January, 1943),

অর্থাৎ, এই বজ্রটি ভারতবর্ষের জাতীয় চিহ্ন হইবার দাবী রাখে। মানব জাতির কল্যাণার্থে যিনি সর্বস্ব দান করেন, তিনি ইহার ন্যায় শক্তির

অধিকারী হন। কথিত আছে, ইন্দ্র বুদ্ধদেবকে এই বজ্রটি দিয়াছিলেন। নিবেদিতা নিজ গ্রন্থসমূহে এই বজ্রচিহ্ন ব্যবহার করিতেন।

৬

ভারতীয় শিল্পে যেমন, অন্যান্য বিষয়েও নিবেদিতার এই সূক্ষ্ম দৃষ্টি প্রকাশ পাইত। দীনেশচন্দ্র সেন বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইংরেজী সংস্করণ সংশোধনের জন্য নিবেদিতাকে দিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ে নিবেদিতার সঙ্গে তাঁহার যে-সব কথাবার্তা হয় তাহার একটু উল্লেখ আগেই করিয়াছি। বাংলার গ্রাম্য-ছড়া ও পল্লী-গাথার সম্বন্ধে নিবেদিতা কিরূপ উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন দীনেশবাবুর এই উক্তি হইতে তাহাও আমরা জানিতে পারি ঃ

"গ্রাম্য ছড়াগুলি সম্বন্ধে যদি আমি হেলায় অশ্রদ্ধার কথা বলিয়াছি, তবে নিবেদিতার নিকট গালমন্দ খাইয়াছি। তিনি বলিতেন, 'বড় বড় লম্বা শব্দ লাগাইয়া যাঁহারা মহাকবির নাম কিনিয়াছেন, পল্লীগাথার অমার্জিত ভাষার মধ্যে অনেক সময় তাঁহাদের অপেক্ষা ঢের গভীর ও প্রকৃত কবিত্ব আছে। আপনি কৃষকগণের গান অবজ্ঞা করিবেন না, তাদের মেঠো সুরে রাগিণী না থাকিলেও করুণা আছে,—তাঁদের সরল কথায় আভি-ধানিক জ্ঞান না থাকিলেও প্রাণ আছে, আর তাঁদের কুঁড়ে ঘরে সোণা-রূপার থাম না থাকিলেও আঙিনায় শিউলি ও মল্লিকা ফুলের গাছ আছে।'

(ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য, পৃঃ ৩৭০)

ঠিক এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শিলাইদহ ভ্রমণকালে (১৯০৪) কৃষক নারী-পুরুষদের আচার-আচরণ, কথাবার্তা, কাজ-কর্ম, গান-বাজনা তাঁহার এত ভাল লাগিয়াছিল। সেখানকার গৃহস্থ-বাড়ীর রান্নাঘর শয়নঘর, ঢেঁকীঘর, গরু-বাছুর সব দেখিয়া তাঁহার কি আনন্দ! পল্লী

নরনারীর স্বহস্তকৃত সেকেলে কাঁথা, ছেলেদের 'দোলাই', কুলো, ডালা, মাটির পুতুল, কাঠের পুতুল, বেতের কাজ, বাঁশের কাজ, পাখা, লাঠি তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তিনি তখন অনেক কিছু সংগ্রহও করিয়াছিলেন। মুসলমান জোলার তাঁতের রকমারি কাপড় বোনাও তিনি সাগ্রহে দেখিয়া লইলেন। বুনোপাড়ার ছেলেদের 'অষ্ট-সখী'র নাচ-গানও শুনিতে ছাড়েন নাই। একদা বরোদার কুটীর দেখিয়া যিনি 'কি সুন্দর', 'কি সুন্দর' বলিয়াছিলেন, বুদ্ধ-গয়ায় সুজাতার আবাসস্থলে গিয়া ধূলি মস্তকে লইয়াছিলেন, শিলাইদহের পল্লীতে 'ষষ্ঠী ঘোষের বটগাছ' দেখিয়াও কি তিনি স্থির থাকিতে পারেন? জনহিতায় যিনি এ গাছটি রোপণ করিয়াছিলেন, তার উদ্দেশে বার বার প্রণাম জানাইলেন, বটগাছটিকেও 'sublime, divine' বলিয়া আখ্যাত করিলেন। বঙ্গের নরনারীর প্রাণরসের সন্ধান পাইয়াছিলেন বলিয়াই নিবেদিতার পক্ষে The Web of Indian Life ("ভারতীয় জীবনের বুনন") রচনা সম্ভবপর হইয়াছিল। দীনেশচন্দ্রের সঙ্গে ঘোর মতানৈক্য সত্ত্বেও তাই তিনি বলিতে পারিয়াছিলেন ঃ

"দীনেশবাবু, আপনার সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমার মতের ঘোর অনৈক্য। যখন সে দিক দিয়া আপনার কথা ভাবি তখন আপনার কাপুরুষতা আমাকে শুধু লজ্জা নহে, মর্মপীড়া দান করে, কিন্তু তবুও আমার আপনাকে ভাল লাগে কেন শুনবেন? আপনি বিনা আড়ম্বরে দেশের জন্য এতটা খেটেছেন ও দেশের উপর এতটা মমতার পরিচয় দিয়েছেন যে, আপনার অজ্ঞাতসারে আপনি প্রকৃত দেশভক্তের স্থান দাবী করবার যোগ্যতা রাখেন—এজন্য আপনাকে আমার বড় ভাল লাগে।"

(ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য, পৃ ৩৭২-৩)

শুধু শিল্প বা সাহিত্যে নহে; বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতির গবেষণা ও চর্চাতেও ভারতবাসীকে জগৎ-সভায় উচ্চ স্থান গ্রহণ করিতে হইবে,

স্বদেশের উন্নতি বলিতে নিবেদিতা ইহাই বুঝিতেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর গবেষণা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদেরও তাক্ লাগাইয়া দিয়াছে, জগতের বিজ্ঞানের মানচিত্রে ("Scientific Map of the World") ভারতবর্ষ নিজ কৃতিত্বগুণে উৎকৃষ্ট স্থান লইয়াছে—এ কথা ভাবিতেও নিবেদিতা উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন। আচার্য যদুনাথ সরকার বলিয়াছেন, তিনি এ কারণে জগদীশচন্দ্রকে রীতিমত ভক্তিঅর্ঘ্য প্রদান করিতেন। বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের মত একটি বিজ্ঞান গবেষণাগারের প্রয়োজনীয়তার বিষয় নিবেদিতাই তাঁহার নিকট উত্থাপন করেন। গবেষণা সম্বন্ধে নিবেদিতার একটি মৌলিক ধারণা ছিল। তিনি বলিতেন, যিনি বিজ্ঞানের গবেষণা করিবেন, তাঁহাকে অবসর সময়ে ইতিহাস পাঠ করিতে হইবে, যিনি ইতিহাস লইয়া থাকিবেন, তাঁহাকেও অবসর বিনোদনকল্পে বিজ্ঞানের মূল তথ্যগুলি জানিয়া লইতে হইবে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই মতের সম্পূর্ণ সমর্থন করিতেন। নিবেদিতার মতে সকল কার্যের মূলে থাকিবে দেশ-জন-ধর্ম তথা স্বদেশের উন্নতির ঐকান্তিক বাসনা।

নিবেদিতা ইতিহাস-গবেষকদের উদ্দেশ্যে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। যখনই আমরা যে বিষয়ে গবেষণা করিতে উদ্যত হইব, মনে রাখিতে হইবে আমরা প্রত্যেকে যেন সেই সেই বিষয়ে world authority' বা জগতে সবচেয়ে অধিক বিজ্ঞ বলিয়া মান্য হইবার আকাঙ্ক্ষা রাখি। খণ্ড খণ্ড কালের বা যুগের ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হইলেও সমগ্র দেশটিকে আমাদের সম্মুখে ধরিয়া রাখিতে হইবে। 'দেশ-জন-ধর্ম' সম্বন্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টি লইয়া গবেষণা কার্যে অগ্রসর হইলে মানবজাতির ক্রমোন্নতির ধারাসমূহ আমাদের নিকট পরিষ্কার হইয়া যাইবে। তাই নিবেদিতা বলিতেছেন ঃ

"But who has caught the palpitation of the

Indian heart-beat through one and all of these? It is *India* that makes Indian History glorious. It is *India* that makes the whole joy of the Indian places. I felt this when I was at Rajgir, and saw so plainly, shining through the Buddhist period, the outline and colour of an earlier India still, the *India* of the Mahabharata." (*Hints on National Education in India*, p, 103)

নিবেদিতা আচার্য যদুনাথের গবেষণা প্রণালীর প্রতি যুব-বাঙ্গলার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। তিনি বলেন, যদুনাথ যেমন প্রত্যেকটি বিষয়ের মূল দলিলাদির সন্ধানে প্রবৃত্ত—যাহাকে তিনি 'spade-work' বলেন—সেইরূপ প্রতিটি ইতিহাস গবেষককে মূলে যাইতে হইবে। তবেই তিনি জাতির সত্যকার ইতিহাস রচনায় সহায়তা করিতে সক্ষম হইবেন। আচার্য যদুনাথও নিবেদিতার দ্বারা কম উৎসাহিত হন নাই। তিনি বলিয়াছেন ঃ

"The present speaker for his original researches in Indian history based on Persian manuscripts was much encouraged by her." (*Prabuddha Bharat*, January, 1943).

অর্থাৎ ফার্সী ভাষার পাণ্ডুলিপির উপর নির্ভর করিয়া ভারতেতিহাস রচনায় নিবেদিতা আচার্য যদুনাথকে খুব উৎসাহিত করিয়াছিলেন। 'জাতীয় শিক্ষা' প্রবর্তন কালে যুবক অধ্যাপকগণ যাহাতে ইতিহাসের গবেষণায় প্রবৃত্ত হন সেজন্যও নিবেদিতা সচেষ্ট ছিলেন। ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ও ডাঃ তারকনাথ দাসের গবেষণা কার্য অনেকটা ইহারই ফল। নিবেদিতা নিজেও ছিলেন একজন উচ্চ শ্রেণীর গবেষক। তিনি সমাজতত্ত্ববিদ্ বলিয়াও দেশ-বিদেশে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। অধ্যাপক

বিনয়কুমার সরকার বলেন,—তাঁর গবেষণা-শক্তি, সংস্কৃতি বিশ্লেষণের কায়দা, জীবন সম্বন্ধে সূক্ষ্মদৃষ্টি আর ইংরেজী রচনা-কৌশল” যুবক বাঙ্গলার উপরে প্রভাব বিস্তারের একটি প্রবলতম কারণ। (বিনয় সরকারের বৈঠকে, ১ম সং, পৃ ২৯১।) নিবেদিতার বিভিন্ন পুস্তকে এই সকল গুণের যথেষ্ট পরিচয় মিলে।

যেমন ইতিহাসের গবেষণায় উৎসাহ দানে, তেমনি সংবাদপত্র দ্বারা জনসেবার কার্যেও তিনি অগ্রণী ছিলেন। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নতির একটি প্রকৃষ্ট উপায় সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র। অরবিন্দ ঘোষের কলিকাতা ত্যাগের পর হইতে নিবেদিতা 'কর্মযোগিনে'র সম্পাদনায় বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহার বহু পূর্বে ১৯০২ সন হইতে জাতীয়তাবাদী বিভিন্ন সাময়িকে তিনি নিয়মিতভাবে লিখিতেন। নিউ ইণ্ডিয়া, প্রবুদ্ধ ভারত, ইণ্ডিয়ান রিভিউ, ইণ্ডিয়ান ওয়ার্লড্, ভারতী তাঁহার রচনায় সমৃদ্ধ হইয়াছে। বিখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'মডার্ণ রিভিয়ু' প্রকাশিত হইলে, ১৯০৭ সন হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত বরাবর নিবেদিতা ইহাতে স্বীয় রচনাদি প্রেরণ করিতেন। নিবেদিতা যে একজন 'জাত-সাংবাদিক' ছিলেন তাহার প্রমাণস্বরূপ রামানন্দবাবু লিখিয়াছিলেন ঃ

"She was···a born journalist. She wrote with brilliancy, vigour and originality and, even on commonplace themes, with something like inspired fervour. She could write with great facility and on a great variety of topics, and could therefore comply with the requests of many editors for her paragraphs and articles." (*The Modern Review* for November, 1911).

অতি তুচ্ছ বিষয়ও নিবেদিতার লেখনীমুখে সুষমামণ্ডিত হইয়া উঠিত। 'মডার্ণ রিভিয়ু'র সূচনা হইতে ইহার কার্যে নিবেদিতার নিকটে ঋণ রামানন্দবাবু মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন ঃ

"From the very birth of this review, she helped us with her contributions and suggestions and in other ways in an uncommon measure. Her unsparing criticism, inprivate conversation, of our shortcomings and faults, was of not less advantage to us. The sense of the value of all this help is daily growing upon us, and we feel that we must not try to give it adequate expression... She was indeed a *sister* and she was *Nivedita dedicated* to the service of all who came within the orbit of life's way' (*Ibid*),

রচনা, উপদেশ ও দোষ-ত্রুটি সংশোধনের পরামর্শ দিয়া নিবেদিতা ভগিনীর ন্যায় 'মডার্ণ রিভিয়ু' লালনে রামানন্দবাবুকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

৭

স্ত্রীশিক্ষা ও জাতীয় শিক্ষা প্রচেষ্টায় নিবেদিতা কৃতিত্বের আভাস ইতিপূর্বেই আমরা পাইয়াছি। প্রধানতঃ আদর্শ স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্তনের জন্যই নিবেদিতা ভারতবর্ষে স্বামীজী কর্তৃক আনীত হইয়াছিলেন। নানা কাজের মধ্যেও গুরু-নির্দিষ্ট কার্য তিনি ভুলিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ কিরূপ হওয়া উচিত নিবেদিতা তাহা সবিস্তারে বিবৃত

করিয়াছেন। ভারতবর্ষের আদর্শ নারী যেমন সতী, সীতা, সাবিত্রী, গান্ধারী তেমনি মীরাবাঈ, অহল্যাবাঈ, রাণী ভবানী ও ঝান্সীর রাণী। ত্যাগে, সেবায়, ধর্ম-চর্যায়, সাহসিকতায় মনুষ্য জীবনের সকল দিকেই শক্তির বিকাশে নারীর কৃতিত্ব। ভারতীয় নারীর এই শাশ্বত আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়াই নিবেদিতা স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তনে অগ্রসর হন। সুস্পষ্ট ভাষায় তিনি লিখিয়াছেন ঃ

"An education of the brain that uprooted humility and took away tenderness, would be no true education at all. These virtues may find different forms of expression in mediaeval and modern civilisations, but they are worth having must first devote itself to the developing and consolidating of character, and only secondarily concern itself with intellectual accomplishment" (*Hints on National Education in India*, pp. 54-5).

অর্থাৎ, যে শিক্ষায় নারীর নম্রতা ও কোমলতার হানি হয় সে শিক্ষা শিক্ষাই নহে। চরিত্রের বিকাশই হইল মুখ্য, মানসিক উন্নতি গৌণ। প্রথমটির স্ফুরণে দ্বিতীয়টির বিকাশ না হইয়া যায় না। আধুনিক যুগে নারীকে গৃহের ভিতরে ও বাহিরে উভয়ক্ষেত্রেই কাজ করিতে হইবে। নিবেদিতা ইহার জন্য নিজ বিদ্যালয়ে বালিকাদের প্রস্তুত করিতেছিলেন। তাঁহার আশ্চর্য শিক্ষাপ্রণালী, অমায়িক ব্যবহার সম্পর্কে শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকারের 'নিবেদিতা' পুস্তিকা হইতে আমরা বিশদ বর্ণনা পাই। নিবেদিতা মেয়েদের নিকটে ও দূরে দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখাইতে লইয়া যাইতেন এবং সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ই তাহাদের বুঝাইয়া দিতেন। বিদ্যালয়টি শুধু অল্পবয়স্কা বালিকাদেরই শিক্ষা-ক্ষেত্র ছিল না, বয়স্কা গৃহিণী

ও অনাথা বিধবারাও এখানে আসিয়া নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে পারিতেন।

স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া সমগ্র শিক্ষা-বিজ্ঞানই তাঁহার আয়ত্ত হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশে যখন স্বদেশী আন্দোলনের প্লাবন আসিল, তখন জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িবারও প্রয়োজন অনুভূত হইল। এ কার্যে স্বতঃই নিবেদিতার ডাক আসিল। ভারতীয় জাতীয়তার —যাহাকে তিনি ইংরেজীতে নাম দিয়াছেন 'Indian Nationality' —ভিত্তিতে তাঁহার সমুদয় চিন্তা ও কার্য নিয়মিত হইয়া আসিয়াছে। তাঁহার জাতীয়তা ছিল নিষ্ক্রিয় নয়, সক্রিয়। 'Dynamic Religion', 'Aggressive Hinduism' প্রভৃতি বক্তৃতায় ইতিপূর্বেই তাহা বুঝা গিয়াছে। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ডন সোসাইটিতে 'Nationalism' (জাতীয়তা) ও National Education' (জাতীয় শিক্ষা) প্রভৃতি সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়া চিন্তাশীল বাঙ্গলাকে তিনি এই ভাবে ভাবত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার প্রথম বক্তৃতাটি সম্বন্ধে স্মৃতি হইতে নিজস্ব ঢঙে বলিয়াছেন ঃ

[ভগ্নী নিবেদিতার] বক্তৃতার বিষয় ছিল জাতীয়তা।······নিবেদিতা রমেশ দত্তের গুণগ্রাহী। তাঁর গবেষণা ও লেখালেখির খবর দিলেন। রমেশ দত্তকে পয়লা নম্বরের স্বদেশসেবক তিনি বিবেচনা করেন। অথচ রমেশ দত্ত উঁচু দরের সরকারী চাকুরে। মনে হ'ল নিবেদিতা লোকগুলাকে বাজিয়ে দেখতে জানেন। আর একটা কথা মনে পড়ছে। নিবেদিতা বললেন, যুবক বাংলা স্বাধীনতার মাঠে দৌড়ের জন্য তৈয়ার হচ্ছে মাত্র। এখনো দৌড় সুরু করেনি। মন্তব্যটা খুব পাকা মাথা থেকে বেরিয়েছে ভেবেছিলাম। সে কথাটার দাম লাখ টাকা।"

(বিনয় সরকারের বৈঠকে, পৃঃ ২৮৮–৯।)

এই স্বাধীনতা বা স্বাদেশিকতা মন্ত্রে যুবক-ভারতকে অনুপ্রাণিত করিবার

জন্য নিবেদিতা শুধু বক্তৃতার আশ্রয় লইতেন না, লেখনীও সমানে চালনা করিতেন। তিনি "The Cry of the Mother to the Indian Youth" শীর্ষক কবিতায় বাঙ্গালী, মারাঠী, রাজপুত, শিখ, মুসলমান, দ্রাবিড় ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের অধিবাসিগণকে অন্তর্নিহিত একতায় দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক এই মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইতে আবেদন জানান। ইহাতে তিনি বলেন ঃ

"In your today lives all the greatness of the past,
Awake then and arise !
Struggle ye on and stop not till the goal is reached."

* * *

Fear not machines !
Assert the mind that lives in you :
Include, create, assault and take by might,
The strongest city of the mind of man,
Be not content to crawl,
But leap ye up."

এহেন নিবেদিতার যে জাতীয় শিক্ষা ব্যাপারে ডাক পড়িবে তাহা বলাই বাহুল্য। অধ্যাপক সরকার অতঃপর বলেন, "নিবেদিতার ডাক জাতীয় শিক্ষার আদর্শ মাফিক লেখাপড়ার লাইনে খুব বেশী পড়ত।" বস্তুতঃ নিবেদিতা ছিলেন জাতীয় শিক্ষার ব্যাখ্যাতা। তিনি ইহাকে একটি দর্শনের পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে শিক্ষা তখনই 'জাতীয়' হইবে যখন ইহা জাতির 'গঠনমূলক' (nation-making) কার্যে নিয়োজিত হইবে। প্রাথমিক হইতে উচ্চতম বিদ্যায়তন পর্যন্ত

সমগ্র শিক্ষা এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া নিয়ন্ত্রিত করা একান্ত আবশ্যক। দেশ-জন-ধর্মের জ্ঞান জন্মিলেই শিক্ষা 'জাতীয়' পদবাচ্য হইতে পারে। জাতীয় শিক্ষা প্রসঙ্গে নিবেদিতা লিখিয়াছেন ঃ

"Science, art, history, the crafts, business, the development of men on planes external and internal, all these are but so many different expressions of That One." (*Hints on National Education*, p. 22).

বিজ্ঞান, ললিতকলা, ইতিহাস, শিল্পবিদ্যা, বাণিজ্য, মানুষের অন্তর-বাহিরের উন্নতি সেই শাশ্বত বস্তুরই বিভিন্ন প্রকাশ। ভারতবাসী জাতীয়তার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইলে এ সকলই তাহার আয়ত্ত হইবে। Nationality বা জাতীয়তাবোধের উপর শিক্ষা-সৌধ গঠিত না হইলে তাহা জাতীয় পদবাচ্য হইতে পারে না। নিবেদিতা শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন রচনায় এই কথাটির উপর সবিশেষ জোর দিয়াছেন। প্রত্যেকটি নরনারীর অন্তঃকরণে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ করিতে হইলে আবার জাতীয় ইতিহাসের প্রয়োজন। নিবেদিতা লিখিয়াছেন ঃ

"An Upanishad of the National History would make eternal foundations for the Indian Nationality, in the Indian heart, the only world in which the nationality can be built enduringly." (*Ibid.*, p. 103).

স্বদেশী আন্দোলনে বঙ্গদেশে যে নূতন ভাবধারা তীব্রবেগে প্রবাহিত হইতেছিল, জাতীয় শিক্ষা তাহার একটি অঙ্গ মাত্র। নিবেদিতা ভারতবর্ষের সর্বপ্রকার উন্নতিই চাহিতেন। কিন্তু ইহার পথে প্রধান বিঘ্ন বিদেশীর শাসন। নিবেদিতা এই বিঘ্ন দূরীকরণেও যে প্রয়াসী হইয়াছিলেন তাহা আমরা এখন দেখিতে পাইব।

৮

অধ্যাপক সরকার বলেন ঃ "আমার বিশ্বাস তাঁর [নিবেদিতার] প্রভাবের প্রধান কারণ স্বাদেশিকতা ও বিপ্লব-নিষ্ঠা। তিনি যুবক ভারতকে স্বদেশ-নিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন।" (বিনয় সরকারের বৈঠকে, পৃঃ ২৯১)।

প্রশ্ন জাগে, নিবেদিতার এই বিপ্লবনিষ্ঠা কি শুধু ভাবাত্মক, না কার্যেও তাহা পরিণতি লাভ করিয়াছিল ? যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, সকলেই নিবেদিতার স্বাদেশিকতা ও রাজনৈতিক মতামত সম্বন্ধে প্রায় একমত প্রকাশ করিয়াছেন। অবনীন্দ্রনাথ বলেন, "ভারতবর্ষকে যাঁরা সত্যি ভালোবেসেছিলেন তার মধ্যে নিবেদিতার স্থান সবচেয়ে বড়। দীনেশবাবু লিখিয়াছেন, নিবেদিতা রাজনৈতিক চরমপন্থী ছিলেন, আমার সঙ্গে প্রথম প্রথম আলাপের পর তিনি রাজনৈতিক প্রসঙ্গ করিতে চাহিতেন না। আমাকে ভীরু, কাপুরুষ স্ত্রীলোক হইতেও হীনবল ইত্যাদি বলিয়া গালাগালি, রাজনৈতিক কোন কথা বলিলে ক্রোধের সহিত বলিতেন—'দীনেশবাবু ওটি আপনার ক্ষেত্র নহে, আমি আপনার সঙ্গে ও সম্বন্ধে কথা বলিব না'।"

আচার্য যদুনাথ সরকার বলেন ঃ "Passionately loving the independence of India, she remarked that the right place of Raja Rammohun Roy was by the side of Ranjit Singh of Lahore. That is to say, the intellect of Bengal and the valour of the Panjab should act side by side for the political regeneration of India. She was a nationalist of nationailsts" (*Probuddha Bharata*, January, 1943)

পাঞ্জাবের রণজিৎ সিংহের সঙ্গে বাঙ্গালী রামমোহনের মিলন, অর্থাৎ পাঞ্জাবী রণশক্তি আর বাঙ্গালীর মনীষার সমাবেশ হইলেই ভারতবর্ষের

স্বাধীনতা আমাদের মুঠার মধ্যে আসিয়া যাইবে—নিবেদিতার এইরূপ দৃঢ় প্রত্যয় ছিল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ও লিখিয়াছেন :

"She took a profound and active interest in Indian politics. She was a pronounced nationalist,… though her political opinions were quite radical & definite, she could never forgive partisanship or faction fights in Indian politics or journalism. She believed in the great need and efficacy of our presenting a united front.……The promotion of the cause of nationality was with her a mission and a passion, as was woman's education."

(*The Modern Review for* November, 1911).

নিবেদিতার ঐকান্তিক স্বদেশনিষ্ঠা এবং রাজনীতিতে উগ্র মতবাদ সম্বন্ধে এখানে সকলেই একমত দেখিতে পাইলাম। উপরন্তু তিনি যে রাষ্ট্রীয় বিষয়ে কতকটা বিপ্লবী মতবাদ পোষণ করিতেন তাহারও আভাস পাওয়া গেল। কিন্তু তাঁহার বিপ্লবী-কার্যে সহযোগিতা সম্বন্ধে কেহই উচ্চবাচ্য করেন নাই। শ্রীযুত গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী 'উদ্বোধন' পত্রিকায় (১৩৪৭, বৈশাখ—১৩৫৩, আশ্বিন) 'শ্রীঅরবিন্দে'র জীবনকথা আলোচনা প্রসঙ্গে নিবেদিতার রাজনৈতিক মতবাদ ও কার্যকলাপ সম্বন্ধেও কথঞ্চিৎ আলোক-সম্পাত করিয়াছেন। নিবেদিতা ১৯০২-৩ সনে বরোদার মহারাজার আমন্ত্রণে বরোদায় গমন করেন। সেখানে অরবিন্দের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ ও আলাপ-পরিচয় হয়। নিবেদিতা তাঁহাকে স্বামীজীর 'রাজযোগ' পড়িতে দিলেন। অরবিন্দ তখন বিপ্লবী ভাবাপন্ন, নিবেদিতা ইতিপূর্বেই বিলাতে বিপ্লবী-কার্যে লিপ্ত ছিলেন। উভয় বিপ্লবীর সঙ্গে এখানে ভাববিনিময়ের সুযোগ ঘটিল। নিবেদিতা কলিকাতায় ফিরিয়াই তাঁহার বিপ্লবাত্মক পুস্তকগুলি বঙ্গের

বিপ্লবীবদল পরিচালিত গ্রন্থাগারে দান করিলেন। গিরিজাবাবু সুরেন্দ্রনাথ হালদারের নজীরে বলেন যে, নিবেদিতার সঙ্গে ইহার পূর্বেই সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার ভগিনীপতি ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশ এবং ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্রের (পি, মিত্র) আলাপ করাইয়া দিয়াছিলেন। পি, মিত্রের অনুশীলন সমিতিতে নিবেদিতা বক্তৃতা দিবার জন্য আহূত হইতেও থাকেন।

কিছুকাল পরেই স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা। ইহার পূর্বে নিবেদিতার ভারত-প্রীতির দুই-একটা কথা উল্লেখযোগ্য। বিলাতে একটি সভায় ভারতের উচ্চ শ্রেণীর নারীদের চরিত্র সম্বন্ধে একটি মহিলা কটূক্তি করিলে নিবেদিতা এমন ভাবে তাঁহার উপর প্রশ্নবাণ বর্ষণ করিতে থাকেন যে, তিনি ক্ষমা চাহিতে বাধ্য হন। ১৯০৫ সনের ১১ই ফেব্রুয়ারী শনিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে বড়লাট লর্ড কার্জন মিথ্যাবাদী বলিয়া বাঙ্গালীদের চরিত্রের উপর কালিমা লেপন করিতে চেষ্টা করেন। নিবেদিতা পরবর্তী সোমবারেই 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় কার্জনের *The Problems of the East* পুস্তক হইতে কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া দিলেন তিনি নিজেই কিরূপ মিথ্যাবাদী। স্বদেশী আন্দোলনের সময় নিবেদিতার বিপ্লবী মন নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারিল না। স্বাদেশিকতার উন্মেষ ও জাতীয় শিক্ষার প্রসার সম্বন্ধে তাঁহার কার্য ও চিন্তা আমরা কতকটা জানিতে পারিয়াছি। রাজনীতিতে প্রকাশ্যভাবে যোগদানেও তাঁহার পক্ষে কোন বাধা ছিল না। কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই। স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা (অধুনা ডাঃ) ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত 'যুগান্তরে'র সম্পাদকরূপে গ্রেপ্তার হইলে তাঁহার জামিন হইবার নিমিত্ত নিবেদিতা স্বয়ং আদালত-গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজনীতির সঙ্গে প্রকাশ্য সংযোগের দৃষ্টান্তস্বরূপ ইহার উল্লেখ কষ্টকল্পনা মাত্র।

তবে গিরিজাবাবু নানা সূত্র হইতে যে-সব সন্ধান পাইয়াছেন, তাহাতে

ইহা সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় যে, নিবেদিতা তৎকালীন বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। নিবেদিতা ডন সোসাইটিতে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সোসাইটি জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার মধ্যেই আত্ম-বিলোপ করে। এই সোসাইটির সঙ্গে নিবেদিতার যোগ ছিল, কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য বিপ্লবাত্মক ছিল না। অরবিন্দ জাতীয় শিক্ষা পরিষদ কর্তৃক স্থাপিত ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া আসিলে তাঁহার সঙ্গে নিবেদিতার পুনরায় যোগসাধন হইল। নিবেদিতার বোসপাড়া লেনের জীর্ণ বিদ্যালয়-ভবন বিপ্লবী অরবিন্দের পরামর্শ-গৃহ হইয়া দাঁড়াইল। গিরিজাবাবু বলিয়াছেন, বাঙ্গলার তৎকালীন রাজনীতিক কার্যে সকলের চেয়ে অরবিন্দের সঙ্গেই নিবেদিতার অধিক ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয়। আর এই ঘনিষ্ঠতা ১৯১০ সনে ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহার কলিকাতা ত্যাগ পর্যন্ত বলবৎ ছিল। আলীপুর বোমার মামলায় অরবিন্দ খালাস পাইলে দার্জিলিঙে নিবেদিতা তাঁহার কৌন্সুলী চিত্তরঞ্জনের কোটের বোতামে একটি গোলাপ ফুল গুঁজিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন ঃ

"I know you to be great, but I did not know you to be so great"—'আমি আপনাকে মহৎ বলিয়া জানিতাম, কিন্তু আপনি যে এত মহৎ তাহা তো বুঝি নাই।'

অরবিন্দের কলিকাতা ত্যাগ সম্পর্কিত ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করিলেও আমরা অরবিন্দ-নিবেদিতার আদর্শসাম্যের বিষয় বুঝিতে পারি। গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বাহির হইয়াছে, সংবাদ পাইয়া ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে অরবিন্দ নিবেদিতার পরামর্শ লইবার জন্য রামচন্দ্র মজুমদারকে পাঠাইলেন। নিবেদিতা তাঁহাকে বলিলেন ঃ

"Tell your chief to hide and the hidden chief through intermediary shall do many things."

অরবিন্দ তাঁহার মাধ্যমে কালীমাতার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া কলিকাতা হইতে প্রস্থান করিলেন। প্রস্থানের পূর্বে তিনি নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া 'কর্মযোগিন্' পরিচালনা সম্পর্কে আলাপাদি করিয়াছিলেন। অরবিন্দের অন্তর্ধানের পর ইহার সম্পাদনা-কার্যে নিবেদিতা সাহায্য করিতে থাকেন।

৯

ভারতগতপ্রাণা নিবেদিতা ভারতবর্ষের সেবায় আপনাকে এমন করিয়া বিলাইয়া দিয়াছিলেন যে, নিজের দেহ বা স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি দিবারও তাঁহার অবসরমাত্র ছিল না। তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। হাওয়া পরিবর্তনের জন্য দার্জিলিঙে গিয়া আচার্য জগদীশচন্দ্র ও লেডী বসুর গৃহে কিছুদিন থাকিবেন স্থির হইল। দার্জিলিঙ যাত্রার পূর্বে নিবেদিতা একটি মৈত্রীর বাণী মুদ্রিত করিয়া বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে বিতরণ করিয়া যান। ইহাই প্রকৃতপক্ষে মানবজাতির প্রতি তাঁহার শেষ উক্তি। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি দার্জিলিঙে গিয়া অল্পদিন পরেই নিবেদিতা অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। বসু-দম্পতির শুশ্রূষা এবং ডাঃ নীলরতন সরকারের চিকিৎসা সত্ত্বেও তাঁহার আরোগ্যলাভ হইল না। নিবেদিতা ১৯১১ সনের ৩রা অক্টোবর প্রাতে সজ্ঞানে ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁহার মুখ-নিঃসৃত শেষ কথা কয়টি এই ঃ

"The boat is sinking, but I shall see the sun-rise."

"আমার জীবন-তরী ডুবিতেছে বটে, কিন্তু সূর্যোদয় দেখিতে পাইব।" শেষ ইচ্ছা অনুসারে তাঁহার শবদেহ শ্মশানে হিন্দুপ্রথায় দাহ করা হয়। নিবেদিতার মৃত্যুতে ভারতবর্ষের সর্বত্র বিষাদের ছায়া পড়িল। বিভিন্ন প্রদেশের সংবাদপত্রে এবং বাঙ্গলা দেশে সভা-সমিতিতে একবাক্যে সকলেই তাঁহার গুণকীর্তন করিতে লাগিলেন। রবীন্দ্রনাথের অমর লেখনীমুখে

কীর্তিময়ী নিবেদিতার অশরীরী আত্মা যেন মানুষের চক্ষের সম্মুখে নূতন রূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তাঁহার রচনা হইতে এস্থলে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া এই মহীয়সী মহিলার স্মৃতিতর্পণ শেষ করিব ঃ

"জসসাধারণকে হৃদয় দান করা যে কত বড় সত্য জিনিস তাহা তাঁহাকে দেখিয়াই আমরা শিখিয়াছি। জনসাধারণের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে আমাদের যে বোধ তাহা পুঁথিগত—এ সম্বন্ধে আমাদের বোধ কর্তব্য-বুদ্ধির চেয়ে গভীরতায় প্রবেশ করে নাই। কিন্তু মা যেমন ছেলেকে সুস্পষ্ট করিয়া জানেন, ভগিনী নিবেদিতা জনসাধারণকে তেমনি প্রত্যক্ষ সত্তারূপে উপলব্ধি করিতেন। তিনি এই বৃহৎ ভাবকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মতই ভালবাসিতেন। তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত বেদনার দ্বারা তিনি এই 'পীপ্‌ল্'কে—এই জনসাধারণকে আবৃত করিয়া ধরিয়াছিলেন। এ যদি একটিমাত্র শিশু হইত তবে ইহাকে তিনি আপনার কোলের উপর রাখিয়া আপনার জীবন দিয়া মানুষ করিতে পারিতেন। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন লোকমাতা।...

"যে লোক দেশের প্রত্যেক লোকের মধ্যে সমগ্র দেশকে দেখিতে পায় না, সে মুখে যাহাই বলুক দেশকে যথার্থভাবে দেখে না। ভগিনী নিবেদিতাকে দেখিয়াছি তিনি লোকসাধারণকে দেখিতেন, স্পর্শ করিতেন, শুদ্ধমাত্র তাহাকে মনে মনে ভাবিতেন না। তিনি গণ্ডগ্রামের কুটীরবাসিনী একজন সামান্য মুসলমান রমণীকে যেরূপ অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সহিত সম্ভাষণ করিয়াছেন দেখিয়াছি, সামান্য লোকের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে—কারণ ক্ষুদ্র মানুষের মধ্যে বৃহৎ মানুষকে প্রত্যক্ষ করিবার সেই দৃষ্টি, সে অতি অসাধারণ। সেই দৃষ্টি তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত সহজ ছিল বলিয়াই এতদিন ভারতবর্ষের এত নিকটে বাস করিয়া তাঁহার শ্রদ্ধা ক্ষয় হয় নাই।

"শিবের প্রতিই সতীর সত্যকার প্রেম ছিল বলিয়াই তিনি অর্ধাশনে অনশনে অগ্নিতাপ সহ্য করিয়া আপনার অত্যন্ত সুকুমার দেহ ও চিত্তকে

কঠিন তপস্যায় সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই সতী নিবেদিতাও দিনের পর দিন যে তপস্যা করিয়াছিলেন তাহার কঠোরতা অসহ্য ছিল—তিনিও অনেকদিন অর্ধাশন অনশন স্বীকার করিয়াছেন, তিনি গলির মধ্যে যে বাড়ীর মধ্যে বাস করিতেন সেখানে বাতাসের অভাবে গ্রীষ্মের তাপে বীতনিদ্র হইয়া রাত কাটাইয়াছেন, তবু ডাক্তার ও বান্ধবদের সনির্বন্ধ অনুরোধেও সে বাড়ী পরিত্যাগ করেন নাই; এবং আশৈশব তাঁহার সমস্ত সংস্কার ও অভ্যাসকে মুহূর্তে মুহূর্তে পীড়িত করিয়া তিনি প্রফুল্লচিত্তে দিনযাপন করিয়াছেন—ইহা যে সম্ভব হইয়াছে এবং এই সমস্ত স্বীকার করিয়াও শেষ পর্যন্ত তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ হয় নাই তাহার একমাত্র কারণ, ভারতবর্ষের মঙ্গলের প্রতি তাঁহার প্রীতি একান্ত সত্য ছিল, তাহা মোহ ছিল না; মানুষের মধ্যে যে শিব আছেন সেই শিবকেই এই সতী সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।"—প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩১৮।

"............কিন্তু ভারত যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে তাহার প্রাণের বীজ ছিল নব্য জ্ঞান ও চরিত্র গঠন, জাতীয় ঐক্য (বর্ণভেদের বিরোধী) এবং ব্যবসায়ে আত্মনির্ভরতা (economic self-sufficiency of the nation)। এই চির সত্য আমাদের প্রথম যুগের দেশনেতারা প্রচার করেন, তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল এইরূপ বারোজন পূর্বসূরীদের চরিত্র ও কীর্তি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন..............ঐ ঐ মনীষীরা কোন্ কোন্ দিকে, কী কী প্রণালীতে আমাদের সমাজকে প্রভাবিত করেন, জাতীয় দেহে নবরক্ত ঢালিয়া দেন, তাহাই বুঝান হইয়াছে। ইহা ভুলিবার নয়।"

শ্রীযদুনাথ সরকার

*